# সোমক দাসের ছোটগল্প

প্রতিভাস
কলিকাতা-৭০০০০২

প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৬১

প্রচ্ছদ : সুধীর মৈত্র

প্রতিভাসের পক্ষে সন্ধ্যা সাহা কর্তৃক ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলিকাতা-২
থেকে প্রকাশিত, সুকুমার দে কর্তৃক বাসন্তী প্রেস ১৯ এ, ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত। অন্নপূর্ণা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস এর পক্ষে রাধানাথ
দত্ত কর্তৃক ৫/ই, দীনবন্ধু চক্রবর্তী লেন, কলিকাতা-৬ থেকে বাঁধাই

অর্ধাঙ্গিনীকে

অনেক প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃত বিপর্যয়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হল 'সোমক দাসের ছোটগল্প'। পঁচিশ বছরের যুবক প্রেসমালিক সুকুমার দে'র কোনো তুলনা নেই। তুলনা নেই বীজেশ সাহারও। ছাপার ভুল যেটুকু থেকে গেল, তার জন্যে অবশ্য আমি বা সুকুমার কেউ দায়ী নয়; বীজেশই দায়ী। বেশীর ভাগ প্রুফ সেই দেখেছে, আমি সময় দিতে পারিনি। তবে, এই ফাঁকে স্বীকার করে রাখি, বইটি যে শেষ অব্দি প্রকাশিত হল—এই ঘটনার সব কৃতিত্বই বীজেশের। বরং প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার জন্যে দায়ী সুকুমার, কিছুটা আমিও। প্রকারান্তরে।

শেষ মুহূর্তে অনেক রকম কারণে অনেকগুলো গল্প বাদ দিতে হল। কোনোটা সংকলিত হওয়ারই যোগ্য নয়। কোনোটা এই সংকলনের পক্ষে অহেতুক দীর্ঘ। কোনোটার কপি যথাসময়ে হাতেই পাওয়া গেল না। ইত্যাদি।

'অনুবাদ পত্রিকা'র সম্পাদক ও 'নীলসরস্বতী প্রকাশনে'র মালিক, শ্রী বৈশম্পায়ন ঘোষাল, আমার গল্প সংকলন প্রকাশের ইচ্ছা করেছিলেন, কয়েকবার। এই সুযোগে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখি।

সোমক দাস

## সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| দাতা ও প্রার্থী | ৯ |
| পুনরুদ্ধার | ১৮ |
| যাওয়া হলো না | ২৭ |
| কুমীর | ৩৪ |
| মমিতন্ত্র | ৩৬ |
| ঘোড়া | ৬১ |
| ভোলে বাবা ও ভুলভুলাইয়া এবং ভুবন | ৬৮ |
| অনুতোষের ঘর বাড়ি | ৮২ |
| আউট | ১০১ |
| মায়ের সঙ্গে হাসপাতাল অব্দি | ১০৭ |
| ধারে হয় না | ১২২ |
| লালইমলির শ্যামবাজার | ১৩১ |
| অবিশ্বাস | ১৪৭ |
| লোভী কুকুর ও ধূর্ত শিয়ালের গল্প | ১৬৪ |
| চাকরি | ১৭৬ |
| ক্রান্তি বলয় | ১৯১ |
| অপমান | ২০৪ |

# দাতা ও প্রার্থী

বেলা দশটার সময় ললিতমোহন দোতলার জানালা দিয়ে দেখলেন— বাড়ির সামনে তো বটেই, বাঁদিকে সেই হাটতলা পর্যন্ত আর ডানদিকে প্রায় বকুলতলা ছাপিয়ে শুধু কালো কালো মানুষের মাথা। এই অসম্ভব ভিড় তিনি সামলাবেন কি করে? বয়স্ক শরীর আর কথা শোনে না আজকাল। নইলে তিনি নিজেই বাইরে বেরিয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে বলতেন—তোমরা ফিরে যাও। বাইরের এই ভিড়ের সামনে দাঁড়াতে কিছুতেই কোনো সাহস পাচ্ছেন না ললিতমোহন। দোতলা থেকে ধীর পায়ে নিচে নেমে তিনি পুরনো গলায় বিশাল হাঁক দিলেন —নিতাই।

সিং-দরোজার কাছে দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে নিতাই ভিড় সামলাচ্ছিল। উল্টোদিকের বড় দরজা সকাল থেকে বন্ধ। অনেকবার বলা সত্ত্বেও কেউই কথা শুনছে না। লাইন সামলাবার জন্যে শংকর আর হরিপদ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। লাইন ঠিক রাখার কোনো চেষ্টা তো কেউ করছেই না বরং দুবার করে নেবার জন্যে অনেকেই ফিরে ফিরে আসছে। একটা করে ধুতি আর একটা করে গামছা নিতাইয়ের হাতে তুলে দিচ্ছে গোবিন্দ। আর সামনে বাড়িয়ে দেওয়া হাতগুলোতে ধুতি-গামছা তুলে দিচ্ছে নিতাই। সকাল থেকে এই ধুতি-গামছা হাতে তুলে দেওয়ার কাজটা ললিতমোহন নিজেই করছিলেন। ঘণ্টা তিনেক পরে তাঁর ক্লান্ত লাগল খুব। এর নাম দান। সামনের এগিয়ে আসতে থাকা লোকগুলোকে পূর্বজন্মের নিষ্ঠুর পাওনাদার মনে হচ্ছিল তাঁর। নিতাইয়ের

হাতে বিতরণের দায়িত্ব দিয়ে নিজে বাড়ির ভেতরে এসে দোতলায় উঠলেন। বাইরে ঠিক কত লোক আছে সেটা জানলা দিয়ে দেখবেন।

একতলার কোণের ঘরে ডাঁই করে সাজিয়ে রাখা ধুতি-গামছার পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে ললিতমোহন ঘেমে যাচ্ছিলেন। স্টক যা আছে তাতে অর্ধেক লোককেও দেওয়া যাবে না। যেন দুশ্চিন্তামুক্ত হবার জন্যেই আরো জোরে হাঁক দিলেন এবার—নিতাই।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর ললিতমোহন ভেবেছিলেন, হাজারখানেক লোককে তিনি ধুতি আর গামছা বিলোবেন। চাষবাস, কলকাতার ব্যবসাপত্তর, সময় পেলেই জুয়া-মদ্যপান, এসব করতে গিয়ে জীবিত থাকাকালীন স্ত্রীর দিকে একদম মনোযোগ দিতে পারেন নি ললিতমোহন। কলকাতার বাড়িতে দাস-দাসী নিয়ে হিমাংশুমালিনী অসুখে ভুগতেন আর কর্তাকে ডেকে আনার জন্যে লোক পাঠাতেন। লোকেরা ললিতমোহনের কাছে বকুনি খেয়ে ফিরে আসতো। অথচ এই হিমাংশুমালিনী চলে যাবার পর ললিতমোহনের মনে হল স্বর্গতা স্ত্রীর জন্যে তাঁর কিছু একটা করা উচিত। অনেক ভেবে তিনি এই ধুতি-গামছা বিলোবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বিলোতে গিয়ে এ-রকম বিপদ হবে জানলে……।

নিতাইকে এসে দাঁড়াতে দেখে ললিতমোহন বললেন, খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে হরিহরের দোকান থেকে আরো এক হাজার ধুতি-গামছা নিয়ে এসো। সিংদরজায় আমি বসছি।

নিতাই তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে ললিতমোহন বললেন, কি হল ?

নিতাই কোনও রকমে বলল, আজ্ঞে, হরির দোকানে অত ধুতি ··।

অত না থাকে যত আছে তত নিয়ে এসো। যাও। বলে আর দাঁড়ালেন না ললিতমোহন।

বাইরে গোবিন্দর পাশে বসে ললিতমোহন আবার তাঁর 'দান' শুরু করলেন।

বেলা একটার সময় ললিতমোহনের মনে হল, ভিড় একটুও কমেনি। দ্বিতীয়বার আনানো ধুতি-গামছাও ফুরিয়ে এল প্রায়। নিতাই আর গোবিন্দর হাতে বিতরণের ভার ছেড়ে দিয়ে ফের তিনি বাড়িতে ঢুকলেন। ওঠবার সময় নিতাইকে বলে এলেন, ফুরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে দিস। যারা পেল না তারা খানিকক্ষণ চেঁচামেচি করে ফিরে যাবে। বলে তিনি সোজা নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

নিচের রাস্তার সোরগোল এই ঘর থেকেই শোনা যাচ্ছে। শুয়ে শুয়েই সিংদরোজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলেন ললিতমোহন। সঙ্গে সঙ্গে সোরগোল তীব্র হল। যেন কেউ আক্রমণ করবে তাঁকে এক্ষুণি, সেই ভয়ে ললিতমোহন চোখ বুজে পাশ ফিরে শুয়ে পাশবালিশটাকে আঁকড়ে ধরলেন।

এই অবস্থায় ঘরে ঢুকে ললিতমোহনের সঙ্গে কথা বলবার সাহস এ বাড়িতে শুধু একজনেরই আছে। সে নীলা। মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাবার পর, একমাত্র ছেলে কলকাতার বাড়িতে থাকাটাই পছন্দ করত বলে, স্ত্রী হিমাংশুমালিনীও একদম এই গ্রামের বাড়িতে থাকতে চাইতেন না বলে, তিনকুলে কেউ নেই ধরনের বালবিধবা ওই নীলাকে খুব কমবয়সেই এখানে এনে রেখেছিলেন ললিতমোহন। রূপে, চেহারায় বা স্বভাবে সে হিমাংশুমালিনীর ঠিক উল্টো। হিমাংশুমালিনী অসম্ভব ফর্সা, শান্ত, নম্র, অভিজাত; আর নীলা নিকষ কালো, তেজী, দুরন্ত। কয়েক বছরের মধ্যেই নীলা এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়ল এই বাড়ির দেখাশোনার ব্যাপারে যে তার হাবভাব দেখে মনে হত, সে-ই দয়া করে ললিতমোহনকে বা তার পরিবারের লোকজনকে এ বাড়িতে থাকতে দিয়েছে। হিমাংশুমালিনীর সমর্পনসর্বস্বতায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে ললিতমোহন চাষ বাস দেখাশোনার উপলক্ষে দেশের বাড়িতে চলে এসে নীলার শাসন আর তর্জন গর্জন উপভোগ করতেন।

সেই নীলা এখন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে ললিতমোহনের পা টিপতে লাগল। বাইরের-ধুতিগামছা-না-পাওয়া খালি-গা কালো-কালো অনেক মানুষের চেঁচামেচির শব্দ এখনও ঘরের ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে। পা টিপতে টিপতে নীলা বলল, দান করতে হয় বলে সকাল থেকে উপোস করে থাকতে হয় এমন কথা কোন পাঁজিতে লেখা আছে শুনি? এক গাল মুড়িও তো সকাল থেকে পেটে পড়েনি। সেই কোন ভোরবেলা এক গেলাস দুধ খেয়ে সেই যে বাবু দানে বসলেন তারপর আর ওঠার নাম নেই। বলি এত পুণ্যি কোথায় রাখবে? বাইরের লোকগুলো যদি এখন সারাদিন দাঁইড়ে থাকে তো দোষ দেবে কাকে? সে যাক্‌গে যাক, তোমার টাকা তুমি ছড়াবে তাতে আমার কি, আমি বিধবা মানুষ, বছরে দুটোর বেশি তিনটে থান তো আমার কপালে জোটে না। তা এই ভর দুপুরে নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে ভেটকি মেরে শুয়ে থাকে কোন ভদ্দর লোক?

ললিতমোহন ধমকে না উঠলে হয়তো সারা দুপুর বকে যেত নীলা। কথা বলতে বলতে দু-হাতে পা-ও টিপে যাচ্ছিল নীলা। ললিতমোহন আস্তে আস্তে উঠে বসে জলদগম্ভীর গলায় বললেন, তুই থামবি? তারপর বিশাল পালঙ্ক থেকে নেমে আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, কই, তেল কই, গামছা কই?

নীলাও প্রায় সমান মেজাজে সরু গলা উঁচু পর্দায় তুলে বলল, কলতলায় সবই দেওয়া হয়েছে! দয়া করে এখন নিচে নামলেই হয়।

বিনা বাক্যব্যয়ে এরপর ললিতমোহন পিছন বাড়িতে পাঁচিলঘেরা কলতলার দিকে চলে গেলেন। স্নানের সময়ে সেদিকে অন্য কারো যাওয়া নিষেধ।

ফি বছর দোলের দিন হাটতলায় মেলা বসে। মেলার ভিড়ের আড়ালে পিছনের দিকে ঘুর্ণি ছক্কা নিয়ে জুয়ার আসর বসাতে দূর গ্রাম থেকে লোক আসে। ললিতমোহনকে সেদিকে আসতে দেখলে তারা পর্যন্ত বলে উঠতো, না না, আপনাকে আমরা খেলতে দেব না বোসবাবু। তারা জানতো

ললিতমোহন ঘণ্টাখানেক শুধু বসে বসে খেলা দেখবেন। তারপর কেবল একবার একটা মোটা দানের বাজি ধরবেন আর জুয়াওয়ালাকে নিঃস্ব করে প্রায় তার সব টাকা জিতে নেবেন। শেষ পর্যন্ত অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করতে করতে তাকে গাঁ ছাড়া করে ছাড়বেন একদম।

নিতাই, শংকর, হরিপদ, গোবিন্দ—এরা সবাই ললিতমোহনের অনুগ্রহপুষ্ট। দান উপলক্ষে সবায়েরই আজ ললিতমোহনের বাড়িতে পাত পড়ার কথা। খেতে খেতে সবাই গলা মিলিয়ে যে কথাটা বার বার বলাবলি করল তা হল, এত বিরাট দানযজ্ঞ এ গ্রামের কেউ কোনদিন দেখেনি। নিতাই বলল, আমি তো নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতুম না কেউ এত ধুতি-গামছা এমন করে বিলোতে পারে। হরিপদ বলল, এত লোক যে কোত্থেকে এসে গেল কে জানে। সব মিলে তা প্রায় হাজার দুয়েক লোক হবে। কিরে শংকর, দু-হাজার হবে না? গোবিন্দ বলল, কত লোক যে আজ বাবুকে আশীর্ব্বাদ করে গেল। কত্তা-মা ওপর থেকে সব দেখে খুব খুশি হবে। এ কথার পর খানিকক্ষণ নিঃশব্দে খাওয়াদাওয়া চলল। শংকরের একবার বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, যারা পেলে না তারা খুব খারাপ ভাষায় গাল পাড়ছিল। উচিত হবে না ভেবে সে কথাটা বেমালুম চেপে গেল। আর একটা কথাও তার বলতে ইচ্ছে করছিল খুব। ধুতি-গামছা যারা পেয়েছে তারা যাবার সময় মুখে বার বার 'জয় হোক' বলে গেলেও মনে মনে হিসেব করছিল—তার ধুতিটা অন্যজনের চেয়ে খারাপ কিনা। কত্তামার আত্মার শান্তির জন্যে যে এই দানধ্যান করা হচ্ছে—ধুতি গামছা হাতে পাবার পর কথাটা কারো মনে থাকছিল না। শংকর সেটা হলফ করে বলতে পারে। হরিপদ বলল, এত লোককে ধুতি দিলুম নিজের হাতে....এখন নিজেদের জন্যে আধখানা গামছাও পড়ে নেই। বলে হা-হা করে হাসতে লাগল যেন ঘটনাটা খুব মজার। নিতাই শংকর গোবিন্দ তিনজনেরই মুখ দেখে মনে হল, তারাও অনেকবার

কথাটা ভেবেছে কিন্তু মুখ ফুটে বলে ফেলবার সাহস হয়নি কারুরই। এখন নিতাই একটু রাগ রাগ গলায় বলল, ব্যাটা, তোর এতই যদি ধুতি নেবার ইচ্ছে ছিল তো নিজেই গিয়ে লাইনে দাঁড়ালে পারতি। হরিপদ বেশ বোকা বোকা মুখ করে বলল—আমি কি তাই বলেছি নিতাইদা, খামোকা রাগ করো কেন ?

তিন মেয়েকেই ললিতমোহন পার করেছেন বেশ ঘটা করে। বড় জামাই ব্যাংকের অফিসার, মেজ জামাইয়ের চন্দননগরে ঢালাও কাঠের আর কয়লার ব্যবসা, ইদানীং নাকি সিমেন্টের কারবারও করছে সে। ছোট জামাই প্রবাসী ইঞ্জিনীয়ার। একমাত্র ছেলে ডাক্তার হয়ে কলকাতার বাড়িতেই চেম্বার করেছে, বৌমাও ডাক্তার। কলকাতার বাড়িটাকে নার্সিং হোম করে ফেলার ঝোঁক দেখে ছেলের সঙ্গে বেশ ভালরকম একটা বিবাদ পাকিয়েছেন ললিতমোহন। নিজের ব্যবসা বা জমিজমা দেখা-শোনার জন্যে কেউ উৎসাহী নয় দেখে ললিতমোহন ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাচ্ছিলেন ধীরে ধীরে। রুচিবান শিক্ষিত ডাক্তার ছেলের সঙ্গে কোনো ব্যাপারেই তেমন বনে না বলে, ছেলের ডাক্তার বৌকেও পুত্রবধূর মতন কাছে পান না বলে, কলকাতার ব্যবসাপত্তর বেচে দিয়ে শেষ বয়সটা তিনি দেশেই থাকবেন ঠিক করেছেন। আসলে গ্রামের লোকেরা তাকে দেখলে যেরকম ভক্তিমান্য করে সেই গদগদ ভাবটা ললিতমোহন উপভোগ করেন খুব। হিমাংশুমালিনী চলে যাবার পরে কলকাতার বাড়িতে তাঁর নিজেকে ভারি অনাহূত মনে হত। জীবিত অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে ভালো করে কথা বলা হয়নি বা বেশিক্ষণ মন দিয়ে সময় কাটানো হয়নি বলে আজকাল বেশ আক্ষেপ হয় তাঁর।

পাকাপাকিভাবে দেশে থাকা শুরু করে প্রথমেই স্কুলের শিক্ষকদের জন্যে একটা 'শিক্ষকাবাস' তৈরী করে দিলেন ললিতমোহন। দেয়ালে পাথরের ফলকে লেখা রইল—দাতা শ্রীললিতমোহন বসু কর্তৃক প্রদত্ত

অর্থে নির্মিত। হিমাংশুমালিনীর নামে একটা মেয়েদের স্কুলও করে ফেলার ইচ্ছে তিনি জানিয়ে রেখেছেন।

দুপুরে একটা হালকা ঘুম দিয়ে উঠে ছড়ি হাতে পায়চারি করতে বেরোলেন ললিতমোহন। এখানকার পথঘাট, ডোবা-পুকুর গাছপালা ধানক্ষেত সবই ললিতমোহনের আজন্ম পরিচিত। ইস্কুলের মাঠে দূর থেকে ফুটবল খেলা দেখতে দেখতে খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে হয়—ওই মাঠে আমিও কত বল পিটিয়েছি। ছেলেরা আজকাল হাটতলার মোড়ে একটা লাইব্রেরি করেছে। তিনটে আলমারিতে নাকি তাদের সব বই ধরছে না। ললিতমোহনকে নতুন একটা আলমারির জন্যে ছেলেরা খুব করে ধরেছে। লাইব্রেরি জিনিসটা ললিতমোহনকে তেমন টানে না বলে আর কেউ কিছু চাইলেই সেটা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিতে থাকলে সবাই পেয়ে বসবে বলে তিনি পরিষ্কার করে কোনো কথা না দিয়ে ছেলেদের বলেছেন, ভেবে দেখি। কয়েক বছর আগে সরকার থেকে লাইব্রেরিকে একটা টেলিভিশন দিয়েছিল। ঘন ঘন খারাপ হয়ে যেত বলে আর বার বার চাঁদা তুলে টিভি সারানো, তাও অন্য জায়গা থেকে মেকানিক ধরে এনে, সম্ভব হত না বলে দীর্ঘদিন সেটা অকেজো হয়েই পড়েছিল। ললিতমোহন এককথায় টিভিটা সারিয়ে দিয়েছেন এই শর্তে যে লাইব্রেরির ছোট্ট ঘরের বদলে টি-ভি সেট-টা ললিতমোহনের বাড়ির আটচালায় রাখতে হবে। ললিতমোহন জানতেন, আপত্তি কেউ করবে না। করেওনি।

সন্ধের আগেই ভ্রমণ থেকে ফিরে ললিতমোহন দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে এলিয়ে পড়লেন। নিচে আটচালায় টিভি দেখার ভিড়। বাড়িতে টিভি টা এনে রাখার ব্যবস্থা করলেও ললিতমোহন নিজে কখনো টিভি দেখেন না। অন্যান্য দিন কেউ কেউ এই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে। আজ তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, কারুর সঙ্গে তিনি দেখা

করতে চান না। ছোটবেলার বন্ধু অনন্ত চক্রবর্তী এই সময়টা দাবা খেলতে আসে তাঁর সঙ্গে। ললিতমোহন আজ তাকেও ফিরিয়ে দিয়েছেন। পুরনো আমলের দোতলার বারান্দা বেশ উঁচু। এখানে বসে অনেক দূর পর্যন্ত গাছপালা, ধানক্ষেত, সেখানে ছড়িয়ে থাকা খোলামেলা জ্যোৎস্না —বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। ইজিচেয়ারে বসে সেইসব দেখতে দেখতে সন্ধে গড়িয়ে গেল। রাতের রান্না শেষ করে নীলা এসে পায়ের কাছে বসে চুপচাপ পা টিপতে লাগল। ললিতমোহন তাকে কিছু বললেন না। বেশ কিছুক্ষন নীলাও কোনো কথা বলল না।

খানিক আগে টিভি শেষ হয়েছে। আটচালাটা নিঃশব্দ, ঠাণ্ডা। আলো নিভিয়ে রাখার জন্যে দোতলার বারান্দায় সরাসরি জ্যোৎস্না আসছে। প টিপতে টিপতে নীলা বলল, বুকে চাঁদ লাগছে যে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ললিতমোহন বললেন, লাগুক।

কোলের ওপর ললিতমোহনের পা-দুটো তুলে নিয়ে নীলা টিপে যেতে লাগল। তার চুলে, চোখে, শরীরে জ্যোৎস্নার প্রলেপ। আধো-অন্ধকারে ললিতমোহন যেন নীলাকে জীবনে প্রথমবার খুব মন দিয়ে দেখলেন পরিস্কার মনে হল, তাঁর পা টিপে দেওয়া ছাড়া নীলার জীবনে আ দ্বিতীয় কোনো প্রশান্তি নেই। চলে যাবার আগে হিমাংশুমালিনী f খুব কষ্ট পেয়েছিল? সে কথাও একবার ভাবলেন ললিতমোহন। নিজে মন থেকেই উত্তর পেলেন—মনে তো হয়না। মমতাময় গলায় ললি মোহন ডাকলেন, নীলা।

পা টিপতে টিপতে নীলা বলল, বলো।

তুই আগে মরবি না আমি আগে মরবো বল্ তো।

অন্য সময় হলে নীলা সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠতো। কিন্তু এ ললিতমোহনের কথা বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যে নীলা ঃ দেখাতে ভুলে গেল। একটু চুপ করে থেকে বরফে ভেজানো গলায় ব

আমি মরলে তো আর তুমি ঘটা করে ধুতি-গামছা বিলোতে বসবে না। মরে আমার লাভ কি ?

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন ললিতমোহন। মুখে কোনও কথা এল না। শুধু সম্পূর্ণ অনাত্মীয় ওই বিগতযৌবনা তাঁর-পা-টিপতে-থাকা বৃদ্ধাটির উদ্দেশ্যে মনে মনে কোনরকমে বললেন, সেই ভালো। যেন তোর আগেই চলে যেতে পারি—তুই আমাকে অন্তত এইটুকু দয়া কর নীলা।

## পুনরুদ্ধার

গৌরবের একটা অর্ধবৃত্তাকার চালচিত্র নিজের চারপাশে এঁকে রাখতে ভালবাসতেন দিবানাথ। শহরে সে কাজে পরিশ্রম বেশি বলে দিবানাথ তাড়াতাড়ি ভলাণ্টারি রিটায়ারমেণ্ট নিয়ে চলে এলেন গ্রামে।

আরকিওলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার এক কামরার ঘরে সারাজীবন চাকরি করেছেন দিবানাথ। মাটি খুঁড়ে পাথর বের করে তা দিয়ে আলমগীরের আমলের সমাজকাঠামো বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। নালন্দা নিয়ে গবেষণামূলক বই আছে দিবানাথের। সরকারি পয়সায় প্রকাশিত এবং বিশেষ মহলেমাত্র প্রচারিত বলে বাইরের লোক দিবানাথের প্রতিভা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। চারপাশের মানুষের এই অজ্ঞতাজনিত তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখকে হজম করে নিয়ে সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন দিবানাথ। তিনি তো অজ্ঞ নন। পুরনো দামী দামী জিনিস নিয়ে মাথাব্যথা করার কার আর অত সময় আছে। যাক গে।

নেতাজী সুভাষ বোস ছাড়া ভারতের রাজনীতির জগতে আর কোন ব্যাটাছেলে নেই। এরকম বিশ্বাসের জন্যে দিবানাথ বসু সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের ঘাত প্রতিঘাতে একদম বিচলিত হন না। অফিসের অধস্তন কর্মচারীদের তিনি প্রায়ই বলে থাকেন—ওই সব ছেঁড়া নেতাদের ছেঁড়া পলিটিক্সের গপ্পো আমাকে শোনাতে আসবে না। আই ডোণ্ট লাইক ইট।

অফিস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মার্কসপন্থী নেতা বিলাস রায় কথা বলতে এলেই দিবানাথ মোটা গোঁফ নাড়িয়ে বলে থাকেন—তুমি এরকম

বেঁকে যাচ্ছ কেন বিলাস? বড্ড আন্দোলনের চাপ বুঝি? অম্বল আর আন্দোলন তো একসঙ্গে হয় না ভাই। আন্দোলন করতে গেলে একটু সোজা থাকার দরকার।

কোন কোন দিন পরিষ্কার চেপে ধরেন বিলাসকে—তোমাদের দেশে এখন মোট কটা পলিটিক্যাল পার্টি আছে বলো তো? হিসেবটা আমার খুব গুলিয়ে যায় আজকাল। নকশালদের মোট কটা ফ্যাকশান তুমি ঠিক ঠিক জান নাকি? তোমার কাছে একটা রোগামতন ছেলে মাঝে মাঝ টাকা চাইতে আসত না? আজকাল আসে?

কিংবা কোনদিন হয়ত বলতেন—মেয়ের বিয়ের জন্যে ছেলে পেলে? খবরদার কিন্তু তোমার মতন কোন লীডার টাইপের কোন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিও না যেন! কোনদিন বাপের বাড়ি এসে বলে বসবে, বাবা-তুমি কি রিঅ্যাকশনারী? বাবা, তুমি কৃষিবিপ্লব কর না কেন!

প্রচণ্ড রেগে গেলেও বিলাস রায় দিবানাথকে ঘাঁটাতে চান না দুটি কারণে। দিবানাথের সঙ্গে মনান্তর হলে নিজের দলের জোর কমে যাবে। আর, উত্তেজিত হয়ে গেলেই দিবানাথ ঝাড়া পৌনে এক ঘণ্টা ধরে নেতাজীর রাজনৈতিক কোন গল্প শোনাবেন। শুনতে খারাপ না লাগলেও অফিসের নেতা হিসেবে বিলাসের সময় নষ্ট।

নেতাজীর ওপর অতিরিক্ত শ্রদ্ধাভক্তির কারণে নিজের জীবনে রাজনীতি করার কথা যেমন কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেননি দিবানাথ, তেমনি মাটি খুঁড়ে পুরানো গৌরবময় ইতিহাস খুঁজে বের করার কাজে এমন মগ্ন ছিলেন সারাজীবন, যে কোনদিন কোন ধর্মগ্রন্থের পাতা উল্টে দেখার সাধ বা সময় কোনটাই হয়নি দিবানাথের।

ফেয়ারওয়েলের দিনে তাই দুটি ভিন্নধর্মী বই উপহার পেয়ে বিহ্বল হয়ে গেলেন দিবানাথ। সাধারণ সহকর্মীরা দিল 'কথামৃত'। বিলাসের দল থেকে দিল 'দাস ক্যাপিটাল'।

কমবয়সে এক সামান্য প্রেমিকা তাঁকে কলা দেখিয়েছিল বলে অভিমানে আর বিয়েই করেননি দিবানাথ। মেয়েদের তিনি নানা কারণে সাঙ্ঘাতিক অপছন্দ করেন। তবু কান্না জিনিসটা একেবারে সহ্য করতে পারেন না বলে দুই ভ্রাতৃবধূ ও এক বিধবা বোনকে বরাবর অর্থ ও স্নেহ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাদের কলকাতায় ফেলে রেখে প্রায় গোডাউন হয়ে যাওয়া পৈতৃক ভিটেতে চলে আসতে তাঁর বেশ কষ্ট হল। দুই ভাইয়ের ছেলে মেয়েদের অনেক আদর আবদার সহ্য করতেন তিনি। তাদের ছেড়ে আসতে গিয়ে টের পেলেন, নিজের নীরস বাহ্যিক চেহারাটার ভেতরে একজন স্নেহময় সংসারী মানুষ ঘাপটি মেরে বসে ছিল। আপাত নিরীহ মাটির অনেক ভেতরে যেমন থাকে গৌরবময় অতীতের উষ্ণ স্মৃতি নিয়ে কোন মৃত প্রস্তরখণ্ড।

বিধবা বোন, কথামৃত আর ক্যাপিটাল নিয়ে দিবানাথ চলে এলেন বাঁধপুর। সেখানে একমাত্র খুড়তুতো ভাই জমিজায়গায় চাষবাস, আর স্কুলমাস্টারি দিব্যি চালিয়ে আসছিল এতদিন। সঙ্গত কারণেই দিবানাথের ফিরে আসাটা তার ভাল লাগল না। দিবানাথের বাবা অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবার পর মা আর ভাইবোনদের নিয়ে রুটির ধান্দায় কলকাতায় গিয়েছিলেন দিবানাথ আর সেই সুযোগে বাঁধপুরের বিষয়-সম্পত্তি চলে গিয়েছিল কাকার হাতে। নিজে সরকারি অফিসার হয়ে, ভাইদের পড়ার খরচ দিয়ে, চাকরি নিয়ে ব্যস্ত থেকে, বাঁধপুরের জমিটমি নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই ভেবেছিলেন। খুড়তুতো ভাইয়ের ব্যবহার দেখে মনে হল, ভুল করেছিলেন। মা মারা গেছেন অনেকদিন। নিজের বাড়িতে তাই নিজের বসবাসের জন্যে একখানা ঘর জোর করে দখল করতে হল দিবানাথকে।

বাবার ঈশ্বরসন্ধানে যাবার পর থেকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্যে, নিজের প্রত্যেকটা তুচ্ছ অধিকার আদায় করে নেওয়ার জন্যে চিরকাল

অসম্ভব যুদ্ধ করতে হয়েছে দিবানাথকে। একটি মেয়ের ওপর অভিমান করে আর বিয়েই করলেন না দিবানাথ, তাঁর চাকরি পাওয়া পর্যন্ত মেয়েটি অপেক্ষা করতে পারেনি বলে, আর সে কারণেই যেমন সব মেয়েকেই তিনি অপছন্দ করে এসেছেন চিরকাল, অনেকটা একইরকম অভিমানে দায়িত্ববোধহীন মানুষজন দেখলেই তিনি রেগে যান; সংসারের দায় উপেক্ষা করে নিজের বাবা ঈশ্বরসন্ধানে চলে গিয়েছিলেন বলে ঈশ্বর নামের এক অজানা অস্তিত্বের ওপরও তাঁর গভীর রাগ আছে। আছে অনিরুদ্ধ অভিমান।

বড়দার বাঁধপুরের নতুন সংসারে চমৎকার মানিয়ে নিলেন নিজেকে দিবানাথের বিধবা বোন চন্দ্রা। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে খিড়কির পুকুরের দিকে যেতে গেলেই একটা টিয়াপাখি কোত্থেকে এসে ঠিক তার মাথার ওপরে বসবেই। চন্দ্রা তার নাম রেখেছে মনসোনা। গলায় তার লাল কণ্ঠি।

বাঁধপুরের পাশেই চন্দ্রকেতুগড়। রাজা চন্দ্রকেতুর। গড় এখন ধ্বংসস্তূপ; উঁচু উঁচু ঢিবি ছাড়া আজ কিছুই নেই আর সেখানে। পাশেই খনার ঐতিহাসিক বাড়ি। আজকাল রোজ ভোরবেলা চন্দ্রকেতুগড়ের ভাঙাচোরা ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে খনার বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকেন দিবানাথ। পৃথিবীতে প্রত্যেক মুহূর্তে কত ভাঙচুর হচ্ছে পাল্টাপাল্টি হচ্ছে সবকিছু, তবু কতকাল আগেকার এই সামান্য মহিলার উপলব্ধি আজও সত্য। কি সেই শক্তি যা থাকলে বাস্তবের তুচ্ছতার আবরণ ভেদ করে অনন্ত ও চিরন্তন সত্যকে একটুখানি ছোঁয়া যেত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাড়ি ফিরে এসে দিবানাথ খুলে বসেন ক্যাপিটাল কিংবা কথামৃত। নেতাজীর কথা আজকাল তাঁর আর মনে পড়ে না তেমন।

শহরে কেমন যেন কাউকে পাত্তা না দেওয়ার একটা আবহাওয়া আছে। পথে বেরিয়ে নিশ্চিন্তে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়াটাই কঠিন ব্যাপার—সমস্যা সেখানে পদে পদে। এই বাঁধপুরের ঠিক বিপরীত পরিবেশে দিবানাথের বেশ ভালই লাগে। এখানকার মালিন্যহীন নির্মল বাতাসে একধরনের সহজ নিশ্চিন্তি আছে যা সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে গেলে মানুষের খুব দরকার।

একদিন বাজার থেকে ফেরার পথে দিবানাথ দেখলেন, এক গরীব বামুন দোকানে দোকানে নিত্যপূজা শেষ করে দশ বারো বছরের রোগা লিকলিকে নাতনির হাত ধরে একটা মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামগঞ্জের এইসব মিষ্টির দোকানে সকালে বিকেলে তেলেভাজাও বিক্রি হয়। নাতনিটি বায়না ধরেছে ফুলুরি খাবে। গরীব পূজারী দাদু তাকে সমানে বোঝাতে চাইছেন, ফুলুরি নেই মা, সব বিক্রি হয়ে গেছে। বাচ্চা মেয়েটি তীক্ষ্ণ খুনীর দৃষ্টিতে দোকানের কাঁচের বাক্সের এক কোণে পড়ে থাকা একটিমাত্র ফুলুরির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, দাদু—দাদু, ওই তো, ওই তো একটা আছে।

সেদিন বাড়ি ফিরে এসে দিবানাথ ঝড়ের মত ক্যাপিটাল পড়ে গেলেন।

আরব একদিন প্রাতঃমণ সেরে ফেরার পথে দেখলেন, এক অশীতিপর বৃদ্ধ লাঠি ঠুকে ঠুকে হাঁটছেন আর বলছেন—কলি, কলি, ঘোর কলি। প্রতিক্রিয়া, সব হল অনাচারের প্রতিক্রিয়া। যাবে, যাবে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁকে চিনতে পেরে থমকে দাঁড়ালেন দিবানাথ। সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই প্রভাকর দীর্ঘাঙ্গি। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন, চিনতে পারছেন, স্যার।

ঘোলাটে চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রভাকর দীর্ঘাঙ্গি যথারীতি চিনতে পারলেন না। পরিচয় জানিয়ে দিবানাথ বললেন—আমার মনে

আছে, আপনি আমাদের সংস্কৃত ক্লাশে রোজই বলতেন, ব্যাকরণের বেড়া ডিঙ্গিয়ে একবার যদি রসের বাগানে ঢুকতে পারিস, ওরে এঁড়ে গরুর দল—কী মজা যে পাবি। বলতেন—জীবনের বাপারটাও ঠিক ওইরকম। পরিশ্রমের ব্যাকরণকে যারা ভয় পেয়ে ফাঁকি মারে, রসের সাগর বাদ দিয়ে তাদের ভাগ্যে পচা পানাপুকুর, নাইতে গিয়ে চুলকুনি হয় আর চুলকোতে চুলকোতে জীবন যায়। আমি কিন্তু জীবনের ব্যাকরণকে ভয় পাইনি স্যার।

সে আমি তোমায় দেখেই বুঝেছি বাবা। বলে অদ্ভুত মমতা নিয়ে হাসলেন প্রভাকর দীর্ঘাঙ্গি। দিবানাথ দেখলেন, বলিরেখাবহুল বৃদ্ধের মুখের সে হাসির ঐশ্বর্য ব্যাখ্যার অতীত!

কথায় কথায় প্রভাকর বললেন—মানুষজন আজকাল কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে দিবানাথ। কেউ কারুর দিকে তাকায় না। রাস্তায় মড়া পড়ে থাকলে মাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। এরা সব মানুষ না পাঁঠা।

সেদিন বাড়ি ফিরে দিবানাথ পড়তে লাগলেন কথামৃত।

রান্না করতে করতে গুনগুন করে গান গাইছিলেন চন্দ্রা। তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার। নামাতে পারি যদি মনভার। ভাইপোদের প্রাইভেট টিউটর তাঁকে আজকাল খুব সিনেমার গল্প বলছে।

হঠাৎ পেছন থেকে ঝুরঝুর জাতীয় শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, ওপর থেকে দেয়াল ধ্বসে গিয়ে দরজার মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে। চন্দ্রা চিৎকার করে উঠলেন—বড়দা!

দিবানাথ ছুটে এসে সব দেখে সঙ্গে সঙ্গে খুড়তুতো ভাই প্রিয়নাথকে ডেকে বললেন—বাড়ী সারাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তুই কত টাকা দিতে পারবি বল।

শান্ত ও উদাসীনভাবে প্রিয়নাথ বলল—পাই পয়সাও দিতে পারব না।

তোর নিজের মাথায় যদি আজ ছাত ভেঙ্গে পড়ে? জানতে চাইলেন দিবানাথ।

সে আমি বুঝব। বলে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল প্রিয়নাথ।

রাগে গুম হয়ে গেলেন দিবানাথ। একবার ভাবলেন, এর চেয়ে কলকাতায় ফ্ল্যাটবাড়ির লোডশেডিংয়ের পচা পরিচয়হীন অন্ধকার অনেক ভাল ছিল। তারপরই ঠিক করে ফেললেন—এ বাড়ি তিনি নিজেই সারাবেন। সঞ্চিত অর্থ তাঁর খুব একটা কম নেই।

চন্দ্রা বলল—এ বাড়িতে ঘুণ ধরে গেছে বড়দা। সারাতে গিয়ে যে টাকাটা নষ্ট করবে তা দিয়ে জমি কিনে বাড়ি করে নাও।

এই বয়সে বাড়ি? অতি দুঃখে মানুষের একরকম হাসি আসে। দিবানাথ সেইভাবে হেসে বললেন—আর হয় না। তাছাড়া নতুন বাড়িতে থাকবে কে? তুই আর আমি? ধুর! সারিয়ে সুরিয়ে এ বাড়িতেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব।

বাড়ি সারাবার জন্য সিমেন্টের সন্ধান করতে গিয়ে অনেককিছু জেনে গেলেন দিবানাথ। কালোবাজারেও সিমেন্ট পাওয়া রহস্যময় এবং দুর্লভ। সাদা বাজারে পেতে গেলে সরকারের কাছে দরখাস্ত করতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে বাড়ির ট্যাক্সের বিল কিংবা জমির দলিলের কপি। নিজের নামে দিবানাথের কোনটাই নেই। প্রিয়নাথের কাছে খোঁজ করে জানলেন বাড়ির ট্যাক্স দীর্ঘদিন দেওয়াই হয় না!

ডিলারের সঙ্গে সসম্মান আলোচনার পর পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে দেখা করবেন ঠিক করলেন দিবানাথ। তার হাত দিয়েই যখন সিমেন্টের দরখাস্ত পাঠাতে হবে তখন তাঁর সঙ্গে কথা বলাই ভাল।

পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে দেখলেন পঁচিশ বছরের ছোকরা অতনু পাল গত নির্বাচনে 'প্রধান' হয়েছে। বন্ধুদের নিয়ে তাস খেলছে সে। ডজনখানেক গাঁয়ের সর্বময় প্রভু এই পঁচিশ বছরের ছোকরা! এখানকার

সি পি এম-এর এম-এল-এর মেয়ের সঙ্গে অতনুর বিয়ের কথা তিনি কানাঘুষোয় শুনেছিলেন; বিশ্বাস করতে চাননি। সুবিচারের আশা সুদূরপরাহত বলেই কি পঞ্চায়েত অফিস ফাঁকা। তিনি গম্ভীরভাবে ডাকলেন—অতনু।

কে? ও, জেঠামশাই। এখানে কি চাই? তাস খেলতেই উত্তর দিল অতনু।

এইটুকু ছেলে তাঁকে উপেক্ষা করছে দেখে ভয়ঙ্কর রেগে গেলেন দিবানাথ। সঙ্গে সঙ্গে চলে যাওয়ার তীব্র ইচ্ছেটা দমন করে তিনি বললেন—বাড়িটা সারাবার জন্যে আমার কিছু সিমেন্টের দরকার ছিল অতনু। ফর্ম ফিলআপ করে এনেছি। আমার তো ট্যাক্সের বিল নেই, প্রিয়টা ট্যাক্স দেয় না অনেকদিন। এখন আমি একসঙ্গে দিতে গেলে মুশকিল হবে। আমার নিজের নামে কোন জমিও নেই যে…।

অতনু একটি ছেলের দিকে ইঙ্গিত ভাবে তাকাতে সে বলে উঠল আপনি এই গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার অনুমতি চেয়ে প্রধানের কাছে আলাদা একটা দরখাস্ত দিন। দরখাস্তের সঙ্গে বাসস্থান সংস্কারের প্রয়োজনের কথাটাও লিখবেন। আর সিমেন্টের দরখাস্তটা সঙ্গে জুড়ে দেবেন।

'আচ্ছা'—বলে কোনরকমে উঠে এলেন দিবানাথ। মাথায় আগুন জ্বলছে তাঁর। সিমেন্ট দরকার বলে ওইটুকু ছেলের কাছে এ গ্রামে বাস করার জন্যে অনুমতি চাইতে হবে তাঁকে?

সেদিন রাত্রে দিবানাথের অবস্থা দেখে সব শুনে চন্দ্রা বলল, হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্যে অপেক্ষা করাই ভাল বড়দা। অতনুর কথায় তুমি রাগ কোরো না।

কোনো উত্তর না দিয়ে ক্যাপিটালের মলাটের মার্ক্সের ছবির দিকে তাকিয়ে দিবানাথ নিঃশব্দে বললেন—মানুষের আসল ঝামেলা তার মনকে নিয়ে। সেই মনটাকে বাদ দিয়ে দিলে কেন? ভবিষ্যতের পৃথিবী যে তাদের মন থেকে তোমায় একদম মুছে দেবে সাহেব।

তারপর কথামৃতের মলাটের রামকৃষ্ণকে মনে মনে বললেন—তোমার দেশের সব লোক কবে অ আ ক খ শিখবে বলোতো? পেট পুরে যারা খেতেই পায়না তাদের আবার ঠাকুর কুকুর।

কোথায় যেন মাদল বেজে উঠল। দিবানাথ জিজ্ঞেস করলেন—মাদল কোথায় বাজে রে?

চন্দ্রা বলল—মাঝিপাড়ায় সাঁওতালদের বিয়ে। খুব নাচগান হয়। দেখতে যাবে?

দিবানাথ বললেন—চল। তাই যাই। ওদের কোন ক্যাপিটালও নেই, কথামৃতও নেই। বোধহয় দরকার হয় না।

# যাওয়া হলো না

কাল মন্দিরার পরীক্ষা শেষ হবে। অফিস থেকে গিয়ে মন্দিরাকে নিয়ে আসতে পারবে ?

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে সমীর স্ত্রীর অনুরোধ শুনল। শোনার পর স্পষ্টত আয়নার মধ্যে নিজের অলীক সত্তার চোখেমুখে গোপন আনন্দের শিহরণ ও ঝলক দেখতে পেল সমীর।

চুল আঁচড়ানোর সময় নিজের চেহারাটা সবারই খুব মমতাময়, খুব আপন মনে হয়। এমনটি আর কে আছে!

ঠিক এমনটি আর সত্যিই কেউ নেই। প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রেই কথাটা সত্যি। মনে পড়তে সমীর হাসলো।

ইন্দিরা ঘড়িটা এগিয়ে দিয়ে বলল, হাসছো কেন ?

সমীর বলল, তোমার কথায় না। অন্য একটা কথা মনে পড়ে গেল।

ইন্দিরা বলল, মন্দিরার তো সিঙ্গল ফেয়ার ডাবল-জার্নি। আমরা গেলে, টোটাল টিকিটের দাম কত হবে হিসেব করা দরকার। দমদম-ইমফল এখন কত হয়েছে ?

সমীর বলল, জেনে আসবো।

## ২

অফিসে কাজের ফাঁকে এয়ারলাইনসে ফোন করে জেনে নিল সমীর, মণিপুরের ভাড়া তিনশো অষ্টআশি টাকা। মন্দিরার সিঙ্গল আর নিজেদের টোটাল ফেয়ার মোট প্রায় দু-হাজার পড়ে যাবে—উনিশশো চল্লিশ টাকা।

বিয়ের পর তিন বছর কোথাও যায়নি। মণিপুরে মন্দিরার কলেজের

বন্ধুর বাড়ি, ফরেস্ট অফিসার বাবা, জীপ পাওয়া যাবে ফ্রিতে। ঠিক হনিমুন নয়, সেরকম মানসিকতাই নেই ইন্দিরার, বছরের শেষে বেড়াতে যাওয়ার মধ্যবিত্ত চেষ্টা, যেরকম হয়, তাও অনেকটাই মন্দিরার আগ্রহে। ছুটির আগে বাথরুমে চোখেমুখে জল দিতে দিতে চকিতে একটা চিন্তা মাথায় ঘুরে গেল সমীরের। ইন্দিরার বদলে মন্দিরা যদি তার বৌ হত।

ছুটির পর সুবিমলের সঙ্গে ধর্মতলায় বড় ফাইভ-স্টার হোটেলের নিচে দাঁড়িয়ে লোকজন দেখতে দেখতে আড্ডা দেওয়ার একটা রুটিন আছে সমীরের। আজ খুব অর্থহীন লাগল পুরো ব্যাপারটা। সুবিমলকে 'শরীরটা খারাপ লাগছে বলে' সমীর হরলাল কলেজের হোস্টেলে চলে এল। গেস্ট রুমে বসে একটা সিগারেট ধরাতেই হাল্কা সবুজ শালোয়ার কামিজ পরা মন্দিরা এসে বলল, ওমা, আপনি!

সমীরের পক্ষে যতখানি সম্ভব ততখানি রোমান্টিক স্বরে বলল, কেন, আশাভঙ্গ হল বুঝি?

শরীর কাঁপিয়ে মন্দিরা জলতরঙ্গের মতন হাসল। ইন্দিরা জীবনে কোনদিন এইভাবে হাসতে পারবে না। চাকরি আর সংসার যারা একসঙ্গে করে তাদের হাসি স্বতঃস্ফূর্ত হয় না। সমীর মনে মনে শালোয়ার কামিজের আবিষ্কারককে অসংখ্য ধন্যবাদ দিল। হাসি কমলে মন্দিরা বলল, আমি আশা করাই পছন্দ করি না, আশাভঙ্গের আর স্কোপ কোথায়?

সমীর বলল, মণিপুর যাওয়াটা তাহলে—

ওমা, মণিপুর তো তাংবি নিয়ে যাচ্ছে, আমি তো যেতে চাইনি সমীরদা।

তাংবি? অদ্ভুত নাম তো। তাংবি—মানে কি?

ক্রিপার—লতা, লতা!—একটু বসুন, আপনার চা নিয়ে আসি।

চা থাক। তুমি নিজেই তৈরি হয়ে এসো। দিদির অর্ডার, তোমাকে

ধরে নিয়ে যেতে হবে।

মনে হচ্ছে আপনি বেঁধে নিয়ে যেতে চান—বলে আবার সারা শরীর কাঁপিয়ে হাসলো মন্দিরা।

হরলাল কলেজের হোস্টেলের গেস্টরুমে বসে বসে সমীর একটা সবুজ পাহাড়ি ঝর্ণার মধ্যে ভেসে যেতে লাগলো।

৩

রাস্তাঘাটে অফিসের লোকেদের সঙ্গে কেন যে দেখা হয়! বাসে একদম গা ঘেঁষে দাঁড়াল সুখেন্দু মাইতি। অফিসের লোক জিনিসটা ভারি অদ্ভুত। দেখা হলে তারা জিজ্ঞেস করে ঠোঁটে একধরনের অফিসিয়াল হাসি ঝুলিয়ে—ভালো তো? তখন আমাকে হয় কিছু একটা অবান্তর কথা বলতে হয়, না হলে একইরম কায়দায় হাসতে হয়। খুব মন খারাপের দিনেও 'ভালো আছি' 'ভালো আছি' বলতে বলতে এক সময় নিজের সত্যিই মনে হয়, আমি তো ভালোই আছি। এখন সুখেন্দু মাইতি মন্দিরাকে চোখের কোণ দিয়ে দেখছে। কাল অফিসে কি রটাবে কে জানে।

সমীর এইসব ভাবলো।

ততক্ষণে সুখেন্দু ডি-এ বাড়লেই জিনিষের দাম বাড়িয়ে দেবার কোনো মানে নেই জাতীয় একটা বক্তৃতা প্রায় শেষ করে এনেছে।

সমীর হঠাৎ বলল, জানো মাইতি, এবার মণিপুর যাচ্ছি। সপরিবারে মণিপুর ভ্রমণ। মণিপুর কেমন জায়গা জানো নাকি?

ট্রেনে যেতে দিন চারেক লাগে শুনেছি। আমি একবার ট্রাই নিয়েছিলাম! বিস্তর ঝামেলা, অনেকবার পাল্টাপাল্টি করার ব্যাপার কিনা। শেষ পর্যন্ত হৃষিকেশ গেলাম—

আমরা প্লেনে যাচ্ছি।

মাইতি চাষীদের মেঘ দেখার ভঙ্গিতে সমীরকে দেখল। খুব দ্রুত

সামলে নিয়ে মাইতি একটা প্লেন হাইজ্যাকের বিশ্লেষণ শুরু করল।

সমীর সাবধানে দেখে নিল—মন্দিরার চোখে সহানুভূতির ভৎর্সনা, আনন্দ আর উত্তাপ।

সমীর আরও দেখল, বাস নয়, মন্দিরা ইমফলের কোন বাড়ির খোলা কাঠের জানলায় ঠেস দিয়ে বসে আছে, পাহাড়ী বাতাসের সঙ্গে মন্দিরার ওড়নার বেশ মিষ্টি মিতালি হয়েছে। তার সবুজ কামিজের বুকে দুটো পোষ মানা সাপের মতন বিনুনি।

বাসের হর্ণের শব্দ সাপুড়ের বাঁশির মত লাগলো সমীরের।

৪

বাড়ি ফিরে নিজের ঘরটাকে অন্য লোকের ঘর মনে হল সমীরের। ইন্দিরা এতসব গোছগাছ করার সময় পেল কখন। আজ কি অফিস তাহলে ডুব দিল? বোন আসবে বলে এত পরিশ্রম করতে পারে ইন্দিরা অথচ জামাইষষ্ঠীর দিন একটাও কাচা পাঞ্জাবি পায় না সমীর। ইন্দিরা বেশ হাই তুলে বলতে পারে, খেয়াল ছিল না।

ভালো মাছ ছাড়াও তিনটে তরকারি হল রাতে। দু-হাজার টাকার ডাইনিং টেবিলের সানমাইকার ডিজাইন নিয়ে দু-বোনে অনেকক্ষণ গবেষণা হল। তারপর সমীরের হিসেব শুনে ইন্দিরা দুম করে বলল, দু-হাজার? তাহলে শুধু মণিপুর যাবো কেন? দু-হাজার টাকায় অনেকগুলো জায়গা ঘোরা যায়। মন্দিরা সঙ্গে সঙ্গে তাল দিল, হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।

কড়া করে ভাজা পাকা পোনা খুব বিস্বাদ লাগলো সমীরের।

অফিসের দেওয়া বাসার একমাত্র শোবার ঘরে সমীরের বিছানা হল নিচে, খাটের ওপরে দু-বোনে 'আসল সেন্ট' 'জিনিসের দাম' 'অমুক কোথায় পাওয়া যায়' এই নিয়ে মগ্ন হয়ে কথা বলছে। যেন মণিপুর বলে পৃথিবীতে কোনো জায়গাই নেই। কখনো ছিল না।

দু-হাজার টাকায় নাকি অনেক জায়গায় বেড়ানো যায়। বেড়াতে যাবার কি কোনো দরকার আছে মানুষের জীবনে ?

ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগে সমীর দেখল, চারদিকে অফিসের ফাইল। সামনে একটা নদী। স্রোতে হাজার হাজার ফাইল ভেসে যাচ্ছে। তাতে একটা ফাইলের তৈরি নৌকো। সেই নৌকোর মাঝি, এমনকি দাঁড় কিংবা পালটাও, অফিসের ফাইল দিয়ে তৈরি। নদীর দু-পাড়ে অফিসের ফাইল দিয়ে তৈরি ঘরবাড়ি। গাছ।

ইন্দিরা বলছিল, বাঁশের একটা রাবণ কিনেছি তোকে দেখানো হল না। কোন দিকের দেয়ালে লাগাবো বল তো।

মন্দিরার উত্তর আর শুনতে পেল না সমীর।

৫

সাধারণত ইন্দিরা প্রাতঃকৃত্য স্নানটান সেরে চা দিয়ে সমীরকে ঘুম থেকে ডাকে। রেল লাইনের মতন নিরুপায় নিয়মবদ্ধ মধ্যবিত্ত জীবনে সমীরের এই একটাই বিলাসিতা। চা না পেলে সে বিছানা ছেড়ে উঠবে না।

আজ নিচে শোওয়ার জন্যে ঘুমটা আগেই ভেঙে গেল। পাশে বৌ নেই, খাটের বদলে মেঝেতে শুয়ে আছি কেন—ভাবতে গিয়েই সব মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে উঠে বসলো সমীর। সকালের আলোর গভীরতা অনুভব করে ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে সমীর বুঝতে পারল, ইন্দিরা বাথরুমে। মন্দিরা কোথায় ?

ভোরের আলোয় মাখামাখি হয়ে শালোয়ার-কামিজ পরেই নীল মশারির মধ্যে পা ফাঁক করে চিত হয়ে ঘুমোচ্ছে কম বয়সের ইন্দিরার মত মন্দিরা। বড় কুটুমের দিকে এভাবে তাকানোটা সহধর্মিণী দেখে ফেললে ভবিষ্যতের অনেক রাত্রি ইন্দিরার বক্তৃতায় পল্লবিত হয়ে উঠবে বলে সমীর চা করতে বসলো। মন্দিরাকে বেড-টি খাওয়াতে হবে।

বাথরুমে ঢুকলে ইন্দিরা বেরোতে ভুলে যায়।

চা নিয়ে মন্দিরার কাছে গিয়ে সমীরের সমস্যা হল, কিভাবে ডাকবে। সদা উচ্ছল মন্দিরার ঘুমন্ত মুখ অল্প অভিমানী। যেন ঘুমের মধ্যে কারুর বকুনি খেয়ে ঠোঁট ফোলাচ্ছে।

অনেক ভেবে চুলে একটু বিলি কেটে দিতেই মন্দিরা ঘুমঘোর ভেঙে ফুটে উঠলো। সমীর সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরাকে ভুল বোঝার কোনো অবকাশ না দিয়েই বলে উঠলো, চা খাও, বিছানা চা।

ওমা আমার কি ভাগ্য। বলে উঠে বসে নিপুণ মেয়েলি কায়দায় দ্রুত চুল আর পোশাক ঠিক করে পা ভেঙে বসলো মন্দিরা। চা নিয়ে বললো, আপনি দিদিকে বেড-টি খাওয়ান?

ঘুমন্ত আর ঘুম-ভাঙা দু-রকম মন্দিরার মধ্যে দোল খাচ্ছিল সমীর। কথাটা শুনে মুখে দ্রুত মেঘ জমে এল। মন্দিরা সেটা টের পেয়ে গেল দেখে সমীর ভেসে ওঠার জন্যে খড়কুটো খুঁজতে লাগল প্রাণপণ—বেড়াতে যাবে? মর্ণিং ওয়াক?

সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ঘাড় কাত করে মন্দিরা একটা অতুলনীয় ভঙ্গি করল—দারুণ হবে। আপনাদের ব্যারাকপুরে ভালো ভালো জায়গা আছে অনেক। দিদি বলে।

## ৬

রিকশায় আবার মর্ণিং ওয়াক হয় নাকি?

ভোরবেলা নৌকা করে শেওড়াফুলি থেকে ঘুরে আসবো। খা লাগবে না! নদী সব সময় ভোরের দিকে দেখতে হয়, জানো তো?

সন্ধ্যেবেলাও ভালো লাগে। দিদিকে আনলে হত।

তাহলে রান্না করতো কে? নিজেই তো আসতে চাইলো না।

আপনাকে একটু চান্স দিল আর কি। কেমন করুণ করে বললেন। খেলা-ধুলো বেশ ভালোই শিখেছেন।

আমাকে অপমান করা যায় না মন্দিরা। আজকাল বাঁধা মাইনের চাকরিতে টোটাল বেঁচে থাকাটাই এমন অদ্ভুত ব্যাপার যে—।

এসব কথাবার্তার কিছুক্ষণ পরে মাঝ নদীতে নৌকোর ওপর সমীর চিত হয়ে শুয়ে পড়লো। নিচে জল। ওপরে আকাশ। মন্দিরার চুলে ও আঁচলে সকালের হাওয়া। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সমীর বুকের অতল থেকে বলে ফেলল, জীবনে কোথাও যাওয়া হল না।

নৌকোয় চাপলে ঢেউ অল্প দোলায়। মন্দিরা দুলতে দুলতে বলল, কোথায় যেতে চান ?

চোখের সামনে বিশাল ভোরের আকাশ দুলছে। নিচে দুলছে জল। কোনোটারই ঠিক মানে বোঝা গেল না।

ভাবতে ভাবতে জল আর আকাশের মাঝখানে, চিত হয়ে দুলতে দুলতে সমীর বলল, জানলে তো চলেই যেতুম।

## কুমীর

রোদ্দুরে। তখন সকাল, দূরে জল, জলে ছলনা, ঢেউ আর বিদেশ ছলছল শব্দ—শীতের আরাম গায়ে মাখতে ঘুমিয়ে পড়েছিল সুধা। মানুষেরা সাংসারিক ক্লান্তিপরিত্রাণ খুঁজে এইখানে মাঝে মাঝে আসে। শহর তাদের অস্থির হতে শিখিয়েছে, তাই সুধাকে ঘুমোতে দেখে তাদের রাগ হয়। রাগ হতে থাকে।

রাগ অন্ধতার বকুলফুল, বন্ধু। মানুষেরা অন্ধ হয়ে সুধাকে কুমীর বলে ডেকে উঠলো।

সুধা বলল, হাঃ। সেই কবে, বালক বয়সে, একটি বাঁদর বলেছিল—পরপারে যদি নিয়ে যাও পিঠের পাহাড়ে চাপিয়ে, সুখী হবো। আমি সুখ জানি না—আমার তো দুঃখ পাবার সুখও নেই! যদি খেতে দাও কাঁচা ও লাল তোমার ধুকপুকি, মানুষেরা যাকে ভালোবেসে হৃদয় বলেছে: পরপারে নিয়ে যেতে পারি। পরপারে শান্তি আছে। গাছে গাছে তৃপ্তি ঝুলে আছে।

বাঁদরের বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ। রামকৃষ্ণদের ধর্মে ব্যস্ত রেখে গাছে গাছে কাম তৃপ্ত করেছে। তাদের পোশাক নেই, দুর্ব্যবহার আছে। কান্না নেই। কাম আছে। রণতেজ নেই। সাধ আছে। রাক্ষসনিধনে তারা রামচন্দ্রের আদেশে অনুরোধে—বিশ্বাসঘাতকতা ও ভ্রাতৃবধ করেছিল।

আজ ভোরে, জলচারণার ক্লান্তি ধুতে রোদে মগ্ন অলস কুমীরের মনে পড়ে, সে বাঁদর পরপারে পৌঁছে জিভ কেটে হেসে বলেছিল: এই যাঃ, ধুকপুকি নিয়ে আসতে যে ভুলে গেলাম।

ব্যর্থ সুধা, সুধাকুমারী জলোপাধ্যায়, পরিত্যক্ত ব্যর্থতায় জলে নেমেছিল—আজ মনে পড়ে। জেনেছিল: দুঃখ এই। সুখ ওই স্থলভাগে, যেখানে বৃক্ষ, পাপফুল, পুণ্যফল ধীরে ঝুলে আছে। তারা কি আমার চেয়েও অলস, আরো নির্লিপ্ত, ব্যভিচারী ?

কুমীর জানে না। জানাজানি, দুঃখের পাঁচালি। আমার রোদ্দুর থাক। আমার শীতকাল, আমার রহস্যজল ওই ডাকে। যাই, জলে যাই।...মানুষেরা সৈকতে আসছে। বেলা হল।।

২

কার বিয়ে? নাহ্, বিয়ে নয়। আজ প্রেম, আজ এই মোহনার সাক্ষাতে—বিয়ে বিয়ে খেলা। উচ্ছল প্রেমিক পুরুষ জানে—রমণীর তূণে আছে মারণাস্ত্র, তাকে বেঁধে রাখতে হবে। নতুবা ও শক্তিশেল মৃত্যুপ্রসবা।

মানুষের বিয়ে খেলা দেখে, কুমীরের সাধ হয়—বৌ হব। বাড়ি ফিরে অর্থ ও ঘাম দেবে আমার পুরুষ; পরমার্থপ্রতিশ্রুতি দেবে। মিথ্যে, মিথ্যে সেসব। তবু তার ঘাম সত্যি: ঘামগন্ধে তৃপ্তির আস্বাদ আমি পেতে চাই।

বিয়ে করো। কুমীরসমাজ থেকে যুবকেরা দ্রুত ছুটে আসে। জলে আলোড়ন শুরু হয়। আন্দোলন হতে থাকে জলে। আজ স্বয়ম্বর।

আজ সুধা জলমাল্য দেবে। লকেটে, সদ্যচ্যুত চকচকে ধূসর খোলস গোলাকার।

আজ সুধা কুমীরাক্ষী; চোখে অশ্রু, তাকে পুরো সুন্দরী করেছে।

প্রিয়তমা, সুন্দরীতমারে—কে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার ?

যুবরাজ কুমীরেরা চেয়ে থাকে। হাতে অস্ত্র। চোখে মুগ্ধতা। শরীরে সটান উন্মাদনা।

## মমিতন্ত্র

চোখ খুলে সুবীর দেখল মাথার বালিশের পাশে চায়ের কাপ নেই। চোখের সামনে নিরাপত্তার ভ্রান্তিমাখানো হাল্কা নীল রঙের মশারিটা টাঙানো নেই। পায়ের দিকের দেয়ালের রামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথ তাকে দেখছে। জানলা দিয়ে ঢুকে পড়া রোদ্দুরে স্বাধীনতা স্বাধীনতা গন্ধ। এবং তার লুঙ্গির গিট খোলা।

বিখ্যাত লোকেদের সামনে এভাবে শুয়ে থাকাটা ঠিক নয় বলেই যেন সুবীর উঠে বসল। লুঙ্গিটা কোমরে বাঁধল। বিছানার এখানটায় বসলেই বাঁদিকের আলমারির সরু লম্বা আয়নায় নিজেকে দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে সবাই যা ভাবে সুবীরও তাই ভাবল। আসলে কিন্তু আমাকে বেশ দেখতে।

চা না দিলে সুবীরের ঘুম ভাঙে না। এত বেলা অব্দি আমাকে কেউ চা দেয়নি কেন? ঘুম থেকে ওঠার আগেই মশারি খুলে নেওয়া হয়েছে কেন! ভাবতেই সুবীর চেঁচিয়ে উঠল—মা।

ঘরে ঢুকল দিদি। ডানহাতে সুবীরের ব্রাশ বাঁহাতে পেস্ট। মুখ না ধুলে আজ চা পাচ্ছো না। বলে একবার আয়নায় মুখ দেখে চলে গেল। চনমন করে সুবীরের ঘুম ঘুম ভাবটা কেটে গেল। লিসা এসেছে। লিসা তার সই করা বামপন্থী বউ।

লিসা এলেই সামন্ততান্ত্রিক আয়েশী ও উদাসীন সুবীর চক্রবর্তী খানিকটা উত্তেজিত সম্ভাবনাময় বিপ্লবী মধ্যবিত্ত হয়ে যায়। আজও তাই হল। পেস্ট লাগাল ব্রাশে যেন ছবি আঁকবে ব্রাশ দিয়ে। একটু আধটু

মাজন এপাশ ওপাশ গড়িয়ে যায় রোজ। আজ গেল না।

নিজের বাড়ি হলেও খালি গায়ে বাইরে বেরোনোটা অস্বস্তিকর বলে হলুদের ওপর সরু-কালো ষ্ট্রাইপ দেওয়া জামাটা আলগা করে গায়ে জড়িয়ে নিল সুবীর। বোতাম দিল না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজতে মাজতে সুবীর নিজেকে মাপল। লুঙ্গি আর হাফ-শার্ট পরে এই সকালবেলা মোটামুটি স্বাস্থ্যের ওই তাজা ছেলেটাকে বেশ বিপ্লবী বিপ্লবী দেখাচ্ছে। অল্প দাড়ি, ঘুম ভাঙা চুল আর বোতামগুলো খোলা বলে তাকে একটু সামন্ততান্ত্রিক দেখাচ্ছে। সুবীরের বেশ ভালো লাগল নিজেকে।

বারান্দায় বাবা! কোমরের ওপরের অংশ খবরের কাগজ দিয়ে ঢাকা। বাকি অংশে ধুতি, ইজিচেয়ারের অর্ধেক ও দুটি অচঞ্চল পা। কি দরকার গুছিয়ে দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারলে বাবা আজও টাকা দেয় বলে সুবীর বাবাকে বেশ পছন্দ করে। বাবার দিকে তাকালে সুবীরের আত্মবিশ্বাস বাড়ে কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য কমে যায়। এত কম কথা বলেন ভদ্রলোক যে কিছুতেই মেজাজ বোঝা যায় না। অফিসে যারা চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট তারা কি জীবনেও চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়? সুবীর জানে না। তুলনামূলক সাহিত্যে এম-এ পাস এবং এখনো বেকার সুবীর চক্রবর্তী হিসেব জিনিসটা একদম বোঝে না। সব সময় শুধু হিসেব করলে মজা করব কখন।

বাবার ঘরের কোণের দিকে বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ আর সারদা মা'র ছবি সাজিয়ে মা চোখ বুজে ধ্যান করছে। এই বয়সে সেক্স ইমপালসটা একেবারে চলে যায় কিনা। লিসা বলে। মনে পড়তেই সুবীরের নিজেকে সিকনিমাখা রুমাল মনে হল। দাঁতে ব্রাশ ঘষার গতি বাড়িয়ে দিল একটু।

পাশ দিয়ে সুবীরকে যেতে দেখে বাবা বলল, রেসিলিয়ে ? মানে কি ?

মুখে মাজন নিয়ে৷ 'পুরো সেনটেন্সটা কি' বলতে যেতেই বাবা বলল—গুড হিউমার অ্যাণ্ড রেসিলিয়েন্স অফ দি নাগাস। বাঁহাত তুলে বাবাকে অপেক্ষা করতে বলে সুবীর কলতলায় এসে মাজনথুথু থুক করে ফেলে চেঁচিয়ে বলল—ব্যুয়ান্সি। রান্নাঘর থেকে লিসার গলা পেল সুবীর—ফ্লেক্সিবিলিটি। কয়েক সেকেণ্ড দাঁতে মাজন ঘষে সুবীর বলল—ইলাসটিসিটী। রান্নাঘর থেকে লিসার গলা এল—রেকুপারেটিভ পাওয়ার। কল খুলে হাতের আঁজলায় জল নিতে নিতে সুবীর ভাবল—প্রতিশব্দের এই তালিকা বাড়ানো কি সামন্ততান্ত্রিক ? চুপ করে যাওয়ার এই তীব্র ইচ্ছেটা কি বৈপ্লবিক ? নাকি উল্টো। ব্যাপারটার মধ্যে হিসেবের গন্ধ পেয়ে সুবীর মন দিয়ে মুখ ধুতে লাগল। ইচ্ছে হল চান করে। এই সাতসকালে চান করার জন্যে একটা জুতসই কৈফিয়ত অন্তত নিজেকেও দিতে হবে এবং সেটা ভেবে বার করতে হবে—মাথার অত ব্যায়াম এখন পোষাবে না বলেই যেন চান করল না সুবীর।

রান্নাঘরে প্রভাদিকে সাহায্য করছে দিদি। রান্নাঘরের মানুষদেরই আগে রাজনীতি দেওয়া উচিত—এরকম একটা বিশ্বাস থেকে লিসা ব্যাপারটা দেখছে। প্রভাদি পরিচ্ছন্ন হিন্দু বালবিধবা। এখনো অবিবাহিত সরকারি কেরানী দিদির বঁটি নিয়ে বসে থাকার ভঙ্গিতে সারা পৃথিবীর জন্য মমতা। যেন অনেক কিছু করে ফেলবে এক্ষুনি এভাবে লিসা এদের পাশে উবু হয়ে বসে আছে। নিজের বউ হলেও বাকি দুজনের পাশে এই পরিবেশে তাকে অল্প অপ্রতিভ দেখাচ্ছে। সুবীর দেখল।

সুবীর কিছু বলার আগেই দিদি বলল—ঘরে বসো। চা জলখাবার যাচ্ছে।

চলে আসতে আসতে সুবীর দেখল বাবা মা দুজনেই দু জায়গায় ধ্যানস্থ। যেন পাথরের মূর্তি। অথচ বিষয়টা কত আলাদা। একজনের

বিশ্ব-রাজনীতি। আরেকজনের আত্মানুসন্ধান। এত পরস্পরবিরোধী জিনিস নিয়ে ব্যস্ত দুজন মানুষকে বাইরে থেকে একই রকম নিস্তরঙ্গ ও প্রশান্ত দেখায় কি করে!

ঘরে এসে লুঙ্গি পাল্টে পাজামা পরে চুল আঁচড়াল সুবীর। সারা শরীর চা-চা করছে অথচ এখন তাকে খেতে হবে দুধ ও পাঁউরুটি। কেন? সুবীরের ইচ্ছে অনিচ্ছে নিয়ে যে কোনদিন কোনো আপত্তি করেনি তার নাম মা। আর সুবীরের ইচ্ছে অনিচ্ছেকে পাত্তা না দিয়ে যে তাকে আগাগোড়া পাল্টে দিতে চায় তার নাম লিসা। সত্যি সত্যি সুবীর কাকে পছন্দ করে বেশি? আবার হিসেবের গন্ধ নাকে লাগতে সুবীর আয়নার সামনে থেকে সরে এল। বাবার হিসেবমনস্কতা কি তার অবচেতন মনে গোপনে কাজ করে? করে বোধ হয়।

ঠিক আটটায় স্নান করতে যাবে বাবা। কাগজটা তার আগে পাবার কোনো আশা নেই। রেসিলিয়েন্স আর ফ্লেক্সিবিলিটি এক জিনিস নয়। মানুষ যা বলতে চায় আর যা বলে তার মধ্যে অনেক ফাঁক থেকে যায়। মানুষ যা বোঝে আর যা বুঝতে চায় তার মধ্যেও অনেক ফাঁক থেকে যায়। এই সব ফাঁকফোকরের মধ্যে জমে থাকে রাজ্যের জঞ্জাল। সেটাই আসলে মহাপুরুষদের ব্যর্থতার কারণ। নইলে ভারতে যত মহাপুরুষ জন্মেছে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে তার তুলনা নেই তবু ভারতের অবস্থা এত জটিল। সুবীর একবার আড়চোখে রবীন্দ্রনাথকে দেখে নিল। নোবেল পাওয়া বাঙালি কবি। তবু চোখে এত দুশ্চিন্তার ছাপ কেন! দেড় হাত দূরের ওই রামকৃষ্ণের তন্ময় হাসি হাসি প্রসন্ন মুখ দেখলে রবীন্দ্রনাথকে এত কাঙাল মনে হয় কেন?

ঘরে ঢুকে লিসা টেবিলে দুধ পাঁউরুটি রাখতেই দরজা থেকে শোনা গেল—মা, দুটি ভিক্ষা দেবেন মা। টানা টানা অসহায়তামাখা পুরুষ কণ্ঠ। শুনেই লিসা ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। দুধে পাঁউরুটি ডুবিয়ে

লিসার গলা পেল সুবীর। আগে যাও, আগে যাও, ভিক্ষে, ফিক্ষে এখানে হবে না, শক্তসমর্থ পুরুষ মানুষ, ভিক্ষে চাইতে লজ্জা করে না? হাওড়া স্টেশনে গিয়ে মোট বইতে পার না? যত্তোসব। যাও যাও। ঘরের ভেতর চেয়ারে বসে পাঁউরুটি খেতে খেতে সুবীর মনে মনে দেখতে পেল ভিখিরিটা লিসাকে পাত্তা না দিয়ে বাড়ির ভেতরের দিকে সতৃষ্ণভাবে চেয়ে আছে। যথারীতি মায়ের গলা পেল সুবীর। ভিখিরিকে পয়সা দিয়ে মা লিসাকে বলছে, কেমন আছ। কখন এলে।

বাঘের তাড়া খেয়ে আলাদা হয়ে যাবার অনেকক্ষণ পরে আবার নির্বাঘ তৃণভূমিতে মা-হরিণের সঙ্গে দেখা হলে শিশু-হরিণ যেভাবে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে সেইভাবে মাকে দেখছে লিসা। সুবীর দেখল। লিসা বলছে—পুজো তো শেষই হয় না আপনার। আমার সঙ্গে কথা বলার কি সময় হবে? মা বলছে—ঘরে এসো। সুবীর দেখল, এক বৃদ্ধা যুবতী ও এক যুবতী বৃদ্ধা তার ঘরে ঢুকল। সোনালি চশমা আর গরদের শাড়ি পরা মায়ের শরীর ঝকঝকে তেজী, লিসার চেয়ে অনেক বেশি টান টান। লিসাকে নোবেল দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বলতে ইচ্ছে করে, মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও না।....

টেবিলের পাশে দ্বিতীয় চেয়ারটায় বসে লিসা বুকসেলফের দিকে তাকিয়ে আশ্রয় চাইছে। তাকে দেখাচ্ছে অপমানিত ছাগলিনীর মতো। দ্বিতীয় চেয়ারে বসে সুবীর দুধ পাঁউরুটি খেয়ে যাচ্ছে। সদ্য পরিত্যক্ত বিছানাটি এখনও আতোলা। ঘুমন্ত শিশুকে সরিয়ে দেবার মত করে সুবীরের বালিশটা আলমারির মাথায় তুলে রেখে খাটের নিচ থেকে ঝাঁটা বার করে বিছানা তুলতে লাগল মা। লিসা এখনও বুকসেলফের দিকে চেয়ে আছে।

দু হাতে দু কাপ চা আর প্লেটে অল্প চানাচুর নিয়ে ঘরে ঢুকল দিদি। মাকে বিছানা পাট করতে দেখে টেবিলে চা রেখে ব্যস্ত হয়ে বলল— তুমি

আবার পুজোর কাপড় পরে ঝাঁটা ধরতে গেলে কেন! সরো আমি দেখছি।···মা কোনো উত্তর দিল না।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে লিসাকে লুকিয়ে দেখল সুবীর। লিসার কি মনে হচ্ছে, বিছানা তোলার কাজটা সেও করতে পারতো? নাঃ। সম্ভবত সে এখনো ভিখারি পর্বে আটকে আছে। কিংবা ভাবছে, সুবীর ছাড়া এ বাড়ির অন্য লোকেরা মুখে যাই বলুক, ভেতরে ভেতরে তাকে গুরুত্ব দিতে রাজি নয়। এরকম অবস্থায় সুবীর সাধারণত গান গেয়ে থাকে। ভিন্ন বয়েস ও অভিজ্ঞতার ওই তিন মহিলার সামনে সুবীর গেয়ে উঠল—আজি প্রাতে সূর্য ওঠা···।

খিল খিল করে হেসে উঠল দিদি। মায়ের চেষ্টায় গানটা দিদি বেশ ভালোই গায়। গান শোনার পাগলামিটা রক্তে থাকলেও গলায় সুবীরের একদম সুর নেই। লিসার সন্দেহ সে ইচ্ছে করেই বেসুরো গায়। দিদির হাসির সংক্রামক উত্তাপে লিসা অল্প লাল হল। ভেসে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টায় লিসা খুব নরম আশকারার সুরে বলেই ফেলল—গান শোনাবে দিদি?

চট করে মাকে একবার দেখে নিয়ে দিদি বলল, গাইতে বসলে অফিস কামাই হয়ে যাবে যে। আমার গান তুমি আরেকদিন শুনো। আজ বরং···সুবীরকে একবার মেপে নিয়ে দিদি বলল, মায়ের গান তো তুমি কোনদিন শোনোনি। আজ তুমি মায়ের গান শোনো। তোমার দরকার। বলেই বেরিয়ে গেল দিদি।

পাট করা নিভাঁজ বিছানায় মা পদ্মাসনে বসে। চেয়ারে বসে লিসা শাড়ির আঁচল দেখছে মন দিয়ে। সুবীরের চা শেষ। এখন সিগারেট দেশলাই নিয়ে তার বাথরুমে যাওয়া উচিত। তাগিদ পেলেও সেটা একটু নিষ্ঠুর দেখাবে বলে সুবীর উঠছে না। চা লিসার অনেক বাকি।

সুবীর সেদিকে তাকিয়ে আছে দেখেই কি মা বলল, চা খাও, লিসা। কাপটা হাতে নিয়েও চুমুক না দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল লিসা। বলল—আমার ট্রেনিং শেষ হয়ে গেল। নেক্সট্ উইকে সার্টিফিকেট পেয়ে যাবো।… যেন সার্টিফিকেট পেলেই তার সব মুশকিল আসান। গলায় স্নেহ আর শ্রদ্ধা মাখিয়ে মা বলল—তাহলে তুমি টিভি সারানো শিখে গেলে বলো। লিসা এই প্রথম ভেতর থেকে হাসল। বলল, হ্যাঁ, আমি এখন যে কোনো ড্যামেজ সেট ফিট করে দিতে পারি। আবহাওয়া উৎফুল্ল হয়ে আসছে দেখে সুবীর ড্রয়ার থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে বাথরুমে গেল। ঘরের বাইরে এসে শুনলো, দিদির ঘর থেকে হারমোনিয়াম এনে দাও। লিসার গলা। সুবীর এক সেকেণ্ড শান্ত হয়ে দাঁড়াল। গান কি তুমি শুনতে পাবে লিসা। মায়ের গলা। এই সময় লিসার মুখটা দেখতে খুব ইচ্ছে হল একবার। আত্মবিশ্বাস আপনার এত কম কেন? লিসার গলা। সুবীরের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। মেঘ ছাড়া কি আকাশ হয় না? যাও, তুমি নিজে বাক্স নিয়ে এসো, আমি গাইবো। মায়ের গলা শুনে, সুবীর দৌড়ে বাথরুমে গেল। যেন বাবা নয়, বাবার হাতের খবরের কাগজটাই সুবীরকে বলল—দেরি করো না। আমার সময় হয়ে গেছে। সুবীর কোনো উত্তর দিল না। দিদির ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে লিসা তাকে দেখছে। লিসার দিকে তাকিয়ে দাঁত ফাঁক করে সুবীর একটা ভঙ্গি করল যাকে হাসি না বলে কৃতজ্ঞতা বলা ভালো। হারমোনিয়াম নেবার জন্যে লিসা দিদির ঘরে ঢুকতেই সুবীর বাথরুমে ঢুকে গেল।

টুপি পরে বিয়ে লিসা করবে না। প্রকৃত সম্পর্কহীন একগাদা লোক ডেকে খাওয়ানো, অশিক্ষিত একজন লোক, যার নাম ব্রাহ্মণ, কিছু ভুল মন্ত্র পড়ে যাবে আর তুমি আমার সারাজীবনের বর হয়ে যাবে, দূর! সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে ঘরে তুলে আনা আজকেই যায় কিন্তু দিদির বিয়েটা

না হলে……। মা বাবা দিদি তাকে এত স্বাধীনতা দিয়ে এসেছে বরাবর যে সুবীর বুঝতে পারে আসলে সে কতখানি পরাধীন। লিসা বলবে, ফ্রিডম ইজ দি রেকগনিসন অফ নেসেসিটি। একটু থেমে থেকে বলবে, এঙ্গেলস্। সুবীর একবার বলেছিল, তোমার ওই এঙ্গেলস্ ভদ্রলোক বেশ মহান ধরনের বোকা, জানো তো। লিসার মুখ থেকে 'ঝাড়গ্রামে আমার দেশ হতে পারে কিন্তু আমি জন্মেছি কলকাতায়, মনে রেখো' ভাবটা কেটে গেলে সুবীর সময় নিয়ে বোঝাবে—পরাধীনরাই আসলে স্বাধীন, জানো তো। হেঁয়ালিপ্রিয়তার জন্যেই এদেশের মানুষের আজও কিছু হল না—লিসা ওরকমভাবে তাকালে সুবীর বলবে, প্রকৃতির নিয়মগুলো যে যত ভালো বুঝতে পারে, প্রকৃতিকে সে তত ভালো শাসন করতে পারে। সব কিছুরই তো নিয়ম আছে। এইসব ভেতরকার গভীর নিয়মগুলোর কাছে যে যত পরাধীন সে তত স্বাধীন। নইলে তুমি সারাজীবন লিবার্টি লিবার্টি বলে চেঁচাবে, চারপাশের বিধিনিষেধ না মানাটাই স্বাধীনতা মনে করবে—কেমন জঁা পল সার্ত্র আর কি, তারপর একটা লিমিট পর্যন্ত কমপ্রোমাইজ করে শেষ বয়সে মোটা মোটা আননেসেসারি বই লিখবে। ভাবা যায়! বুক ভর্তি সিগারেট টেনে সুবীর বেশ খোসমেজাজে শরীর হাল্কা করার কাজে মন দিল। অনেকখানি ধোঁয়া ছাড়ল একসঙ্গে। প্রত্যেক অনুভূতিই বিকল্পহীন। এই মুহূর্তে যেরকম আরাম হচ্ছে তার কোনো উদাহরণ হয় না। দরকারের সময় এক গ্লাস জল খেয়ে বোঝা যায় জল কি জিনিস। লিসার শরীর মন মেধা থেকে দরকারের সময় যা পাওয়া যায় তারও কোনও বিকল্প হয় না। লম্বা একটা ক্লাস করে এসে একটা সিগারেট খেতে খেতে কি মনে হয় না, এটাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আরাম ?

বাথরুমের বাইরের পৃথিবী থেকে হারমোনিয়ামের শব্দ ভেসে এল। দিদি বাজালে যন্ত্রটা দিদির মতন বাজে। মা বাজালে যেন হার-

মোনিয়ামটাই মা হয়ে বাজে। বেশ কিছুদিন মায়ের গান শোনা হয়নি। থ্যাংকিউ, লিসা। লিসু লিসু আমালিসু। শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা সুবীর যত্ন করে সামনের দেওয়ালে টিপে নিবিয়ে ফেলল। সিগারেট নিবিয়ে ফেলার শান্ত অভিব্যক্তির, সুবীর জানে, কোনো উপমা নেই। ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য আছে অনেক। উপমা, উদাহরণ, তুলনা - এসব হল বোকাদের বোঝাবার অস্ত্রশস্ত্র। এই পৃথিবীর আর একজন বিখ্যাত বাঙালী কাপুরুষ কবি বলেছিলেন—উপমাই কবিত্ব। হায় কবি! একজন সুস্থ সবল সঠিক মানুষের জীবনে কবিতা জিনিসটার আদৌ কোনো দরকার আছে কি! শুধু কবিতা নয় সাহিত্য ব্যাপারটার মধ্যেই একটা অসুস্থতার রহস্যছায়া আছে। হাতে সাবান তুলে নিয়ে সুবীর বুঝতে পারল, যে কোনো শিল্পই, আসলে সাবান।

হারমোনিয়ামের শব্দে সকালবেলাটাই যেন পাল্টে যাচ্ছে। খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রেখে বাবা ইজিচেয়ারে চোখ বুজে শুয়ে সুবীরের পায়ের শব্দ শুনে বাবা বলল, তোমার একটা সিগারেট দিয়ে যাও তো। চোখ বুজে কথা বলা কত শক্ত সুবীর জানে। বাবা যে সিগারেট খায় না এবং এখন মা গান গাইছে বলে বাবা ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে সুবীর তাও জানে। বলল—আমার ব্র্যাণ্ড তোমার কড়া লাগবে, আমি তোমার জন্যে চট করে ভালো সিগারেট এনে দিচ্ছি। বলে চলে আসছিল সুবীর। হঠাৎ শুনল, চোখ বুজেই বাবা বলছে—মেয়েদের মতন, সিগারেটও খারাপ-ভালো হয় না সুবীর। দুনিয়ার সেরা সিগারেট তুমি দিনে দশ প্যাকেট খাও, দুদিনে বুক ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। সুবীর আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পেল না।

গোলাপসুবাস আমার কি সয়—আমি যে জন্ম মেছুনি; ড্রয়ার থেকে সিগারেট বার করে সুবীর মায়ের কণ্ঠস্বর শুনে আঁতকে উঠল। রবিগীতি ভক্তিগীতি ভজন ঠুম্‌রি ছাড়াও মা মাঝে মাঝে এক একটা গান গায়, যে

গান সুবীর জীবনে শোনেনি। নিজের তৈরি না কোথাও শোনা জিগ্যেস করলে দুষ্টু করে হাসে। একদিনের গান আরেকদিন গাইতে বললে বলে, দূর, অত কি মনে থাকে। দরজার চৌকাঠে পা দিয়ে বাবাকে সিগারেট দেশলাই দিতে যাবার আগে সুবীর দেখল লিসাও পাথরপ্রতিমা হয়ে গেছে। চোখে ক্রোধ। বারান্দা থেকে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে সুবীর দেখল দিদি তার দিকে চেয়ে আছে। খাঁচার পাখীকে ছোলা দেবার সময় দিদি এইভাবে চেয়ে থাকে।

ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে সুবীর গান শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই সম্ভাবনাময় বিপ্লবী থেকে উদাসীন সামন্ততান্ত্রিক হয়ে গেল। ফস্কা গেরো কখন হল তোমার ওই বজ্র-আঁটুনি। গোলাপসুবাস—

লিসা দেবীর মতন শান্ত। চোখে বিহ্বলতা। ঘরের আবিল বাতাসে হারমোনিয়ামের শব্দ সাবান হয়ে ভাসছে। জেগে জেগেই বেলা গেল, আমার শান্তি হল না। সুর মাখানো উচ্চারিত শব্দগুলো আত্মায় করাতের মতন বসে যাচ্ছে। গোলাপগন্ধে ঘুম ছুটিল, আমার ভ্রান্তি গেল না। সুবীর এক মনে রবীন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে রইল। মা গাইছে —মৎস্য যদি গাছে ফোটে, সূর্য যদি কাল না ওঠে, আমি পাবোই পাবো ভবের পারানি। পাবোই পাবো—কথাগুলো নানারকমভাবে ভেঙেচুরে গাইল মা। ভবের পারানি বলেই আবার গোলাপসুবাস। হঠাৎ গান থামিয়ে লিসার দিকে চেয়ে মা বলল—কষ্ট হচ্ছে? লিসা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি বাড়ি যাবো। মা বলল, বোসো বোসো। এই গানটা শুনে যাও। তারপর পাক্কা দশ মিনিট হারমোনিয়াম বাজাল মা। সুবীর খাটের তলা থেকে তবলা বের করে বেঁধে নিল। লিসা চোখে খুশি ছড়িয়ে গুছিয়ে বসলো। এক কাপ চা নিয়ে এসে দিদি সুবীরের দিকে এগিয়ে দিল—খেয়ে নে। সুবীর জানে দিদি তার অফিসের এক বিবাহিত ভদ্রলোককে ভীষণ ভালোবাসে। সেজন্যে

মাঝে মাঝে বেশ রাগ হত দিদির ওপর। আজ মনে হল, বেশ করে। বিবাহিত লোকেরা কি ভালোবাসার যোগ্য নয়! দিদির সুখ দিদি বুঝবে। আমি শুধু শুধু দিদির ওপর রাগ করবো কেন! এক চুমুকে পুরো চা শেষ করে সুবীর তবলায় চাঁটি মারল, টাঁই। যেন তবলা নয়, সুবীর এখন নিজেকে বাজাবে। তালে ভুল হয়ে গেলে চারপাশের আবহাওয়ায় গান একদম মাটি হয়ে যাবে।

চোখ বুজে হারমোনিয়ামে আঙুল বোলাচ্ছে মা। মাঝে মাঝে চোখ খুলে কি যেন দেখে নিচ্ছে। ঘরের দেয়াল নয়, লিসার উপস্থিতি নয়, সুবীরের তবলা নিয়ে বসার দিকেও কোনো মন নেই মায়ের। সুবীর জানে, মায়ের পৃথিবীতে এই মুহূর্তে যা ঘুরে বেড়াচ্ছে তার নাম সুর আর শব্দ দিয়ে গভীর অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে দেবার আকুলতা। লিসা চেয়ারের ওপর বাবু হয়ে গুছিয়ে বসেছে। দু-হাতলে দু-কনুই রেখে শিরদাঁড়া টান করে সে একবার সুবীরকে দেখল। পুজোর পর শান্তিজল ছেটাবার সময় ব্রাহ্মণেরা যেভাবে তাকায় সুবীর প্রায় সেইভাবে লিসার দিকে তাকিয়ে রইল। একবার আ—আ করে লম্বা একটা নরম টান দিয়ে মা গাইল; দেবার থোবার নাইকো শক্তি/ পেসাদে আমার বড় ভক্তি/নিজের মনে হাজার খাঁকৃতি/ পরকে বলি মিছে আসক্তি।

গান শেষ হবার পরেও সুবীরের তবলা টাঁই টুঁই করে আরেকটু বাজল, যেমন বাজে। সেই শব্দটাও শেষ হয়ে গেলে ঘরে পড়ে রইল একটা বাঙ্ময় নৈঃশব্দ্য। লিসা প্রায় মরুভূমির উট হয়ে আছে। শান্ত, বিচক্ষণ, ধীর ও আত্মস্থ দেখাচ্ছে তাকে। যেন কতদূর যেতে হবে সে এইমাত্র বুঝল, উত্তেজিত গতি কমিয়ে সে সঞ্চয় করে নিচ্ছে উদ্যম। দ্রুত ছুটলে মাঝরাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে।

লিসার বাড়ি সুবীর খুব কমদিনই গেছে। না। তার ভালো লাগেনি লিসার বাড়ির ভেতরের রাজনীতি গন্ধময় পার্টি-অফিস পার্টি অফিস পরিবেশ।

রিহার্সাল রুমের মতন চায়ের ভাঁড় ভর্তি বাবার ঘরে অনবরত পার্টির লোকজন, মাঝারি সাইজের কমিউনিষ্ট নেতা। সনাতন ব্যানার্জী নিজের কাজে এত ব্যস্ত যে বাড়ির লোকের সঙ্গে তাঁর প্রায় কথাই হয় না। আলমারি ভর্তি লাল বই। মহিলা সমিতি সামলে ঝাল-কই রাঁধতে ব্যস্ত লিসার মা, লিসার বাবাকে তিনি 'আপনি' বলে সম্বোধন করেন। লিসার দাদা চাকরি নিয়ে বিয়ে করে বেনারসে থাকে। দিদির বিয়ে হয়েছে বোম্বেতে। মধ্য কলকাতার সরু গলির মধ্যের এই বাপের বাড়ির কথা তার সম্ভবত মনেই থাকে না। ছোট বোন নিশাকেই একটু পছন্দ করে ফেলেছিল সুবীর। অল্প সময় কথা বলেই সুবীর বুঝেছিল, ফার্স্ট ইয়ারের বটানির ছাত্রী নিশা ব্যানার্জী জানে, পৃথিবীর অনেক ব্যাপারে আগ্রহ না দেখানোই হল ভালো থাকার সোজা উপায়। পার্টির কাজে মাঝে মাঝেই বোম্বে দিল্লি যেতে হয় লিসার বাবাকে। এ সবের মধ্যে লাল লাল বই পড়ে সত্তর সালে উধাও হয়ে গিয়েছিল লিসা, প্রায় বছর খানেকের জন্য। শেষে জেল হবার পর বাবার চেষ্টায় ছাড়া পেয়ে বাড়িতে বসে থাকে দীর্ঘকাল। বিয়ের চেষ্টার উত্তরে লিসা সাফ সাফ বলে দিয়েছিল—চিনি না শুনি না এ-রকম কোনো ছেলেকে আমি বিয়ে করতে পারবো না, ব্যস্। বাবার সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শ ও রণনীতিগত বিরোধ নিয়ে রাতের পর রাত কথা হত তখন। তারপর হঠাৎ বাড়িতে চিঠি লিখে রেখে লিসা চলে গেল বেনারসে, দাদার কাছে। বছরখানেক সেখানে থেকে ট্রেনে কলকাতা ফিরছিল একা। একটা খুচরো ইন্টারভিউ দিয়ে সুবীরও কলকাতায় ফিরছিল একা। সিটও পেয়েছিল পাশাপাশি। কামরার অন্য লোকেরা ধরেই নিয়েছিল তারা পূর্বপরিচিত ও পরস্পর-অনুরক্ত। নিজেদের নিরাপত্তার কারণেই কেউই ভুলটা ভাঙাতে চায়নি। একাই যাচ্ছেন নাকি—জিগ্যেস করলে লিসা বলেছিল, ট্রেনটা তো আমার প্রাইভেট প্রপার্টি নয় যে সবাইকে নামিয়ে

দিয়ে একা একা যাবো ! কিছু না ভেবেই হেসে ফেলেছিল স্ববীর। ট্রেনে কিন্তু আমি সিগারেটটা একটু বেশি খাই—আপনার কোনো···· বলতেই লিসা বলেছিল, সিগারেটের ধোঁয়ায় আমার আপত্তি নেই। কিন্তু কথার ধোঁয়া আমি একদম সহ্য করতে পারি না। কথাটা শেষ করার আগেই স্ববীর প্রাণখুলে হো-হো করে হেসে উঠেছিল। বাঃ, জার্নিটা মেমোরেবল হবে মনে হচ্ছে। শুনেই লিসা বলেছিল, তা হতে পারে, কিন্তু প্লিজিং হবে কিনা বলতে পারি না। স্ববীর আবার খানিকটা সরলভাবে হেসে বলেছিল: পেইন ইজ দি ফার্স্ট স্টেপ টু দ্য ব্যালকনি অফ প্লেজার। এবার হেসে ফেলেছিল লিসা। এভরি ইণ্ডিয়ান ইজ এ গুড ম্যান অ্যাণ্ড ব্যাড ফিলজফার, বলেছিল।

ও রাঁধুনি, জল ভরা ওই হাঁড়িতে চাল দিলেই কি ভাত হবে। হারমোনিয়ামে মায়ের শাদা আঙুল। লিসা শান্ত। স্ববীর নিজেকে গুটিয়ে এনে তবলায় টোকা দিল। ও তোর নিজের দোষে আঁচ নিবেছে, সেদিকে মন দিবি কবে। সুরের বিস্তৃতির সঙ্গে তবলার স্পর্ধা মিলে গেলে যে আনন্দ হয়, স্ববীর দেখেছে। লিসাকে রতনের বাড়িতে প্রথম চুমু খেয়েও ঠিক ততটা আনন্দ হয়নি। উত্তেজনা হয়েছিল খুব। সিনেমা হলে বসে পর্দায় নিজের ছবি দেখার মত উত্তেজনা। একটা ভাত টিপলে পরে সকল ভাতের খবর পাবি: নিজেকে তুই জানিস যদি, বিশ্বভুবন জেনে যাবি।····আর হাঁড়িতে চাল ফেলে যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকি, খাবার লোকও থাকবে বসে, রান্নাবাড়ি হবে ফাঁকি। লিসার চোখে সুর ও পবিত্রতার প্রভাব ; অদৃশ্য আবিষ্কারের প্রসন্নতা। ঝিয়ের মতন খাটিয়ে নিলি, দাম তো দিলি না ; ভেবে যদি কেঁদে মরিস, আরাম পাবি না। উনুন-তাতে তুই বসেছিস, তাই না সবাই খেয়ে বাঁচে····ও রাঁধুনি, তোর ভরসায় জগৎ-ব্যাপার টিকে আছে। সমস্ত মন দিয়ে তবলা বাজাতে বাজাতে স্ববীর একবার মাকে দেখল। চোখ বুজে ঘরের

বাতাসে স্বর ও শব্দ ভাসিয়ে দিচ্ছেন যে মহিলা, তিনি কি আদৌ তার মা? মনে হল, সুবীর তাঁকে এই প্রথম দেখছে। আর সামনে বসে থাকা স্তব্ধ লিসাকে যেন সে তিন হাজার বছর ধরে চেনে। দাবীবার, খুঁতখুঁতে, সাতবাসি। অথচ মায়ের সঙ্গে তার পঁচিশ বছরের ওঠা বসা। আর লিসাকে দেখছে তিন বছরও হয়নি। আগের একটা লাইন আবার গেয়ে গান শেষ করল মা: ও তোর নিজের দোষে আঁচ নিবেছে সেদিকে মন দিবি কবে!

গান শেষ হলে সুবীর একটা সিগারেট ধরালো। বাড়িতে সবায়ের সামনে তার এই সিগারেট খাবার অভ্যেসের জন্যে সুবীর বন্ধুদের কাছ থেকে অকারণ শ্রদ্ধা ও বিরক্তি দুটোই পেয়ে থাকে। বড় হবার মুখে বাবার সেই অমূল্য উপদেশ সুবীর সসম্মানে মনে গেথে রেখেছে: যা কিছু করবে সবাইকে বলে কয়ে সবায়ের সামনে করবে। লুকিয়ে চুরিয়ে কোনো কাজ কোরো না। যে সব কাজ চোখের আড়ালে করার নিয়ম সে সব কাজেও আর সবায়ের সম্মতি আছে কিনা ভেবে দেখো। অভিজ্ঞতা আর বিশ্লেষণ ক্ষমতা সমান নয় বলে নানা ব্যাপারে পাঁচ জন লোক একমত হয় না ঠিকই। তবে সাধারণত, প্রত্যেক মানুষ সারা জীবন ধরে যা যা করে, তার অধিকাংশই আর পাঁচ জনের চোখে স্বাভাবিক, মানে সম্মতির আওতার ভেতরেই থাকে আর কি। আর সাধারণের সম্মতির বিরুদ্ধে যে কাজই করো না কেন, প্রাথমিক আনন্দ বা উত্তেজনা বেশি হলেও, আসলে তোমার সত্যিকার আনন্দ তাতে কমে যাবে।

তার আর দিদির জন্মদিন একই দিনে—বয়েস বাড়ার পর শুধু এই ঘটনা থেকেই সুবীর বুঝেছে, বাবা কতটা হিসেবী। যে বয়সে সবাই অল্পবিস্তর বিদ্রোহী থাকে, সে বয়সেই সুবীর বাবার সঙ্গে কথা বলে জেনেছে: বেহিসেবীরা বোকা, পশুবৃত্তির ক্রীতদাস ও অপচয়সর্বস্ব। জন্মের পর থেকেই সুবীর দেখেছে, প্রত্যেক ডিসেম্বরে তারা বেড়াতে যায়,

প্রত্যেক রবিবারে তারা মাংস খায়, প্রত্যেক সন্ধ্যেবেলা আটটা থেকে নটা অব্দি বাবা ছাদে বসে থাকে। সুবীর শুনেছে, অফিসের মালিকও বাবাকে যমের মতন ভয় পায়। সুবীরের সন্দেহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া বাবা আর কাউকেই তেমন সমীহ করে না।

টিউশনির প্রথম মাইনে পেয়ে সুবীর বাবাকে একটা বই উপহার দিয়েছিল: জিরো ডিগ্রি সায়েন্স। বইটা নেড়েচেড়ে দেখে, 'প্রেজেণ্টেড ব্যাক টু মাই স্মার্ট সন উইথ এ লট অফ থ্যাংকস্' লিখে সুবীরকে ফেরত দিয়ে বাবা বলেছিল—এটা অ্যাকাউণ্টেন্সির বই, তোমার এ-রকম ধারণা হল কি করে? ক্লাসের মধ্যে লুকিয়ে গল্পের বই পড়তে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে, এ-রকম মুখ করে সুবীর বলেছিল—জিরো নিয়ে অনেক ইণ্টারেষ্টিং কথা আছে, ভাবলাম তোমার কাজে লাগবে। শুনে বাবা অত্যন্ত দুঃখিত স্বরে বলেছিল—তুমি আমাকে শূন্যতার অ্যাকাউণ্টাণ্ট ভাবো জানতুম না। সুবীর আর দাঁড়াতে পারেনি। পালিয়ে আসতে আসতে শুনতে পেয়েছিল—যা কোনো কাজে লাগবে না, সে-রকম ইনফরমেশন দিয়ে ট্যাক্স করার মতন ফাটাইল নয় আমার ব্রেন, বুঝলে? কিছু মনে কোরো না।

সুবীরের সিগারেট শেষ হবার পরও মায়ের হারমোনিয়াম বাজতে থাকে। মা হঠাৎ লিসাকে বলল—তোমার একটা গান শুনি। আমি একাই বোকার মত গেয়ে যাচ্ছি। সুবীর খেয়াল করল গান কেমন লাগছে মা জানতেও চায় না। লিসা বলল—আমি চেঁচাতে পারি, গান গাইতে পারি না। মা বলল—সুবীর একদিন চান করতে করতে চেঁচাচ্ছিল. উই শ্যাল ওভারকাম, সাম ডে, এই রকম কিসব বলছিল। আমি বললুম, এটা কোথায় শিখলি। তা আমার সুবীর তখন তোমার নাম বলল। তুমি এত ভালো ভালো গান জানো? সুবীর দেখল, 'আমার সুবীর' বলার সময় লিসার মুখে সে চকিত কৃষ্ণছায়া পড়েছিল,

তার বদলে সেখানে এখন ঘোর উত্তেজনা। পাছে লিসা সোৎসাহে 'উই শ্যাল' শুরু করে সেই ভয়ে সুবীর তাড়াতাড়ি বলল—ওসব গান অনেকজন মিলে একসঙ্গে গাইতে হয়। সেসব তুমি আর একদিন শুনো। আজ আমরা তোমার গান শুনবো। শূন্য চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে মা আবার হারমোনিয়াম ধরল। একটু বাজিয়ে সুবীরের দিকে ফিরে মিষ্টি হেসে মা বলল, একটা পুরনো মজার গান একটুখানি মনে পড়ছে, শুনবি? সুবীর অনেকখানি ঘাড় বেঁকাল, বলল হুঁউ, গাও। মা গাইল—আমি বোকা নই, বাবা বোকা। বাবা মাকে বিয়ে করেছে। সুবীর দেখল, লিসার চোখে বিস্ময়, মজা। পরের লাইনটা শুনে সে আবার গম্ভীর হয়ে গেল। নিজের ভুল বুঝতে পেরে। বাবা, মায়ের পদতলে শুয়েছে। লাইনদুটো দু' একবার গেয়ে মা বলল, আর মনে নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর একটা বাস পেয়ে, বাসটা ব্রেকডাউন হয়ে গেলে যেমন লাগে, সুবীরের সেই রকম লাগল। তবলায় আলতো করে পাউডার ছড়িয়ে নিয়ে সুবীর বলল—ওসব থাক। তুমি নিজের খুশিতে যা ইচ্ছে গাও, মা। সেটাই তোমায় মানায়। হারমোনিয়ামে আঙুল বোলাতে বোলাতে মা বলল—গাইবো? শুনবি তো? এবার লিসা বলল—শুনবো বলেই তো বসে আছি। সুবীর দেখল—মায়ের চোখে, আবার সেই আসন্নপ্রসবা শূন্যতা! লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে মা বলল—গাই? প্রায় বালিকার মত ঘাড় নেড়ে লিসা জানাল, হ্যাঁ, গান।

চোখ বুজে সেই একই ভঙ্গিতে মা গাইল—মায়ের অঙ্গে নেইকো কানি/ কেন তা কি আমি জানি/মা যে আমার· ·মাগো।

পুরো গানটা পর পর দুবার গেয়ে দম ফেলল মা! সুবীর দেখল, মাকে কিন্তু একটুও ক্লান্ত লাগছে না। সমস্ত মুগ্ধতা মুখে ফুটিয়ে লিসা বলল—দারুণ, সাংঘাতিক। আর একটা।

মা বলল, সব গানের শেষ গানটা গাই। বাকি গান আর একদিন

শুনো। আজ যদি সব শুনে ফেলো, কাল তোমাকে কি শোনাবো? লিসা অপ্রতিভ গলায় বলল—সব গানের শেষ গান মানে? সুবীরের মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি দেখে মা বলল—আগে অনেকবার শুনেছো, কিন্তু এই বয়সেও গাইতে গিয়ে আমার মনে হয়, আগে কোনদিন গাইনি। শোনো। বলে হারমোনিয়ামের শব্দের মধ্যে ঢুকে পড়ে গাইল—মন রে, কৃষি কাজ জানো না।

গান শেষ করে মা ব্যোম হয়ে বসে আছে। দরজার বাইরে থেকে বাবা বলল—আমি আসছি। মা দেওয়ালের দিকে চেয়ে বলল, আচ্ছা। সুবীরের মনে হল, বাবা অফিসে বেরিয়ে গেল বলেই বোধ হয় মা আর গাইবে না। লিসা ভাবছে, মা বুঝি তাকেই গান শোনালো। তুমি থাকবে তো আজ, বলে মা যখন ঘর থেকে বেরোতে যাবে, লিসা বলল—আপনি একদিন যাবেন আমাদের বাড়ি? দরজার পাল্লা ছুঁয়ে মা বলল—তুমি বোধ হয় বিশ্বাস করবে না, বিয়ের পর থেকে এ বাড়ির বাইরে আমি কোথাও যাইনি! বছরে এক মাস শুধু সবাই মিলে বেড়াতে যাই আমরা। উত্তেজনা, রাগ দুঃখ মিশিয়ে লিসা বলল—আপনার ইচ্ছে করে না? উদাসীন প্রশ্রয় নিয়ে মা বলল—আমার ঘরে যা আছে তাই সামলে সুমলে রাখতে পারি না। ছুটে বেরিয়ে লাভ কি? লিসাকে তলিয়ে যাবার যথেষ্ট অবকাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে দিদির উদ্দেশ্যে মা বলল—বাবা কখন অফিস চলে গেল আর তোর এখনো চান হল না মীরা? সুবীর দেখল, এত তন্ময় হয়ে এতক্ষণ গান গাইলেও বাড়িতে কে কোথায় কি করছে সব খেয়াল আছে মায়ের। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুবীর ভাবতে বাধ্য হল, মা যখন থাকবে না তখন সবাইকে এভাবে সামাল দেবে কে? লিসা? সে তো নিজেকেই আজও সামলে রাখতে শিখল না। তিন বছর আগে কলকাতা ফেরার পথে সুবীরের সঙ্গে দেখা না হলে কি নিয়ে ব্যস্ত থাকতো লিসা? যেন চিন্তাটা শুনতে পেয়েই লিসা বলল—কি

ভাবছো? ধরা পড়ে যাবার কোনো ইচ্ছে নেই বলে সুবীর বলল, রতনের অফিসে একদিন আড্ডা মারছি. একজন দাড়িওলা লম্বা লোক কথায় কথায় কি বলল জানো? শুনলে তুমি খুব রেগে যাবে। বলে সময় নিয়ে একটা সিগারেট ধরালো, সুবীর। লিসা বলল, শুনি না। সুবীর বলল, রাগ করবে না বলো: লিসা বলল—না শুনে কথা দেওয়ার কোনো মানে হয় না। বলো না। সুবীর বলল, একটা দাড়িওয়ালা লম্বা লোক খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল, মার্ক্সিজম ইজ এ ডেড চ্যাপটার ইন ইণ্ডিয়া। শুনেই লিসার চোখদুটো একদম অন্য রকম হয়ে গেল। কে সে হরিদাস পাল? সুবীর বলল—তার বাকি কথাগুলো আরও ইণ্টারেষ্টিং। বলে চুপচাপ ধোঁয়া ছাড়তে লাগল সুবীর। একটু চুপ করে থেকে লিসা বলল—শুনি। সুবীর বলল—লোকটা উত্তেজিত হয়ে বলছিল, শুধু মার্ক্সিজম কেন, সব ইজম্-এরই লিমিটেশন আছে। দোষগুণ আছে; আর হাফ-শিক্ষিতরা অশিক্ষিতদের চেয়ে অনেক ডেঞ্জারাস, জানো তো? ফিদেল কাস্ত্রো আমাদের জ্যোতি বসুকে কি বলেছিল মনে আছে? কমিউনিস্ট পার্টি তো একটা হয়, তোমার দেশে এতগুলো কমিউনিস্ট পার্টি কেন? তারপর লোকটা কি বলল জানো, লিসা? বলল, শ্রমিক কৃষক বলে চেঁচাও, যে কোনো চাষীর মুখে যে প্রশান্ত ঐশ্বর্য থাকে, একটা শিক্ষিত প্রিভিলেজড মানুষের মুখে সেই শান্তি দেখা যায়? আসলে একজন মানুষের আসল প্রয়োজন যে কত কম তা তোমরা ভেবে দেখেছ? একজন বুড়ো লেবার আমাকে বলেছিল—বাবু আপনারা দুনিয়ার মজদুর এক হও বলেন, দুনিয়ার সর্বহারা এক হও বলেন, কই, দুনিয়ার কমিউনিস্ট এক হও, তা তো বলেন না? আর একজন গরীব চাষী কি বলেছিল জানো? ভোটের আগে মানুষের মাথা পাঁচ টাকা, আর বাজারে পাঁটার মাথা পঁচিশ টাকা কেজি। কম বয়সে কংগ্রেস পার্টির টিকিট নিয়ে বিনি পয়সায় রেলগাড়ি চেপে কলকেতায়

গিয়ে ঝাণ্ডা ধরেছি, ময়দানে সভায় গেছি, এখন কমিউনিস্ট পার্টির টিকিট নিয়ে ময়দানে যাই। সভা করি। তফাৎ তো শুধু নামে বাবু। লঙ্কায় যে যায় সেই রাবণ। রঙে কি আর গদির তফাৎ হয়? পার্টির কথা পরে হবে, এই অনন্ত চুরি-চামারি কবে একটু বন্ধ হবে বলুন দিদি বাবু।...এখানে এসে সুবীর অল্প থামলো। তেরিয়া ভঙ্গিতে শুনতে শুনতে লিসা বলল—তারপর। সুবীর বলল—লোকটা বলছিল...লোকটা ঘেন্নায় মার্কসিস্ট কথাটা ভালো করে উচ্চারণ করে না, বলে 'মার্কিস', বলছিল—মার্কিসরা যাকে কালচারাল রেভোলিউসন বলে, যেটা নাকি বিপ্লবের পরের কাজ, সেটাই যে সবচেয়ে আগে আর সব সময় দরকার, ভেতরে ভেতরে সেটা যে হয়ে যাচ্ছে, সে খবর কেউ রাখে না। হাজার হাজার বছর আগে যেসব জিনিস নিয়ে ভারতে দারুণ দারুণ রিসার্চ হয়ে গেছে, প্রাণপাত করে তাবড় তাবড় ঋষিরা যেসব কথা কতদিন আগে বলে গেছে, সেসব না শুনে, সেসব নিয়ে চর্চা না করে আমরা ইংরেজি শিখছি, মার্কস বলেছেন, মাও সে তুং বলেছেন বলে চিৎকার করছি, শালা তোদের মার্কস মাও-সে-তুং কালকের ছেলে, নিজের দেশে বহু বছর আগে সেসব কথা বলা হয়ে গেছে, দুশো বছর গোলাম থেকে থেকে তোদের স্বভাবই গেছে পাল্টে। মহানির্বাণ তন্ত্র পড়ে দেখিস, মনুসংহিতা ঘেরণ্ডসংহিতা, চাণক্য শ্লোক, গীতা মহাভারত ভালো করে পড়ে দেখিস, সব ইজমের সেরা ইজম সে সব জায়গায় লেখা আছে। তারপর কি বলল জানো, লিসা? সুবীর একটু থামলো। লিসার তেজ অনেক কমে এসেছে দেখে সুবীর বলল—লোকটা বলছিল, বিবেকানন্দ বার বার বলতেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি যথাক্রমে পৃথিবী শাসন করবে। প্রত্যেক শাসনকালেই কিছু হিতকর ও কিছু অহিতকর কর্ম হবে। লোকটা বলছিল, তোমরা ভেবে দেখ, ব্রাহ্মণ শাসনের প্রাচীন যুগ শেষ, ক্ষত্রিয় শাসনের, রাজা-রাজড়াদের দিনও শেষ। প্রায় সারা পৃথিবীতে এখন বৈশ্য

বা ক্যাপিটালিস্টদের শাসন চলছে। আর শূদ্র যদি প্রলেতারিয়েত হয়, তাহলে নেক্‌স্ট শাসনটা যে তাদের হাতে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি! ইংরেজরা দুশো বছর ধরে ভারত শাসন করেছে, আমার তো মনে হয় ভারতীয়রা দু হাজার বছর ধরে পৃথিবী শাসন করতে পারে।...সুবীর আবার একটু থামলে লিসা বলল, লোকটা গ্যাঁজা ফ্যাঁজা খায় না তো? সুবীর বলল—দূর। দারুণ বোল্ড দেখতে। রতনকে বলে, তোমরা সব ঘুমন্ত আরশোলার জাত। রান্নাঘরে ভাঁড়ার ঘরে অন্ধকার ঘুপচির ভেতর থাকো। তাড়া খেলে ফরর ফরর করে উড়ে বেড়াও। নয় তো ঝাঁটার নিচে চিৎপটাং হয়ে মরে যাও। বলে হো হো করে সুবীর খানিকক্ষণ হেসে নিল। লিসা একদম হাসছে না দেখে সুবীর হাতের সিগারেটে সুখটান দিয়ে অ্যাশট্রেতে সেটা গুঁজে রেখে বলল—অলিম্পিকের সব সোনা ভারতে চলে আসবে যদি ভারতের যত চাষাভূষো আছে তাদের থেকে কিছু কিছু স্যাম্পেল বেছে ট্রেনিং দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়! দুশো বছর যারা শাসন করে গেল তারা তো বাবু হয়ে বসতে পর্যন্ত পারে না, আর আমরা বাবু হয়ে বসে সঙ্গম করি! ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও খিচুড়ির মতন খাবার আছে? প্রাণায়াম আর যোগব্যায়াম বা যোগশক্তির মতন জিনিস পৃথিবীর আর কোনো দেশে আছে? মার্কসের দেশে লেনিনের দেশে মাও-সে-তুঙের দেশে মহাভারতের মতন বই আছে? উপনিষদের মতন বেদের মতন সাহিত্য আছে? ভারতের বাইরে সারা পৃথিবীতে কোনো দেশে শাড়ীর মতন পোশাক আছে, রঙের তফাতে সেই একই পোশাক পুরুষেও পরে, নারীও পরে, এমন আছে? ধুতি ছাপালেই তো শাড়ি! নিরীহ বলে, নির্বিবাদী বলে, আর কতদিন তোমরা আরশোলা হয়ে থাকবে। ইংরেজরা তোমাদের ফেঁতিকুকুর বানিয়ে গেছে বলে তোমরা আর কতদিন ওই নাকি-ইংরিজিতে কাঁদবে—সুযোগ নেই, যোগাযোগ নেই, সামর্থ্য নেই বলবে? সব বড়লোকই একদিন না

একদিন গরীব ছিল। ...সুবীর খুব ম্লান হাসল।...তারপর একটা ইংরেজি সেনটেন্স বলল লোকটা। ওই একটাই। বলে চুপ করে রইল। লিসা বলল—কি সেনটেন্স? সুবীর বলল—টু এভরি অ্যাকশন দেয়ার ইজ অলওয়েজ ইকোয়াল অ্যান অপোজিট রিঅ্যাকশন, কথাটা যদি সত্যি হয় তাহলে যারা শুয়ে শুয়ে হাই তুলে দিন কাটায়, আর পদ্য লেখে নয়তো মনে মনে ভাবে, ছেলেবেলাটা কি সুন্দর যে ছিল, নেতাজী যে কবে ফিরে আসবে, বৃটিশ আমলটাই আসলে ভালো ছিল কিন্তু তারা তাদের ওই হাই তোলার অ্যাকশনের ইকোয়াল আর অপোজিট রিআকশন পাবে। আর যারা সব সময় জেগে থাকে, সব সময় কাজ করে, শুধু বিশ্রামের জন্যে ঘুমোয়, অভিযোগ আর নিন্দে করার জন্যে জেগে থাকে না, তোষামোদ করার জন্যে ছুটে বেড়ায় না, নিজের সুবিধেটা যারা সত্যি সত্যি বোঝে বলে অন্যের যাতে সুবিধে হয় সে কাজও মন দিয়ে করে, তাদের কেউ আটকে রাখতে পারে না। বিবেকানন্দ বলতেন, ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়াময়তা। ক্রিয়ামূলক। তারপর লোকটা বলল—জানো লিসা, বলল—এই ঘরে যতজন লোক আছে, তাদের প্রত্যেকের মনে হাজার ধান্দা, কেউ বললে আমি অমুকের কাছ থেকে সিগারেটটা পাবো, ভেতরের ময়লার কথা ছেড়েই দাও, জামা-কাপড়গুলো ময়লা কেন জিজ্ঞেস করো, নানা জনের নামে দোষ দেবে। বউ কেচে দেয় না, মেয়ের অসুখ, বাসে ভিড়, ভাড়ভ্যাড করবে। নিজের জামা-জাঙিয়া নিজে পরিষ্কার করে নিতে কতক্ষণ লাগে? জিগ্যেস করো, সব দোষ গভর্মেণ্টের, নন্দ ঘোষের। অন্যের দোষ নিয়ে সবাই ব্যস্ত! নিজের দোষের কথা একবার ভাব। তা ভাববে না। একসপ্লয়টেশন একসপ্লয়টেশন বলে চেঁচাও তোমরা, সবাই যে সব সময় সবাইকে একসপ্লয়েট করছে ভেবে দেখেছ? রিকশাওলা কি সুযোগ পেলে আরোহীকে একসপ্লয়েট করে না? মেয়েরা কি ছেলেদের একসপ্লয়েট

করে না? তারপর হঠাৎ, জানো লিসা, লোকটা বলল, ধুর, কাদের কাছে কি বলছি! শোঁয়াপোকা থেকে প্রজাপতি হয় কিন্তু গাধা পিটিয়ে তো আর ঘোড়া হয় না! চলি—বলে হন্ হন্ করে চলে গেল।

অধোবদনে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে লিসা গভীর অস্বস্তি নিয়ে বলল—তোমারও কি ওই রকম মনে হয়। রতন কোন অফিসে যেন কাজ করে।

যে কোনো মন্তব্যকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া আমার স্বভাব নয় লিসা। দুটো জিনিস মানুষের মারাত্মক ক্ষতি করে। প্রিঅকুপেশন আর ডগম্যাটিক অ্যানালিসিস। ভালো করে ভেবে দেখলে অনেক ছোট ছোট ব্যাপার থেকে অনেক বড় ব্যাপার বোঝা যায়। বাবা বলে, তোমার যদি দেশলাইয়ের খোল দিয়ে হাতিঘোড়া তৈরি করতে ভালো লাগে তবে তুমি সারা জীবন শুধু ওই দেশলাইয়ের খোল দিয়ে হাতিই তৈরি করো, আর সব সময় ওই হাতি তৈরির কথা ভাবো, যথাসাধ্য যত্ন আর ভক্তি নিয়ে সারা জীবন যদি তুমি দেশলাইয়ের খোল দিয়ে হাতি বানাও—এক সময় তোমার এমন পার্ফেকসন আসবে ওই ব্যাপারে যে সারা পৃথিবীর লোক তোমার কাছে ওই ব্যাপারে জ্ঞান চাইবে, সাহায্য চাইবে—

কিন্তু এই ডিসটারবান্স আর ডিসট্রেসের দিনে দেশলাই দিয়ে হাতি…

ওঃ। সুবীর এবার স্পষ্ট বিরক্ত হল। ভালো করে ভাবা আর খোলা চোখে দেখার অভ্যেসটা পৃথিবী থেকে উবে যাচ্ছে নাকি। সব সময় প্রিঅকুপেশন, সব সময় তাড়াহুড়ো—যতদিন যাচ্ছে তত পেছিয়ে যাচ্ছে সভ্যতা, সোজা কাজটাই জটিল হয়ে যাচ্ছে, পাঁচ মিনিটের কাজ তিন মিনিটে করতে গিয়ে আসলে দশ মিনিট সময় লেগে যাচ্ছে। অংকের ক্লাসে ইংরেজি শিখছি সবাই।

উত্তর দিতে না পেরে ভুল বকছো।

সব উত্তর তোমার নিজের মধ্যেই আছে লিসা। তোমার কি করতে সবচেয়ে ভাল লাগে ?

বই পড়তে। বলে স্ুবীর খুব মন দিয়ে আর একটা সিগারেট ধরাল।

তোমার কি মনে হয়, মার্কসসিজম ইজ এ ডেড চ্যাপটার ইন ইণ্ডিয়া ?

রবীন্দ্রনাথের গোরা বলতো—ভারতবর্ষের পরিবর্তন ভারতের পথেই হওয়া চাই। হঠাৎ ইংরেজি ইতিহাসের পথ ধরতে আগাগোড়া সমস্ত পণ্ড ও নিরর্থক হয়ে যাবে। আর গোরা যার আদলে তৈরি সেই বিবেকানন্দ বলতেন—রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন যতই হোক না কেন, মানুষের জীবনের দুঃখকষ্ট কিছুতেই ঘুচবে না। বলতেন—গোঁড়ার মতন আধ্যাত্মিক জড়সভ্যতার বিরুদ্ধতা করা যেমন আঙুর ফল টক জাতীয় ব্যাপার, তেমনি বোকার মতন আধ্যাত্মিক উন্নতিকে ভুল বুঝে আননেসেসারি মনে করাটাও মিসইনটারপ্রিটেশন। বলতেন—আমি যে একজন সমাজতন্ত্রী, তার কারণ এই নয় যে, আমি ওই মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মনে করি, বলতেন—সোস্যালিজম হল নেই মামার চে কানা মামা ভালো। আর কমিউনিজম সম্পর্কে বলতেন—যথার্থ সাম্যভাব জগতে কখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এবং কখনও হতেও পারে না। ভগবান সম্পর্কে বলতেন—জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান করছেন, এছাড়া ঈশ্বর ফিশ্বর কিছুই নাই। গরীবদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারটা ভীষণ দরকার, সমস্ত যুবকের সারা ভারতে আগুনের মতন ছড়িয়ে পড়া দরকার—বার বার বলতেন। অদ্ভুত বিরক্তি নিয়ে মজা করে বলতেন—আহাম্মক, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পায়চারি করছ! ইংরেজি চিন্তার বদহজম নিয়ে কেরানি হবার স্বপ্ন দেখছ !

নিজের কথা বলো। লিসা খুব সরল, তীব্র ও স্বাভাবিক চোখে সুবীরের দিকে তাকাল।

ম্যানিফেস্টোতে বলে, সমাজের ইতিহাসটা শ্রেণীযুদ্ধের। বিশ্লেষণ পদ্ধতিটা আমার একটু মীন মনে হয়, একটু ন্যারো। বিবেকানন্দ বলতেন—পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষের ইতিহাস।

নিজের কথা বলো। লিসা একইভাবে চেয়ে রইল।

একটু চুপ করে থেকে সুবীর বলল—সইতে পারবে? তারপর নিজেই বলল—অবশ্য সহনশীলতাই মমিদের ঐশ্বর্য।

মমি মানে?

চারপাশের সব মানুষকেই আমার মমি মনে হয়, ডোণ্ট মাইণ্ড। বাসে-ট্রামে রাস্তাঘাটে সব সময় দেখি—সবাই কেমন যেন ঘুমোচ্ছে। ঝিমোচ্ছে। কাঁই কুঁই করে অভিযোগ করছে। ভাঙা স্বাস্থ্য। নোংরা মন। ছোট নজর। স্বাস্থ্যটা ভালো রাখা কি খুব শক্ত। মনটাকে বাগে আনা কি খুব কঠিন! নজরটা উঁচু রাখলে ক্ষতি কি!

তোমাকে মাঝে মাঝে খুব ফিউডাল লাগে, আবার মাঝে মাঝে খুব রিভোলিউশনারি মনে হয়।

সত্যি কথা বলবো?

বলো না।

সকালবেলায় আমি খুব ফিউডাল থাকি, সামন্ততান্ত্রিক। দুপুরবেলা বেশ ধনতান্ত্রিক থাকি, ক্যাপিটালিস্ট সুবীর চক্কোত্তি। আর সন্ধ্যের পর মানুষজনকে ঘরে ফিরতে দেখে আমার মধ্যে খুব সাম্যভাব জাগে—তখন নিজেকে খুব সমাজতান্ত্রিক মনে হয়। জানো তো। আর রাত্তিরবেলা···· বলে থেমে রইল সুবীর।

রাত্তিরবেলা কি?

দুষ্টু দুষ্টু মুখ করে সুবীর বলল—রাত্তিরবেলা যখন কিছুতেই ঘুম আসে না, তখন ওইসব সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্র সব তন্ত্রকেই শালা মমিতন্ত্র বলে মনে হয়—

সুবীরের বলার ভঙ্গিতে এতক্ষণে লিসা খিল খিল করে হেসে উঠল। তুমি একটা যা-তা, বলতে বলতে তার হাসি বাড়তে লাগল। উচ্ছ্বাস সংক্রামক। তাই সুবীরও হাসতে লাগল মিটমিট করে।

সেজেগুজে অফিসে বেরোবার আগে ঘরে ঢুকলো দিদি। ওদের হাসতে দেখে বলল—ইস, কি আড্ডা, কি আড্ডা! তোদের সঙ্গে বসে যেতে ইচ্ছে করছে খুব। লিসা বলল—রোজই তো অফিস যাও। আজ তুমি কামাই করো না। সুবীর বলল—উঁহু, একদম না। একছুটে অফিস চলে যাও। না গেলে জাম্বু খুব চিন্তা করবে। দিদি বলল—মারবো এক চড়। লিসা বলল জাম্বু মানে? সুবীর বলল—সেকি, জাম্বু মানে জামাইবাবু তাও জানো না? লিসা হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল। হাসি থামলে তার থুতনি তুলে ধরে দিদি বলল—দেখেছিস, নিজের সুবিধের জন্যে তোর বর আমায় কেমন তাড়িয়ে দিচ্ছে? লিসা বলল, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, তারপর আমরা তোমার গান শুনবো। দিদি বলল—থাকবে আজ, তুমি?

মুঠোয় আঁচল নিয়ে মুখ নিচু করে লিসা স্পষ্ট অথচ নরম স্বরে বলল—যদি তাড়িয়ে না দাও, আমি এখন থেকে এখানেই থাকবো।

# ঘোড়া

রেসকোর্সের রিজেক্টেড ঘোড়াগুলো আমরা কিনি। তারপর এদের রক্ত আমরা ওষুধ তৈরির জন্যে কারখানায় পাঠাই। খুরও মানুষের কাজে লাগে। দেখুন এখন কেমন চেহারা হয়েছে ওদের। জানুয়ারিতে আমাদের ঘোড়া ছিল চৌষট্টিটা। বিয়াল্লিশটা গত তিন মাসে মারা গেছে। রেগুলার ব্লাড টেনে নিলে কতদিন আর বাঁচবে বলুন।

বি আই কম্পানির সার্জন মিস্টার সেনগুপ্তর কথা শুনতে শুনতে আমরা সেই প্রাণীগুলিকে দেখছিলাম যেগুলো একদা ঘোড়া ছিল। এখন তাদের কোমরের কাছটা শাদা শুকিয়ে আসা দাদের মতন। চামড়া হাড়ের ওপর চেপ্টে আছে। পেটের কাছে নেমে যাওয়া ঢালু গোল গর্ত। মুখে পায়ে শিরাগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। পায়ে খুরের বদলে শুকনো রক্তের রঙ মাখানো মাংসপিণ্ড। চোখে পরিষ্কার লেখা—মৃত্যু, কেন দেরি করছ আজও।

আস্তাবলের ভেতরে বাঁদিকটা ঘন আগাছায় ভর্তি। একসময় সবই খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। এখন কম্পানির অবস্থা ভালো যাচ্ছে না তাই। এটা অফিসঘর। এত নোংরা একটা ঘরকে অফিস বলছি বলে হাসি পাচ্ছে তো। আসলে আমাদের এখানে কোনো পেপার-ওয়ার্কের ঝামেলা নেই। আমিও আজকাল খুব কম আসি। বলতে বলতে মুখার্জি আস্তাবলের কোন একটা ছোট্ট একটি একতলা বাড়ির একমাত্র ঘরটিতে ঢুকলেন। ভেতরে একটা পুরনো ধরনের টেবিল আর দুদিকে দুটো ভাঙ্গা চেয়ার ছাড়া আর যা-কিছু আছে তার নাম ধুলো।

ঘরের অবস্থা দেখে বিজয় বলল, চলুন মিস্টার মুখার্জি, আমরা ছাদে যাই।

নিচু ছাদ হলেও সেখান থেকে আস্তাবলটা অন্যরকম দেখাল। মাঝখানে একটু লম্বা সরু বেঁকা ধরনের চৌবাচ্চা, সেখানে খাবার দেওয়া হয়েছে। দুডজন একদা ঘোড়া ছিল, জন্তুগুলির অনেকেই সেদিকে না গিয়ে খুব অন্যমনস্কের মত পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। দুটো বুড়ো সাইজের ঘোড়া আমাদের দিকে পিছন করে আস্তাবলের একদিকের দেয়ালের ছোট ছোট সারি সারি খুপরির মধ্যে দাঁড়িয়ে। প্রশান্ত সেই দুটো ঘোড়ার দিকে আঙুল তুলে মিস্টার মুখার্জিকে বলল, ওগুলো কি নতুন?

মাসখানেক হল আনা হয়েছে। বাঁদিকের ঘোড়াটার নাম ছিল ক্রেপেলা। রেসের মাঠে অনেক রেস্তুড়ের চোখের মনি ছিল। এখন বুড়ো হয়ে গেছে। এক মাসে অ্যাকসিডেন্ট করেছে তিনটে!

বিজয় রেসকোর্সের একদা উজ্জ্বল ক্রেপেলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল অ্যাকসিডেন্ট মানে?

প্রথম প্রথম রক্ত নেওয়ার পর এরা মাঝে মাঝে খেপে যায়। হঠাৎ হঠাৎ সমস্ত আস্তাবলটা তোলপাড় করে ছুটতে থাকে। তখন তাদের বাগে আনতে বেশ বেগ পেতে হয়। শিউশরণ নামে আমাদের একজন লোক এখন ক্রেপেলার লাথি খেয়ে হাসপাতালে।

প্রশান্ত বলল, শোষণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিদ্রোহ। আমরা হেসে উঠলাম। একটা খুব রোগা ঘোড়া বেড়ার কাছাকাছি জায়গা থেকে আমাদের দিকে মুখ তুলে করুণ আওয়াজ করল—চিঁ হি। শুনে মনে হল, অসহায়তার এর থেকে ভালো কোনো শব্দ হয় না।

একসময় গায়ের রং বাদামি ছিল, এখন পুরোনো ইটের মত হয়ে গেছে, এরকম একটা ঘোড়া দেখিয়ে আমি বললুম, ওই ঘোড়াটার নাম কি?

মিস্টর মুখার্জি বললেন, যখন ছুটতো তখন হয়তো লোকে বলতো ষ্টর্মি কিংবা স্থইট অ্যালিয়্যান্স কিংবা বিলিয়ন একসপ্রেস। এখন আমরা ওকে সাতাশ নম্বর বলি। প্রত্যেকের আলাদা নম্বর আছে।

প্রশান্ত বলল, বাঁদিকের ওই আগছায় জঙ্গল আর ডানদিকের বেড়ার ওপারে ওই ঘোড়ার স্মৃতির মতন ঘোড়াগুলোকে দেখে মনে হচছে, এই বি আই কম্পানির মালিকের নাম মিসেস ফ্যানিংস, ভদ্রমহিলা খুব রাগী আর বৃদ্ধা ঘোড়াগুলোর নাম দিয়েছেন নিজের প্রাক্তন প্রেমিকদের নামে—জন, হ্যারি, টমাস.... ।

সেটা খুব বাজে ধরনের ইংরেজি গল্প হয়ে যাবে। বলে বিজয় সিগারেট ধরালো।

বাইরে 'জয়শ্রী বিড়ি' লেখা একটা দর্মায় দেয়ালঘেরা চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে বিজয় বলল, তোর বাড়ির কাছে একটা আস্তাবল আছে বলেছিলি, কিন্তু আস্তাবলটা কি রকম সেটা আগে বললে দেখতে আসতুম না।

বিজয়ের মাথার অনেকখানি টাক। সেটা ঢাকা দেওয়ার জন্যে বিশেষভাবে আচড়ানো চুলের ওপর মাঝে মাঝে হাত বুলোনো তার বদভ্যাস। আঙুল দিয়ে চুল সরিয়ে টাক ঢাকা দিতে দিতে বিজয় বলে যাচ্ছিল—ঘোড়াগুলো দেখে খুব মন খারাপ হয়ে গেল।

প্রশান্ত একটু মোটা। বছরখানেক হল বিয়ে করে গোঁফ রাখছে। এল আই সির প্রিমিয়াম নিজে ঠিক সময় দিয়ে আসে। একদম হিন্দি সিনেমা দেখে না। বিজয়কে বলল, তোর সার্ভিস কত বছর হল ?

বিয়ে করার উপকারিতা সময় চলে গেলে আর কোন দিন ফিরে আসে না, এইসব পুরোনো প্রতিপাদ্যগুলো প্রশান্ত বিজয়কে আর একবার বোঝাতে শুরু করবে বলে তাকে থামবার জন্যে বললাম—আস্তাবলটা ভেতরে একদিন পিকনিক করবি !

একদম গা না করে বিজয় বলল, বি আই কোম্পানি পুরো কথাটা কিরে ?

বেঙ্গল ইমিউনিটি। বলে প্রশান্ত একটু সরু হাসল। কেন, কোম্পানিটা তুলে দিবি নাকি ? এত ঘোড়াপ্রেমিক কবে থেকে হলি।

আজ থেকে। চশমাটা নাকের ওপর ঠিক জায়গায় ঠেলে দিয়ে বিজয় প্রশান্তর দিকে মড়ার মতন তাকালো। কাল অফিসে গিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিস—

এককথা অনেককে বলা প্রশান্তর অভ্যাস। একটুও আনস্মার্ট না হয়ে সে বলল, আজকে আগে বাড়ি গিয়ে বৌকে বলব।

বিজয় বলল, ঘোড়াগুলো তোর দিকে কিরকমভাবে তাকাচ্ছিল সেটা বোঝাতে পারবি বৌকে ?

প্রশান্ত আবার তার মোটা নাকের নিচে ছড়ানো দাঁত দেখিয়ে বলল কেন পারবো না। বলব, পূজোর আগে শাড়ি না আনলে কিংবা অনেক দিন সিনেমা দেখতে না নিয়ে গেলে তুমি যেভাবে আমার দিকে তাকাও।

তিনজনে একসঙ্গে হেসে উঠলাম। হাসতে হাসতেই বিজয় বলল, চায়ের দামটা দিতে বললে তুই কি এখন ওইভাবে তাকাবি ?

তুই কি ভাবছিস এইসব বললে আমি উত্তেজিত হয়ে সত্যি সত্যি দামটা দিয়ে দেব ?

আমার পাড়ায় এসেছিস যখন, তখন এটা আমার ওপরেই ছেড়ে দে। বলে বিজয়কে বললাম, কিন্তু ঘোড়াগুলো আমাদের দেখে কি ভাবছিল বল তো।

অনেকক্ষণ থেকে বিজয়ের মাথায় যে শব্দগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে সেগুলো বলে ফেলতে ইচ্ছে হল তার। ঘোড়াদের খুর কেশর দিয়ে তৈরি হচ্ছে তোমাদের সুখ স্বাস্থ্য সুসময়। সেসব না বলে বিজয় বলল, ভাবছিল-

দেখছো স্যাখো। যৌবনে যখন রেসের মাঠে দৌড়েছি তখনও দেখেছো। এখন যখন শুকিয়ে যেতে যেতে ঘোড়ার বদলে শুকনো খচ্চর হয়ে বেঁচে আছি তখনও দেখছ। স্যাখো। বলে মুখটা বিজয় এমন ভ্যাংচালো যে প্রশান্ত বেশ শব্দ করে অনেকক্ষণ হাসল।

টেবিলের কোণের দিকে দুটো কালো মতন স্বাস্থ্যবান ছেলে চা শেষ করে হিন্দী সিনেমা নিয়ে গল্প করছিল। এখন হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল— ছোড়দা পাঁচ পয়সার বিড়ি।

ছোড়দা বলে যাকে ডাকা হল তিনি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা খদ্দেরের পান সাজতে ব্যস্ত ছিলেন। বেঁটেখাটো চেহারা, যাত্রাদলের সখীর মতন লম্বা লম্বা চুলের মাঝখানে সিঁথি, গালের হাড় দুটো উঁচু। টেনে বললেন—এখানে এসে নিয়ে যাও, সকাল থেকে গাধার খাটুনি খাটছি, আমি কি মানুষ নই, বিশ পয়সার চা দুজনে খাবে, তার পাঁচ পয়সার বিড়ি দাও, মুখে আগুন দাও—অত পারবো না, এখানে এসে নিয়ে যাও।

প্রশান্ত বিজয়ের দিকে চোখ টিপে আস্তে বলল, বি আই কম্পানির ঘোড়ার মতন লাগছে না। বলে ঠোঁট ফাঁক করে হাসতে লাগলো নিঃশব্দে। বিজয় দেখল প্রশান্তকে বড় অশ্লীল দেখাচ্ছে। বলল, সন্ধে হলেই তো অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফিরে ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে থাকিস। বাড়ি যা দেরি দেখলে বৌ খিস্তি করবে।

বিয়ে করলে বুঝতিস, সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরার মধ্যে কোনো আনস্মার্ট ব্যাপার নেই। বলে প্রশান্ত গোঁফে আঙুল বুলিয়ে নিল একটু। ঘড়ি দেখে বলল—আর মিনিট পনেরো পরে উঠবো।

শ্বশুরবাড়ি যাবি, না নিজের বাড়ি?

শ্বশুরবাড়িটা ডালহৌসির খুব কাছে বলে আর প্রশান্তর বৌ-এর কোনো ভাই বোন নেই বলে সে প্রায়ই শ্বশুরবাড়িতে থেকে যায়।

নিজের বাড়ি মানে ঢাকুরিয়া ব্রিজের নিচে নেমে বাঁদিকে মিনিট পঁচিশ হেটে ভাড়া নেওয়া তিনটে ঘরের মধ্যে এগারোজন মানুষের ভিড়-চেঁচামেচি। তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে দাদা-বৌদি ছোট দুই ভাই। সব থেকে ছোট এক আদুরে বোন আর মা বাবা—প্রশান্ত নিজেই বলে—শ্বশুরবাড়িতে অ্যাডভোকেট শ্বশুর একতলায় ক্লায়েন্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকে, দোতলাটা ফাঁকা, তিন তলায় টিভি চালিয়ে সন্ধেবেলা বাচ্চাকে নিয়ে শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানা—একটা ব্যাংকের চাকরির জন্যে যদি এতটাই পাওয়া যায়—নিজের বাড়ি কে যাবে বলে। শ্বশুরের ছেলে নেই বলে প্রশান্তকে তিনি অঢেল স্নেহ আর উত্তরাধিকার দিয়ে রেখেছেন। বিজয়ের প্রশ্নে যে ছোট আলপিনটা ছিল সেটা হজম করে প্রশান্ত বলল এই বরানগর থাকে ঢাকুরিয়া? এখন সাতটা বাজে! পৌঁছতে বেলা কাবার হয়ে যাবে।

এই ধরনের মন্তব্য শুনলে বিজয় সাংঘাতিক রেগে যায়। সে নিজে বাসা পাল্টাতে পাল্টাতে কলকাতা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। ছোটবেলায় তালতলা তখন ইডেনে বা ময়দানে ভোরবেলা হেটে বেড়াতে যেত রোজ। তারপর শ্যামবাজার! এখন সোদপুরে খুব ছোট্ট একটা বাড়ি করেছে লোনে। চারপাশে বেড়া দিয়ে গাছ লাগিয়েছে। শুধু কলকাতায় ট্রেনে যাতায়াত করাটা তার অভ্যাস হচ্ছে না। নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বিজয় ট্রেনে যারা আরো দূর থেকে—ব্যারাকপুর বনগাঁ কৃষ্ণনগর নৈহাটি থেকে রোজ কলকাতায় আসে, তাদের অসুবিধের কথা মন দিয়ে ভাবার চেষ্টা করে। নিজে আগে একেবারে ধর্মতলায় থাকতো বলে এখন প্রশান্তর ঢাকুরিয়া ফিরতে না পারার ইয়ার্কি তার ভালো লাগলো না। বলল, যা বাড়ি যা! টিভিতে সিনেমা আছে। আজ রবিবার না?

বিজয় ট্রেনে যেতে যেতে ভিড়ের মধ্যে কোন রকমে কাত হয়ে

দাঁড়িয়ে পাশের লোকের যাতা বকবক শুনছিল আর ঘামছিল। প্রথম যখন চাকরিতে ঢুকি, মাইনে ছিল একশো পঞ্চান্ন টাকা। এখনকার চেয়ে অনেক সুখে ছিলুম। শুনে বিজয় মনে মনে বলল, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে আমিও কি এইরমক কিছু বলব।

বাড়ি ফিরে দেখলুম পাশের বাড়িতে বাড়িওয়ালির সঙ্গে একতলার ভাড়াটে বৌয়ের তারস্বরে চিৎকার বিনিময় হচ্ছে। রোজই হয়। আজকের বিষয়--কোনো চেষ্টা না করেই বোঝা গেল—ভাড়াটে বৌ-এর শুকোতে দেওয়া শাড়ি বাড়িউলির দুষ্ট ছেলে কাঁচি দিয়ে কেটেছে।

খেতে দিতে দিতে মা বলল, তোতোন হিন্দি সিনেমা দেখেছে স্কুল কেটে। দাদার ছেলে অথচ আমি ছাড়া অন্য কারো কথা শোনে না বলে আমার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা উচিত। ডালে নুন কম আর ভাত শক্ত কেন জিগ্যেস করলে মা বলল—কাশী যাবার ভাড়া দিবি?

বৌদি চাকরি করে বলে রান্নাঘর বোঝে না।

প্রশান্ত শ্বশুরের ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শ্বশুরকে বলতে শুনল—মশাই জমি আপনার দখল পেলে ফায়দা আপনার, তখন তো ভুলেও মনে রাখবেন না আমাকে, এত কষ্ট করে কেস সাজাচ্ছি দিনের পর দিন মুখে ফেনা তুলে লড়ে যাচ্ছি—আর পয়সার কথা বললেই তো-তো করেন কেন? এত কম টাকায় মামলা হয়?

শোবার আগে প্রশান্ত অনেকক্ষণ ধরে চুল আঁচড়ায় রোজ। চুল ওঠা বন্ধ করার জন্যে আজ পাড়াগাঁর তৈরি একটা হোমিওপ্যাথিক হেয়ারডাই মেখে খুব কাজ হয়েছে। গোঁফে চিরুনি বুলোতে বুলোতে সে বৌকে বলে—তুমি কখনো ঘোড়ায় চেপেছো?

বাচ্চাকে ঘুম পাড়াতে পাডাতে বৌ বলল—চাপিয়েছো কখনো?

# ভোলে বাবা ও ভুলভুলাইয়া এবং ভুবন

এখানে ভুবন একটা লোকের নামই শুধু, বলে রাখি, ভুবন মানে ভুবন নয়। ভুবন সেইরকম লোক যাকে নিয়ে আমার এখন ভোলে বাবা আর ভুলভুলাইয়ার গল্পটা লিখতে হবে। এখন ঝামেলার ব্যাপার একটাই। ভুবন কিরকম লোক?

এখন লোক ঠিক কিরকম সেটা কথা বলে বা দু দশ পাতা লিখে তা দু দশ বছর রোজ দেখেও যে আসলে বোঝা যায় তা মনে হয় না। তবু ভুবন একদম আমার মতন লোক নয় বলে আমি চেষ্টা করার সাহস পাচ্ছি।

ভুবনকে আমি যেমন সবটা বুঝতে পারি না ভুবনও তেমনি আমাকে খুব ভুল বোঝে। ভুবনের এই ভুল বোঝার প্রবণতাটাকে আমি একদিন বলেছিলাম—ঢ্যাম্‌নামি। উত্তরে ভুবন দাঁত কেলিয়ে বলেছিল – নিজের বিয়ে করা বৌ, যাকে রোজ দুবেলা ল্যাংটো করছি তাকেই আজও বুঝে উঠতে পারলুম না তো....

আমি আর একবার বেশ কায়দা করে ভুবনকে বলেছিলাম—ঢ্যাম্‌না।

ভুবনের অনেক অভিজ্ঞতা বলে বোলে, ভুবনকে আমার ভালো লাগে। দেখা হলেই ভুবন এমন এমন নানারকম অভূতপূর্ব ও সাংঘাতিক সব গল্প বলে, যে আমি হাঁ করে শুনি। ট্রেনে লজেন্স ফিরি করা থেকে শুরু করে ব্যাংক ডাকাতি ওব্দি—ভুবন যে কোনো কাজ অনায়াসে করে ফেলতে পারে বলেও ভুবনকে আমি ভালোবাসি এবং ভয় পাই। ভুবনের একটা মেয়ে, একটা বৌ, একটা ছোট্ট বাড়ি, আর অনন্ত পরিশ্রম ক্ষমতা এবং ক্ষুরধার বুদ্ধি ও প্রয়োজন মতন ন্যাকামি আছে। ভুবনের

চশমা, দাড়ি, সাইকেল, অকারণ ভান ও ধর্মভীরু সত্যবাদিতা নেই। আমি তাকে ভালোবাসলেও ভুবন আমাকে পাত্তাই দেয় না।

নাই দিক। এবার গল্প।

কলকাতায় শীত আসে দলবাঁধা ভেড়ার পিঠে চেপে। মিনিবাসের ড্রাইভার্স কেবিনে জানলার ধারে একদম প্রথম সিটটায় বসে একদল ভেড়া দেখতে পেয়ে কথাটা ভাবল ভুবন। পিজি পেরিয়ে রবীন্দ্র সদনের সামনে আসতেই দেখতে পেল ভিক্টোরিয়ার নির্বিকার পরী, নীচে সবুজ গাছপালা, ওপরে সংসারের ভেতরকার চেহারার মতন ফাঁকা কিন্তু আসলে জটিল আকাশ যাকে দৃষ্টি শক্তির দোষে আমরা নীল দেখি। ভুবনের মনে পড়ল, পকেটে ঠিক বাহাত্তর টাকা সাতচল্লিশ পয়সা আছে। একটা দু পয়সা আজ তিন মাস ধরে খরচ করা যাচ্ছে না তাই খুচরার ফিগার কিছুতেই রাউণ্ডে আসছে না। ব্যাপারটা বৌয়ের কাশির মতন বিরক্তিকর। অন্যদিনের তুলনায় কাছে আজ টাকা খুবই কম। ভুবনের অন্য অনেক বাণীর মধ্যে একটা হল—লাইফ ইজ অ্যান আর্নিংমানি অ্যাণ্ড স্পেণ্ডিং মানি অ্যাফেয়ার।

পার্ক স্ট্রিটের মুখে আসার সময় ভুবন দেখল—ফুটপাথে রঙিন মেয়েরা উড়ে বেড়াচ্ছে; একটু ওপরে কাছাকাছি আকাশে উড়ছে বাটার বেলুন; তলায় উড়ছে বাটার বাণী লেখা সই—বাটা আণ্ডারস্ট্যাণ্ডস্ শুস্। ভুবন ভাবল—আমার ডাকনাম টাটা হলে ওরকম একটা টাটা লেখা বেলুন ভাসিয়ে মানুষের আকাশে মানুষের পৃথিবীর উদ্দেশে লটকে দিতাম—টাটা নেভার স্ট্যাণ্ডস্ ইউ শুস্।

দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই হাঁস ভুবন জানে—খালি প্যাক প্যাক প্যাক প্যাক করে। অথচ হাঁসেদের আসল ক্যালি—নীর ফেরে ক্ষীর খাওয়া—প্রায় কোনো মানুষেরই নেই। হরিণের স্বভাব পালিয়ে বেড়ানো —বাঘের স্বভাব তাকে তাড়া করা—যার যা কাজ সে তা করবেই—

মাঝখানে এত কচকচি কিসের? বাঘ বা হরিণ—কারও ব্যর্থতাই ভুবন পছন্দ করে না।

গরীবেরা গরু। যেসব রাখাল তাদের চরায় তারা ধনী হবে, দাপটে বাঁচবে, এতে এত রাগের কি আছে। ভালো থাকার সঙ্গে পয়সার কোনো সম্বন্ধ নেই ভুবন ছোটবেলায় বুঝে গেছে। তখন ট্রেনে লজেন্স ফিরি করত, তা ডেলি বিশ থেকে ষাট টাকা তখনই কামাতো সে, বারো বছর বয়সে। এখন অনেক লাখোপতি মালের টেবিলে তার কাছে কাঁদে। সেই এক প্যাঁক প্যাঁক—আমি ভালো নেই। বাঞ্চোৎ—তুই ভালো নেই তো আমার কি। আমি ভালো আছি। আমি যদি মনে করি আমি ভালো আছি তোর মেজোকাকার সেজো শালার বাপের ক্ষমতা আছে আমাকে খারাপ রাখবে?

নিজের পয়সায় বিজনেস করে পাঁটারা। ঝাড় খায় আর ডাক ছাড়ে—ব্যা-আ। কমিশন এজেন্সি কথাটা ভুবন খুব ভালোবাসে। দালাল বললে কেমন একটা গ্লানি···। মেয়েছেলেরা শাড়ি পরতে ভালোবাসে আর ফিফটি পারসেন্ট ধারে মাল সাপ্লাই দেবার ক্ষমতা রাখে, আট লাখ টাকা বাজারে পাওনা ফেলে রাখতে পারে—এমন মহাজনের সঙ্গে চেনা আছে, এ দুটো ঘটনা জুড়ে দিলেই পকেটে টাকা আসে। মাল কমানোর এরকম দুহাজার লাইন জানে ভুবন। গোয়া থেকে মদ কিনে বোম্বে কি কলকাতায় এনে ঝেড়ে দিলে একবছরেই গাড়ি কিনে ফেলা যায়। অন্তত সেকেণ্ড হ্যাণ্ড।

তা না। বাঞ্চোতেরা চাকরি চায়। খাঁচার পাখি। ছোলা দাও। গুড় দাও। আমি দাঁড়ে বসে ডাকবো—বাংলা বন্ধ, ব্যর্থ করো। বাংলা বন্ধ, সফল করো। আমাদের দাবী মানতে হবে। এ লড়াই বাঁচার লড়াই, লড়াই করে বাঁচতে হবে। কেলানে—বাঁচতে হবে কি রে? প্রত্যেক মুহূর্তে লড়াই করেই তো বেঁচে আছি সেই মায়ের পেট থেকে পড়ার পর

থেকেই। এখনও হবে।

চৌরঙ্গী ঢোকার মুখে ভালো মন্দ মেয়ে দেখা যায়। মেয়েছেলে জাতটা শীতকালের পদ্ম-পুকুরের মতন। ঠিকমতন রোদ পড়লে সকাল সন্ধেয় দেখতে বেশ ভালো লাগে। ডুব দিয়ে আসতে গেলেই ফ্যাচ্‌ফেঁচে সর্দি লেগে যাবে। খুব সহ্যগুণ থাকলে আলাদা কথা।

পাতাল রেলের প্রস্তুতির চিহ্ন পড়ে আছে বাঁদিকে। ছোটখাটো পাহাড় বলে চালিয়ে দেবার মতন মাটির স্তূপ, খাঁজে খাঁজে রাস্তা, অস্থায়ী গ্রাম,নেশার ঠেক। দেখতে দেখতে একদম সম্পর্করহিত একটা ভাবনা হল ভুবনের। মানুষজন দ্রুত পাখি হয়ে যাচ্ছে। ঘুম ভাঙালেই কেউ ডাকে—অফিস যাবো, অফিস যাবো। কেউ ডাকে—অসুবিধে, অসুবিধে। কেউ ডাকে—নতুন মেয়ে, নতুন মোয়। কেউ ডাবে আর পারিনা, আর পারি না। ভুবনের নিজের ডাকটা কি হবে? ভুবন এক সেকেণ্ড চোখ বুজেই পেয়ে গেল। বলবো কেন—বলবে কেন? পাশের লোকটা অনেকক্ষণ থেকে ডেকে যাচ্ছে—পয়সা নেই, পয়সা নেই। তার পাশের লোকটা ফ্ল্যাট চাই, অল সেপারেট····। কানটাকে পরিষ্কার ঘুম পাড়িয়ে দিল ভুবন।

চৌরঙ্গীতে থামতে দুটো মেয়ে এই বাসটায় ওঠা নিয়ে রীতিমত ঝগড়া লাগিয়ে দিল। না, আমি কিছুতেই এই বাসটায় যাবো না, যেতে হয় তুই যা। বারে, সারাদিন একসঙ্গে থেকে এখন আমি তোকে ফেলে চলে যাবো! ভুবনের মনে হল—পৃথিবীর চূড়ান্ত দুরারোগ্য রোগটির নাম মতের অমিল। রাজনৈতিক দল, গ্রুপ থিয়েটার, জয়েন্ট কিংবা সিঙ্গল সংসার, সবাই কম বেশি একই রোগে ভুগছে। মতের অমিল। এক থেকে অনেক হওয়ায় ভারতীয় থিওরিটারও মূল উৎস বোধ হয় এই অসুখ। মতের অমিল। ভুবনের মনে হল।

ততক্ষণে ড্রাইভার'স কেবিনের দরজা গোড়ায় এক রোগা স্মার্ট চশমা-

পরা ব্রিফকেসধারীর সঙ্গে এক ভোঁৎকা মফস্বলবাসী পোঁটলা পুঁটলিওলা মধ্য বয়স্কের তুমুল গলাবাজি শুরু হয়েছে। সুতরাং ভুবনের কানের ঘুম ভেঙে গেল।

পুঁটলিওলা—আপনার এই খোঁচাকেসটা সামলাম।

ব্রিফকেসওলা—আপনার এই জ্বালাময়ী উদরজ্বালাটি আপনি সামলান।

পুঁ—মুখ সামলে কথা বলবেন চিংড়িমশাই। ( সহযাত্রীদের হাসি )

ব্রি—ওষুধ না সরষের তেল—কোনটার কারবার ভেজালমশাই ? ( হাসি )

পুঁ—বাজে বকবেন না চিংড়িমশাই—আমি আলু পাটের কারবার করি—

ব্রি—ওই জন্যেই তো আলুবাজ পাটালির মতন গোলগাল চেহারা ( হাসি )

পুঁ—চড়িয়ে গাল নাড়িয়ে দেব শালা উচ্চিংড়ে····

ব্রি—গাল, না বা ? ( কণ্ডাকটরের উচ্চহাস্য )

পুঁ—আপনিও হাসছেন—আপনার বাসে এইসব আজেবাজে লোক তুলবেন আর তারা ভুল বকলে আপনি হাসবেন ? দেশে কি মানুষ নেই ? সব পাঁঠা ?

ব্রি—না না, ভুঁড়িদাস দাদা, সব ফাটা আপনিও ( সুন্দরী যুবতীর হাসি )

পুঁ—এ্যা—কলকেতা শহরের মেয়েছেলেরাও কি নোংরা রে বাবা, এসব খারাপ খারাপ কথা শুনে দাঁত বার করে হাঁসে ?

ব্রি—শুধু দাঁতে হচ্ছে না—আর কি কি বার করে হাসতে হবে ? (উঃ হাসি)

পুঁ—একে এই ছাগলবাঁধা ভিড়ের মধ্যে ছোটবেলার মতন চেয়ার হয়ে ডাঁইরে থাকতে থাকতে মাজা ভেঙে গেল আবার ঠাট্টা হচ্ছে। মানুষজন কি সব শুয়োর হয়ে গেল····মাগো····

ব্রি—মাগো ··( সকলের হাসি )

ঠিক এই সময় বাসটা একটা ডবলডেকারকে ওভারটেক করতে গিয়ে দড়াস করে ধাক্কা মারল! ভেতরের লোকজন ভাবের হাঁড়ি উল্টে যাবার মতন এ ওর ঘাড়ের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। সমবেত স্বতঃস্ফূর্ত

আর্তনাদের ভেতর একটা নারীকণ্ঠ শোনা গেল—জানোয়ার। ডবল-ডেকারের ড্রাইভার আর বাসের ড্রাইভারের মধ্যে তারস্বরে খিস্তি বিনিময় চলছে। রগড়পিপাসু ও গোলমাল মেটাবার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দায়িত্ববান পাবলিক বাসটাকে ঘিরে ফেলেছে। একটা ট্রাফিক পুলিশকে এগিয়ে আসতে দেখে ভুবন টুক করে নেমে পড়ল।

যাবার কথা হাওড়া। সেখান থেকে তারকেশ্বর লোকালে হরিপাল। সেখানে এখনো জমির দাম দেড় হাজার টাকা কাঠা বলে ভুবন সেখানেই বাড়ি করেছে। হাওড়া থেকে একঘণ্টা দশ মিনিট। অফিস ছুটির পর ডালহৌসী থেকে টালিগঞ্জ যেতে অনেক বেশি কষ্ট ও সময় লাগে। মিনিবাসে লাইন দিতেই তো দেড় ঘণ্টা। অন্য বাসে তো ওঠাই যায় না।

হাওড়ার বদলে ভুবন অশোকায় ঢুকলো। মেজাজটা সাফ্ করা দরকার।

সবরকম মদ এক পেগ করে খেয়ে যাচ্ছিল ভুবন। এতে তার এক ধরণের নিষ্ঠুর আনন্দ হয়। ছোটবেলায় এত কষ্ট পেয়েছে সে, পেটের ভাত জোগাড় করা থেকে শুরু করে পড়ার বই, স্কুলের মাইনে, পরীক্ষার টাকা, মায়ের জামা-কাপড়—সবই পেতে হয়েছে নিজের বুদ্ধি, পরিশ্রম আর আত্মবিশ্বাসের দামে। খুব ছোট্ট বেলায় মা মারা যেতেই বাবা তাকে কোন্নগরের মামার বাড়ীতে রেখে দিয়ে নিজে আর একটা বিয়ে করে সাউথ কলকাতার দিকে চলে গেল। কয়েকমাস পরেই বাবার টাকা পাঠানো বন্ধ হয়ে গেল আর ভুবন জেনে গেল ত্রিভুবনে আসলে কেউ কারো মামা হয় না, সব ঝামা। নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখার সেই শুরু। এখন ভুবন ইচ্ছে করলে যে কোনো মুহূর্তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে পাল্টে দিতে পারে। পারুক না পারুক, এখন মদের ঝোঁকে অন্তত সেইরকম মনে হল তার।

নেশা হয়ে গেলে হঠাৎ একটা জিনিসে মন আটকে যায়। ভুবনের

মাতাল মনে সঙ্গম জিনিসটা হুড়মুড় করে বৃষ্টির মতন ঢুকে গেল। অনেকক্ষণ বৃষ্টির পর জল জমে যাওয়া ঠনঠনে কালীবাড়ীর রাস্তার মতন মনের অবস্থা হল তারপর। জল নিকাশের অকেজো নর্দমাগুলো পরিষ্কার করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল ভুবন।

মেয়েছেলে জাতটাকে একবারও না ছুঁয়েই মেয়েদের সঙ্গে কতভাবে কত কি করা যায় তাই নিয়ে বই লিখে গেসলেন বাৎসায়ন। অথচ মেয়েদের সঙ্গে সারাজীবন ধরে অনেক কিছু করেও কোটি কোটি লোক কিছুই জানতে পারেনি, মেয়েদের সঙ্গে ঠিক কি কি করা উচিৎ এবং কিভাবে আর কি কি কক্ষনো করা ঠিক নয়।

এই অব্দি ভেবে ভুবন দেখল, জল অনেক কমে গেছে। উৎফুল্ল হয়ে সিগারেট ধরিয়ে ভুবন একটা প্রশ্ন পেল—একটা মেয়ের সঙ্গে তিনশো বার আর তিনশোটা মেয়ের সঙ্গে একবার করে—কোনটা ভালো ?

প্রথমেই মনে হল, দুটোরই সুবিধে অসুবিধে আছে। তবে প্রথমটাতে স্বস্তি বেশি কারণ সেটা বৈধ। মনে ময়লা জমে না। শরীরে ময়লা জমলে সাফ করা সোজা। কিন্তু মন একবার ময়লা হয়ে গেলে সেটা সাফ করা খুব শক্ত। বিবেক নামের একটা ঝ্যাটা দিয়ে কাজটা করা যায় কিন্তু সে ঝ্যাটাটা আজকাল দরকারের সময় কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই জন্যেই প্রথমের চে পরেরটার দিকে এখানকার লোকের ঝোঁক বেশি। আনন্দ জিনিসটা অবৈধ না হলেও তেমন জমে না আজকাল।

ভুবন একা একা হাসল ; জল এখন অনেক কম।

তবে কিনা, পরের ব্যাপারটায় ঝন্‌ঝাট বেশি। একটার জায়গায় লুকিয়ে দুটো চাকরি করতে গেলে ধরা পড়ার পর যেমন দুটো চাকরিই চলে যায় আর কি। সম্পর্কের কাঁচ একবার ভাঙলে জোড়া দেওয়া যে যায় না তা নয় তবে কাটা দাগের ওপর পুলটিসের একটা ছোপ থেকে যায়। নিজের পুরনো বৌকে নতুন করে পেতে গিয়ে ভুবন পুরনো অথবা নতুন

না-পাওয়া কিংবা অল্প—পাওয়া মেয়েদের কথা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভেবে ফেলতো। ব্যাপারটা শোবার ঘরে ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ার মতন ঘিনঘিনে তবু উপায় নেই বলে মেনে নিয়েছে ভুবন।

সব জল কমে গিয়ে এখন রাস্তা পরিষ্কার। মনে মনে ঠনঠনে কালী-বাড়ির সামনের রাস্তাটা পেরিয়ে মন্দিরে ঢুকে জুতো খুলে প্রণাম করতে গিয়ে ভুবন দেখল, পায়ে কাদা। এই অবস্থায় কি প্রণাম করা যায়? মনেও আমার অনেক কাদা মা। ভুবন হাই তুলল।

এতক্ষণে ভুবন খেয়াল করল, কোণের একটা টেবিল থেকে একজন বিদেশনী একা একা মদ খেতে খেতে অনেকক্ষণ ধরে একমনে তাকেই দেখছে। মানে কি? সেও একা এসেছে আর আমিও একা এসেছি তাই? ভুবন নিশ্চিন্ত হল। নিশ্চিন্ত হতে আজকাল তার সময় খুব কম লাগে। লাস্ট ট্রেন দশটা চল্লিশ। এখন বাজে সাড়ে সাতটা। হয়ে যাবে। ভুবন হিসেব করে নিল। আমি তো একলা এসেছি ভালো ভালো কাজগুলো আমার একা করতেই ভালো লাগে বলে। যেমন, পায়খানা, সঙ্গম, টাকা উপার্জন, ভ্রমণ বা খুনটুন। কিন্তু মেয়েটা একা কেন? এই ভর সন্ধেবেলা কোনো সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী বিদেশিনীর তো একা থাকার কথা নয়? ঝগড়াঝাটি করেছে নাকি? করলে ভালোই। একজনের ওপর রাগ যত বেশী হবে আমার ওপর অনুরাগ তত খুলবে। ভুবন হাত নেড়ে মেয়েটাকে ডাকল। ভুবন অবাক হয়ে দেখল, মেয়েটাও তাকে ইশারায় ডাকছে, তার টেবিলে যাবার জন্যে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভুবন বেশ খানিকটা রেগে গেল। ভারী দেমাক তো! আমি ওকে আমার টেবিলে ডাকলুম বলে ও-ও আমাকে ওর টেবিলে ডেকে বসবে—মানে কি? মদ খেলে আবেগে জিনিসটা কিছুতেই নিজের কণ্ট্রোলে থাকতে চায় না। তবু অনেক কষ্টে রাগ সামলে ভুবন উঠল। বেয়ারাকে ডেকে গ্লাস বোতল মেয়েটার টেবিলে দিতে বলল। নিজে মনে মনে ঠিক

করে নিল—কিছুতেই রাগ দেখাবে না, কিন্তু মেয়েটা অপমান করলে উল্টে তাকেও অপমান করতে ভুলবে না। শুধু খেয়াল রাখতে হবে —বারের সব মাতালেরা এখন আমাদের দিকে অ্যাটেনশান।

কাছাকাছি যেতেই মেয়েটা হাত দেখিয়ে, বসতে বলল সুন্দর করে-- প্লিজ।

ভুবন মুগ্ধ হয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক মেয়েটার সঙ্গে বিশুদ্ধ স্মার্ট আড্ডা দিয়ে অনেকখানি বিয়ার খেয়ে যখন উঠল ভুবন, তখন নিজেকে তার খুব ডিগনিফায়েড বলে মনে হল। আর মনে হল, মানুষ যেসব না জেনে ভুল করে—সেসব আসলে নিজেকে অসম্মান করার জন্যে। দূর থেকে মেয়েটাকে কত ফালতু ভাবলাম!

ট্রেনে যখন ভুবনের ঘুম ভাঙল বা হুঁশ ফিরে এল তখন ট্রেন চুপচাপ শেষ স্টেশনে দাঁড়িয়ে। কামরায় কোনো লোক নেই। রাত প্রায় বারোটা। হরিপাল ফেলে তারকেশ্বরে এসে বসে আছে ভুবন।

তার মানে পাশে গিয়ে লরি ধরতে হবে। চল্লিশটা লরি নিতে চাইবে না। একচল্লিশ নম্বর লরিটা তুলে নিলেও বাড়ি যেতে রাত ফুরিয়ে যেতে পারে। নেশাটা হাল্কা হয়ে যেতে বেশ চাঙ্গা লাগছিল বলে ভুবন ভাবল—যাক্ গে! রাত বিরেতে ঘরের চে বাইরের দুনিয়াটাই ভালো লাগে বেশি।

স্টেশনে কাতারে কাতারে লোক ঘুমোচ্ছে। সব জলযাত্রী। ভোলেবাবা। কাঁধে বাঁক নিয়ে পুণ্যি করতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। এখন রাত বাড়তেই স্টেশনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। এত পথ হেঁটে পেরিয়ে আসা, যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়া, এত শারীরিক কষ্ট এরা সহ্য করে কিসের উন্মাদনায়? ধর্ম? পুণ্যির লোভ এত মারাত্মক! এত পাপ করলি কবে বাওয়া! ভুবন অবাক হল, কষ্ট পেল, একবার ভাবল

তার খানিকটা কাঁদা উচিত ; তারপর নিজেকেই বোকা মনে হল খুব।

স্টেশনে পা ফেলার জায়গা নেই। ঘুমকাতর পুণ্যকাতর মানুষ মানুষীর নিদ্রিত ভিড়ে এঁকে বেঁকে অনেক কায়দা করে পা ফেলতে হবে। বেশ, তাই সই। পরিস্থিতি ভুবনকে কখনো কায়দা করতে পারে না। সব অবস্থাতেই সে অলটাইম ফিট।

এই ভোলেবাবাদের ভুবন ব্যাখ্যা জানে না। কি লাভ হয় এক জায়গার জল আর এক জায়গায় এনে ঢেলে 'ভোলে বাবা, পার করেগা' বলতে বলতে প্ল্যাটফর্মে ঘুমিয়ে পড়া? শ্রাবণ বৈশাখে কবেকার এই পাথরটার গায়ে জল ঢেলে দিলেই মিটে যাবে জীবনের সব লেন দেন! কে বলেছে! আপাতত ঘুমন্ত ভোলেবাবাদের ডিঙিয়ে লাফিয়ে পাশ কাটিয়ে স্টেশনচত্বর পেরিয়ে আসতে ভুবনের অনেকক্ষণ সময় লাগল।

লাইনধরে লেবেল ক্রশিং ওব্দি যেতে হবে। ওপাশে অন্ধকার। ডানদিকের রাস্তায় মিনিট দশেক হাঁটলে ল্যাম্প্। সেখানে লরি দাঁড়ায়। এই মাঝরাতে কোনও লরি তুলতে চাইবে না এখন। তার চেয়ে এইসব বোকা জলযাত্রীদের পাশে জীবনের সব পাপের কথা ভাবতে ভাবতে—কৃতকর্মের জন্যে অনুশোচনা ছাড়া কী আর ভবিষ্যৎ আছে মানুষের—কী আর ভবিষ্যতে থাকতে পারে—কোথা থেকে এসেছি কোথায় যাবো ভুলে গিয়ে - শুধু জল ঢাললেই তো হল—এইটুকু মনে রেখে শুয়ে পড়লেই তো হত? কী যেত আসতো টাকা রোজগার আর খরচ করার খেলায় মান অভিমানের জারক মেশানো এই অর্থহীন দিন কাটানোর দোটানার ভেতর নিজেকে বুকজলে জেলের জালটানার মতন টেনে না রাখলে।

লরি আসছে। মাঝরাতে রাস্তায় ঘুরলে বিপজ্জনক দার্শনিক দুশ্চিন্তা আসে। লরিটাকে থামাতে না বলে সামনে বুক পেতে শুয়ে পড়লেই বা ক্ষতি কি? না। ভুবন স্বেচ্ছায় মরে যাওয়া পছন্দ করে না। স্বেচ্ছায় তো আসিনি ভাই! স্বেচ্ছায় যাবো কেন?

পেট্রোল পাম্প সারারাত জেগে থাকে। লরি থামলেই ড্রাইভারদের জল দেবার জন্যে খোলা থাকে চটি। বাইরে রুটি তড়কা, আড়ালে মদ বিক্রির জন্যে খোলা থাকে খাবারের দোকান। এক গেলাস পাঞ্জাবি চা খেলে রাত জাগার লোভ বাড়ে।

একটা থেমে থাকা লরির ড্রাইভারের সঙ্গে আবার একটু খেলো ভুবন। গাড়ি ছাড়ার সময় অনেক ভালো ভালো কথা বলে ভুবনকে না নিয়েই চলে গেল। আপ গাড়ি চালানেয়ালা হোতা তো সমঝ্‌যাতা—তকলিফ্‌ কেয়া হ্যায়! ভুবন ফেক্‌লুর মতন শুনলো এরপর তো অন্য গাড়িগুলো তাকে মাতাল বলেই তুলবে না। এই সর্দারজী তাকে নেবে না জানলে ওর সঙ্গে ভুবন মদ খেতোই না। সব ভেস্তে গেল।

হেরে গেলে ভুবনের জেদ বাড়ে। এমনিতেই ডকের ছেলেটা পেমেণ্ট নিয়ে ঘোরাচ্ছে। টানা মালের কারবারে জোরজবরদস্তি তেমন চলে না। বাসে ধাক্কাধাক্কির পর অশোকায় ঢুকে অনেক কষ্টে মেজাজ সামলেছে সে। এখন লরিগুলো একের পর এক কলা দেখিয়ে চলে যাচ্ছে। মাতালের রাগ দানা বাঁধতে না পারলে বেশিক্ষণ থাকে না। ভুবন হেসে ফেলল।

চায়ের দোকানের সামনে তক্তপোষে দোকানের লোকেরাও একে একে ঘুমিয়ে পড়ল। রাত প্রায় দুটো। বৌ জেগে বসে নেই বা দুশ্চিন্তা করবে না ভুবন জানে। তাকে অকারণ ভাবনা-চিন্তা না করার ট্রেনিং ভুবনই দিয়েছে। আমি দশটা পাঁচটা হেড আপিসের বড়বাবু কিংবা মেজবাবু নই—বুঝলে—যে রোজ সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে বৌয়ের আঁচলে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়বো—কখন কোথায় কাজে অকাজে ফেঁসে যাবো—রাত দশটা বাজলে সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়বে—রাত জাগলে শরীর কালি হয়—বৌ মানুষের শরীর কালিমুখ গোমড়া একদম সহ্য হয় না আমার;—ভুবন আরো বলে রেখেছে—সুটিয়ে যাওয়া আর খেঁকুড়ে হয়ে যাওয়া—বাঙালী মেয়েদের ভবিষ্যৎ দুরকম! সুটিয়ে গেলে তবু সহ্য হয়—খেঁকুড়ে হয়ে

যাওয়া একদম চলবে না।

পকেট হাতড়ে ভুবন দেখল আর একটাই মাত্র সিগারেট আছে। রাত ফুরোতে আর ঘণ্টাতিনেক বাকি। সিনেমাহলের কোনো লেট নাইট শো হয় না! কাছাকাছি বিহারীদের কোনো রামধনু সম্মেলনও তো দেখা যাচ্ছে না। একটার পর একটা লরি আসছে আর চলে যাচ্ছে। পকেটের শেষ সিগারেটটা ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াবার মতন যত্নে ধরালো ভুবন। অনেক খানি ধোঁয়া ছেড়ে ভাবল—নেশাটা ভোগে চলে গেছে কখন। এখন আমি এই মাঝরাত্তিরে একা এই ফাঁকা পেট্রোল-পাম্পে দাঁড়িয়ে কি করব? কেউ আমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে নেই—ভেবে খানিকটা আকুল হবার চেষ্টা করল ভুবন। পোষালো না। কে কার জন্যে অপেক্ষা করে শালা! আজ ফুটে গেলে কাল ভুবন সরকারকে শহীদ বানিয়ে কে মালা দিল তাতে আমার কি! যতদিন বেঁচে আছ রোয়াবের সঙ্গে বাঁচবো। কে কত ভদ্দরলোক বৌকে নিয়ে রাস্তায় বেরোলেই বোঝা যায়।

একটা বুড়োকে খুক খুক করে কাশতে কাশতে উঠে বসতে দেখে ভুবন তার কাছে গিয়ে বলল—বহুৎ কাশ হুয়া আপকা। নিঘুর্ম বুড়ো শ্রোতা পেয়ে নিজের জমানো কথা কাশতে কাশতে বলে যেতে লাগল। বুড়ো বকবে ভুবন জানতো। ভুবন কিছু শুনবে না ঠিক করে রেখেছিল। শুধু একা থাকা মুস্কিল বলেই মানুষ যে কথা বলতে শিখেছে কিনা···· হঠাৎ খেয়াল করল বুড়ো —ছেলের তিনটে লরি, ছেলে দেখাশোনা করে না, শুধু টাকা উড়িয়ে বেড়ায়—বুড়োকেই রাত জেগে জেগে গাড়ির পেছনে খিদমৎ দিতে হয়—ভুবন উৎসাহে জিগ্যেস করল—এখন তোমার ছেলের লরি আসবে না চাচা? ছুঁচোলো দাড়ি দেখে বুড়োকে মুসলমান ভেবে নিয়েছিল ভুবন। একটা লরি এসে পাম্পে দাঁড়াতে বুড়ো আওয়াজ শুনেই বলে দিল—ওই তো বত্তিশ চৌত্তিশ এল—তারপর হঠাৎ যেন

ভুবনকে প্রথম নজর করল বুড়ো—তুমি যাবে কোথায় ?

এতক্ষণে ভুবন সোজা হয়ে বসল। বুড়োর কাশির শব্দ শুনে ভুবন এরকমই কিছু একটা হবার আশা করেছিল। অন্ধকার তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভুবন শেয়ালের মতন হাসল। নিঃশব্দে।

মাঝরাতের ধানক্ষেত দুপাশে ফেলে হেডলাইটের আলোয় সামনের স্বপ্নে দেখা রাস্তার দিকে দেখতে দেখতে ভুবন শুনলো-ড্রাইভার আর খালাসি এখন হরিয়ানা যাবে। সে যেতে পারবে না বলে দুঃখ পেল।

শরীরটা কিছুতেই ক্লান্ত হতে চায় না। এত কাণ্ডের পরও মন এখন হরিয়ানা যেতে চায়। মানুষের এই মন ভারি আজব ভুল ভুলাইয়া। কখন যে কোন পথে যেতে চায়! হাজার ঘুরে বেরোবার রাস্তা হাতের কাছে পেয়েও ভুল রাস্তায় পা বাড়ায়। ভাবটা যেন—আমার এই ঘুরে মরাই ভালো।

হেডলাইটের আলোয় বাইরের ভুবনও পুরো ভুলভুলাইয়া। যে পথেই যাও ঘুরে মরা ছাড়া উপায় নেই। বাইরের বেরোবার রাস্তা কেউ জানে না।

শুধু বুদ্ধিমানদের জন্যে দুঃখ হয় ভুবনের। বেশী বুদ্ধির জন্যে জ্বলে পুড়ে মরা ছাড়া তাদের কোনো গতি নেই! এই জগাখিচুড়ি পৃথিবী নামের ভুলভুলাইয়াতে বোকা হয়ে যতদিন ঘুরে বেড়ানো যায় ততদিনই ভালো। বুদ্ধি বাড়লেই বিপদ। মাথায় মশা উড়বে তিন শো।

গাড়ির আলোয় ভুবন দেখল এই শেষ রাতেও দলে দলে জলযাত্রী কাঁধে বাঁক নিয়ে ছন্দিত চিৎকারে ঝনঝনাৎ শব্দ করে তালে তালে বাবার মাথায় জল ঢালতে যাচ্ছে। কে বাবা? মাথায় অনবরত জল ঢাললে বাবার শীত করে না? মাথায় জল ঢাললে সে আমাদের শান্ত এবং সুখী রাখবে এই প্রথা প্রথম মাথায় এল কার?

লরি থেকে নেমে লরিটাকে অনেক সুক্রিয়া জানিয়ে ছেড়ে দিয়ে ফাঁকা

প্রায় ভোর রাতের গোপীনগরের মোড়ে দাঁড়িয়ে ভুবন বেশ বুক ভরে দম নিল। বাড়ির কাছাকাছি এইসব মানুষের তৈরী রাস্তায় প্রাকৃতিক গাছপালার ভেতর চেনা চায়ের দোকানের আশেপাশে পা রাখলেই মনের ভেতর একটা স্বর গুনগুন করে ওঠে। সব ঠিক আছে।

এক স্বাস্থ্যবতী দেহাতী যুবতী একা বাঁক নিয়ে ভুবনের পাশ দিয়ে নির্বিকার চলে গেল। আহা দল থেকে পিছিয়ে পড়েছে। মেয়েটিকে পেছন থেকে ভালো করে দেখে ভুবন বুঝলো—পুণ্য-ফুণ্য সব বাজে কথা। মানুষ তো কোথাও না কোথাও যাবে। সব যাওয়াই বড় উদ্দেশ্যমূলক। এই জলযাত্রা তবু অনেকটা বন্ধনমুক্তির সামাজিক অনুশাসন জাতীয় এক ধরণের নিরুদ্দেশ যাত্রা। কেনা বেচা অনেক হল, চলো যাই, জল ঢেলে আসি।

ভুবনের মনে হল, ছেলে বৌ সবাইকে নিয়ে একবার হেঁটে হেঁটে জল ঢেলে এলে, মন্দ কি!

বাড়ির কড়া নাড়তে বৌ এসে দরজা খুলে দিয়ে বলল—ও, তুমি। আমি ভাবছিলাম, ঝি এল বুঝি।

# অনুতোষের ঘর বাড়ি

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে অনুতোষের নিজেকে রাজার মতন লাগলো। একসঙ্গে এত টাকা সে নিজের খরচের জন্যে আগে কখনো পায়নি। টাকাটা অবশ্য কোনভাবেই খুব বেশী নয় তবু প্রায় সাড়ে পাঁচশো টাকা থাকলে পৃথিবী এত সুন্দর হয়ে ওঠে অনুতোষ জানতো না। স্কুলে পড়ার সময় সে হাতে পেত দৈনিক চার আনা। যে লোকটা ছুটির ঘণ্টা বাজাতো সেই মিশিরজীর কাছ থেকে টিফিনে দু-আনার চানাচুর খেতে খেতে দুনিয়া ঝলমল করে উঠতো খুশিতে সেই বয়সটা বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। কলেজে উঠে অনুতোষ দৈনিক হাত খরচ পেত এক টাকা। নতুন সিগারেট খাওয়া ধরেছে বলে বাসভাড়া বাদ দিয়ে সারাদিন যথেষ্ট সিগারেট খাওয়ার মতন কিছুই থাকতো না। কলেজ ছাড়ার পর অনেকদিন বেকার ছিল অনুতোষ। সন্ধ্যেবেলা মোড়ের চায়ের দোকানে পাড়ার ছেলেদের জমাটি আড্ডা ছেড়ে খুব অনিচ্ছায় করুণ মুখ করে টিউশনিতে যেতে হত। এখন অফিস থেকে হাঁটতে হাঁটতে পকেটে হাত দিয়ে টাকাটা স্পর্শ করলো অনুতোষ। বার করে একবার ঝকঝকে নোটগুলো গুনে দেখবে নাকি? নাঃ। রাস্তায় অনেক লোক!

সারা ডালহৌসিতে অফিস ছুটির ভিড় ও ব্যস্ততা। ব্যাগ হাতে কেরাণীরা ব্যস্ত হয়ে বাড়ি ফিরছে। ছুটির পর কোনদিন অনুতোষ সোজা বাড়ি চলে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। সাত ঘণ্টা একটি চেয়ারে বাধ্যতামূলক বসে থাকার পর সন্ধ্যেবেলা বন্ধুদের সঙ্গে ঘণ্টাতিনেক প্রাণ-খুলে আড্ডা দিতে না পারলে সে মরে যাবে। তার সামনের সিটে মোটা-

মতন এক শান্তধরনের ভদ্রমহিলা বসেন, রেখাদি। একদিন জিগোস করে-ছিলেন, বাড়িতে কোন বৌদি আছে? নেই শুনে বলেছিলেন, এখন বুঝবেন না। বাড়বে, সময় হলে ঘরের টান অনেক বাড়বে। তখন ছুটির পর বাড়ির দিকে টান ছাড়া অন্য কোথাও যেতে ভালো লাগবে না। অন্নতোষ অল্প হেসেছিল।

সত্যি সত্যি এখন বাড়ি ফিরে গেলে কেমন হয়? অন্নতোষ একবার ভাবলো। সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে। পাড়ার বাচ্ছাদের সঙ্গে খেলা ছেড়ে ছুটে আসবে ডুডু! চেঁচিয়ে বলবে, মা, ওমা, গ্যাখো মেজদাদা এসে গেছে। তার ওপরের বোন মিনু এক্কা-দোক্কা খেলতে খেলতে কাছে এসে বলবে, দশটা পয়সা দেবে? জয়নগরের মোয়া খাবো। অন্নতোষ চা খেতে ভালবাসে বলে চায়ের জল চাপাতে চাপাতে রান্নাঘর থেকে মা বলবে, কিরে, বন্ধুরা তাড়িয়ে দিল নাকি? হাবলু আর লালু বাড়ি থাকবে না। দাদা তো থাকবেই না। আর বুবু নিশ্চয়ই ছাতে দাঁড়িয়ে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। বাবা চিৎ হয়ে সিলিংয়ের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকবে।

বাঁদিকে ইউনাটেড ব্যাংকের ষোলতলা বাড়ি। রাজভবনের পাশ দিয়ে হেঁটে এসে মোড়ের মাথায় রোজ বিকেলবেলা অন্নতোষ দেখে, একটি অন্ধ ভিখারিণী হাত বাড়িয়ে আছে। চোখের অংশটা একদম সাদা। বাবু আপনাদের চোখ ভালো থাকবে বাবু। দয়া করে দু-এক পয়সা দিয়ে যান। রোজ অন্নতোষের মন খারাপ হয়ে যায় ভীষণ। অন্নতোষের নিজের চোখ দুটো আসলে টানা টানা, খুব সুন্দর। এই জায়গাটা পেরোবার সময় অন্নতোষ রোজ কেমন অসহায় হয়ে যায়।

লালদিঘীর পাশের মিনিবাস ষ্টাণ্ডের দিকে যেতে যেতে মনে হল, টাকাটা যদি কোন কারণে পকেটমার হয়ে যায়! আবার এক মুহূর্তে বেকার হয়ে যাবে অন্নতোষ। আশ্চর্য, একমাস আগেও অন্নতোষ ভাবতে পারতো না পকেটে এত টাকা নিয়ে সে একদিন রাস্তায় হাঁটবে। এখন সে

তার যে কোন ইচ্ছা মিটিয়ে নিতে পারে। মিটিয়ে নেবার মতন কি কি ইচ্ছে আছে তার ? প্রথমেই পেট ভরে নানারকম খাবার খেয়ে নেওয়ার কথা মনে হল। আসলে এখন বেশ খিদে পেয়েছে। পয়সা কম ছিল বলে ভালো করে টিফিন করা হয়নি। চার আনার মশলামুড়ি আর বেশ কয়েকবার চা খেয়ে চালিয়ে দিয়েছে। মিনি বাস ষ্ট্যাণ্ডে বেশ ভিড়। ডানলপের মিনির আগে লম্বা লাইন। দেরী হবে একটু। ততক্ষনে কিছু খেয়ে আসবে নাকি ? না। প্রথম মাসের পুরো মাইনেটা অনুতোষ মায়ের হাতে তুলে দেবে।

লাইনে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে অনুতোষের মনে হল, আর সামনে পেছনে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের প্রত্যেকের জামাকাপড় তার চেয়ে ভালো। নিজেকে ফিস ফিস করে বলল অনুতোষ একটা সপ্তাহ অপেক্ষা করো। তোমাকে আমি দারুণ একসেট জামা প্যাণ্ট করিয়ে দিচ্ছি।

তারপরই ভীষণ স্বার্থপর মনে হল নিজেকে। মায়ের দিকে তাকানো যায় না। একটাও ভালো কাপড় নেই মায়ের। ভাইবোনদেরও একই অবস্থা। দাদা একা সবদিক সামলাতে পারে না। নিজের জন্যে দাদা যে কতদিন জামাপ্যাণ্ট করায় না। বাড়ী ভাড়া আর খাবার খরচ চালাতেই সব টাকা ফুরিয়ে যায়। কাকে কি দেবে ভাবতে গিয়ে অনুতোষ দেখল সব গুলিয়ে যাচ্ছে। অত হিসাব কোনদিন তার সহ্য হয় না। সাত ছেলে-মেয়ের সংসার নিয়ে মা যে কি করে চালায়। ওইসব জটিল অঙ্ক মায়েরাই জানে। অনুতোষ মায়ের হাতে টাকাটা দিয়ে বলবে যাকে যা দেবার দিও। শুধু সে বুবুর একটা ছবি আঁকার জন্যে খাতা আর এক বাক্স প্যাস্টেল কিনে দেবে। বুবু বেশ মজার মজার ছবি আঁকে। পড়াশোনার ক্ষতি হবে বলে মা ওকে কিছুতেই ওইসব কিনতে দেবে না।

কতদিন মিনিবাস চাপে না অনুতোষ। অনেকদিন আগে নাইটশোয়ে সিনেমা দেখে মিনিবাসে করে বাড়ী ফিরেছিল। তাও বাস পাবার কোনো

আশা ছিল না বলে। সারাটা রাস্তা কেবল মনে হচ্ছিল, পুরো এক টাকা পঞ্চান্ন পয়সা জলে গেল। এই সামান্য টাকাটা তখন কত অসামান্য ছিল। এখন জানালার ধারে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বৌবাজারের মোড় পেরিয়ে যেতে যেতে অনুতোষ দেখল, বিরাট সিনেমার পোষ্টারে অমিতাভ বচ্চন রিভলবার হাতে হাঁটু ভেঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। ধোঁয়া ছেড়ে হেলান দিয়ে বসল অনুতোষ। কলকাতা আমার বলে মনে হচ্ছে!

ডানলপের কাছে 'অনন্যা' সিনেমা। সেখানে নেমে অনেকখানি হাঁটতে হয় ডানদিকে। প্রায় মিনিট পনেরো লাগে। রিক্সা নেবে কিনা একবার ভাবলো অনুতোষ। রিকসা চাপতে তার একটু আনস্মার্ট লাগে। বারোবছর ধরে হেঁটে যাতায়াত করাটাই অভ্যাস হয়ে গেছে। বারোবছর আগে কলকাতায় বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীটা বিক্রী হয়ে যাবার পর ডানলপের কাছে এই বাসাটা নিয়েছিল বাবা। অনুতোষ তখন অনেক ছোট। হাতিবাগানে তখন বিরাট একটা কাপড়ের দোকান ছিল বাবার। এখন কিছু নেই। অনুতোষ তখন খুব ছোট ছিল। প্রত্যেক বছর পুজোর আগে দোকানে গিয়ে আঙুল দেখিয়ে অনুতোষ শুধু বলতো, ওই জামাটা নেবো। হাতিবাগান দিয়ে হাঁটলে বুকের ভেতরটা এখনো মুচড়ে হায়। তাদের দোকানটা ভেঙে এখন দুটো শাড়ির দোকান হয়েছে। বাবার দোকানে যারা কর্মচারী ছিল তারা প্রত্যেকে বাড়ি করে ফেলেছে। তাদের জন্যেই দোকানটা রাখতে পারলেন না বাবা। ব্যবসা চালানোর ক্ষেত্রে একটু বেশি রকম ভালোমানুষ ছিলেন তিনি।

মিনি বাসটা যখন বিডন ষ্ট্রীট পেরিয়ে যাচ্ছিল তখন অনুতোষ কয়েক-মিনিটের জন্য ছেলেবেলা থেকে ঘুরে এল। বিডন স্ট্রীট আর সেণ্ট্রাল এভিনিউএর মোড়ে একটা তেলেভাজার দোকান ছিল, এখনো আছে। সেখানে রোজ বিকেলে মুড়ি তেলেভাজা খেতে আসতো অনুতোষ। সন্ধ্যে হলে হিরন লইব্রেরীতে মায়ের জন্যে বই আনতে যেতো। বিডন স্ট্রীট

পেরোলেই বাঁদিকে শ্রীবিদ্যানিকেতন। অনুতোষের ছোটবেলার স্কুল। ছোটবেলার ক্লাসের বন্ধুদের সঙ্গে কতদিন যে তার দেখা হয় না। যাদের একদিন না দেখলে প্রাণ হাঁফিয়ে উঠতো, তাদের কথা এখন আর মনেই পড়ে না। বাড়িটা বিক্রী হয়ে যাবার পর মাত্র বারো বছরে সবাই কোথায় ছিটকে গেছে। বয়স বাড়লে মানুষ যে কত পাল্টে যায়।

এইসব ভাবতে ভাবতে অনুতোষ বাড়ি যাচ্ছিল। এই রাস্তাটা তার বরাবর ভালো লাগে। দুদিকে এখন নতুন নতুন বাড়ী হয়েছে। আগে আরো অনেক ফাঁকা ছিল। একটা জায়গায় দু-পাশে সারি সারি নারকেল গাছ। ফিরতে রাত হয়ে গেলে এই জায়গাটা পেরিয়ে যাবার সময় অনুতোষের সব অভাব মিটে যেত। অন্ধকারে অথবা জ্যোৎস্নায় নারকেল গাছের পাতাগুলো রাতের বাতাসে প্রায় কথা বলে উঠতো। যা পাওনি তার জন্যে হা-হুতাশ কোরো না। যা পেয়েছো তাও খুব কম নয়।

আজ মাইনে পেয়েছে বলেই বোধহয় একদিনের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল অনুতোষের। দুপুরবেলা ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনে বসে খুব আড্ডা দিচ্ছিল সে। একজন বন্ধু হঠাৎ রহস্যময় ভাবে হাসতে হাসতে তাকে বলল, তোকে একটা দারুণ খবর দিতে পারি। কি খাওয়াবি বল। অনুতোষ বলল, আগে শুনি। যদি তেমন কিছু হয় পকেটে যা আছে সব দিয়ে খাওয়াবো। সে বলল, তুই একটা চাকরি পাচ্ছিস। সরকারি অফিসে। অনুতোষ লাফিয়ে উঠেছিল। তাই নাকি, তুই কি করে জানলি? পরে জানা গেল, সংবাদবাহকের এক বন্ধু ওই অফিসেই কাজ করে। সে বলেছে। অনুতোষ দু-একদিনের মধ্যেই চিঠি পেয়ে যাবে। সেদিন বাড়ি ফেরার সময় এই রাস্তায় এই জায়গাটায় দাদার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। খবরটা দাদাকে জানাতে দাদার চোখদুটো খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। শান্ত, গভীর, দায়িত্ববান মানুষ তার দাদা। শুধু বলেছিল, সত্যি সেটা প্রশ্ন বা অবিশ্বাস্য নয়। বিস্ময়বোধ ও তৃপ্তির গভীর আনন্দে। স্কুল

ছাড়ার পর থেকেই অন্নতোষ চাকরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এতদিনে সে দাদাকে একটু রিলিফ দিতে পারবে। দোকান আর বাড়ি বিক্রীর পরে বাবা এখন একজন ফুরিয়ে যাওয়া মানুষ। গীতা আর বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র ছাড়া বাবার এখন আর কোনো ব্যাপারে আগ্রহ নেই। ইলেকশানের আগে ফুটপাতের এক জ্যোতিষীকে চার আনা পয়সা দিয়ে একবার শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন কে জিতবে বলুন তো? সেবারই ইন্দিরা গান্ধী হেরে গেল।

'আপনার ফ্ল্যাটটা খুব সুন্দর'। বুকসেলফের পাশে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে অন্নতোষ বলল। চৈতী মিষ্টি করে হাসল, 'ওঃ, জানেন না, এটা পাবার সময় কি যে কষ্ট হয়েছিল। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। আমি তখন এম-এ পড়ছি। সে-সব তো হল না। চাকরিতে ঢুকলাম। কিন্তু বাবার নামে নেওয়া আগের ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিতে হল। তারপর তিনমাস বোন আর মাকে নিয়ে, ওঃ, সে যে কি দিন গেছে না!' চৈতী বিছানার ধারে আলগা করে বসে কথা বলছিল। বুকসেল্‌ফের নীচে টেবিল। চৈতীর বোনের বইখাতা সেখানে ছড়ানো। চেয়ারে বসতে অন্নতোষ বলল, 'মাত্র তিন মাসের মধ্যেই এরকম একটা ফ্ল্যাট পেয়ে গেলেন?' চৈতী একটু উদাসীন স্বরে বলল, 'আসলে, আমাদের ব্যাপারটা তো...। এমনিতে বোধহয় আরো দেরী হয়।' অন্নতোষ বলল, 'হঁ্যা, আমি তো গতবছর পেলামই না। সিনিয়ার কত লোক আছে অফিসে। তাদেরকে দিতে দিতেই ফুরিয়ে গেল। এবছর নিশ্চয়ই পেয়ে যাবো।' ঘরের দেয়ালে একটা গ্রুপ ছবি। বোধহয় চৈতীর বাবা মা, বোন আর চৈতী নিজে। দার্জিলিঙের ম্যালে দাঁড়িয়ে পাহাড় দেখছে চৈতী তখন কত ছোট ছিল। অন্নতোষ তখন দার্জিলিঙে বেড়াতে গেল চৈতীর সঙ্গে কি তার আলাপ হত? চৈতী বলল, 'এখন যেখানে থাকেন সেখানে কি খুব অসুবিধা হয়? চৈতী যেখানে বসে আছে, সেখান থেকে ড্রেসিং টেবিলের লম্বা আয়নায়

নিজেকে দেখা যায়। সেদিকে চৈতী একটু বিষণ্ণ চোখে চেয়ে আছে। অনুতোষ বলল, 'ভীষণ। সারা গ্রীষ্মকাল একদম জল থাকে না। আমাদের তো মেম্বার বেশি। ন-জন লোকের স্নান, জামাকাপড় কাচা, বড্ড অসুবিধে হয়। একটা পুকুর আছে। বেশ দূরে। সেখানেই যেতে হয়। আসলে, 'অনুতোষ একটু থেমে বলল, পাড়াটাও ভীষণ খারাপ। ছেলেগুলো সারাদিন গোপাল ভাঁড় আর হিন্দি সিনেমার গল্প করে।' চৈতী খিলখিল করে হেসে উঠল। তার হাসিতে পাখি উড়ে যাবার শব্দ ছিল। অনুতোষ উৎসাহের সুরে বলল, তার ওপর বাড়িওয়ালার ছেলে আবার পাগল। সারাদিন গান করে আর লেকচার দেয়।' চৈতী চোখ বড় বড় করে বলল, 'লেকচার দেয়! কিরকম?' অনুতোষ বলল, 'সে ভারি অদ্ভুদ ব্যাপার। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনলুম, বলছে স্যার—আপনি আমাকে যা যা শিখিয়েছিলেন সব ভুল। ছেলেবেলায় আপনার কাছে আমি যা শিখেছি, সেভাবেই বেঁচে থাকতে চেয়েছিলুম কিন্তু আমার চারপাশের মানুষেরা কিছুতেই সেরকম থাকতে দিচ্ছে না!' চৈতী আবার হেসে উঠল। অনুতোষ একটা সিগারেট ধারালো। চৈতী উঠে গিয়ে আলমারি খুলে একটা সুন্দর অ্যাশট্রে বার করল। অ্যাটলাসের ঘাড়ের ওপর পৃথিবী। ছাই ফেলার জন্য উত্তর মেরুটা গোল করে কাটা। টেবিলে রাখতে রাখতে চৈতী বলল, 'এটা ব্যবহার করতেন বাবা।' অনিবার্যভাবে চৈতীর চোখের দিকে তাকালো অনুতোষ।

এক প্লেট সন্দেশ আর এক প্লেট চানাচুর, দু-হাতে দুটো প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকলো স্মৃতি। 'কোন ক্লাসে পড়ো?' স্মৃতি তুলনায় চৈতীর থেকে অনেক বেশী সুন্দরী। কৈশোর আর যৌবনের ঠিক মাঝখানে এসে সে দুচোখে পৃথিবীর বিস্ময় ও সৌন্দর্য নিয়ে নিজের চারপাশে অমল আবহাওয়া ছড়িয়ে দিচ্ছে। অনুতোষের প্রশ্নে প্লেটগুলো টেবিলের উপর রাখতে রাখতে বলল, 'বারো ক্লাশ' অনুতোষ বলল যাঃ তেরো ক্লাশ!' দু-বোন একসঙ্গে

হেসে উঠল। অনুতোষ দেখল, চৈতীর এই হাসি অনেক মাপা। অফিসের গন্ধ বহে আনে। স্মৃতি ভোরবেলার টগর ফুলের মতন নির্মল। চাকরি করলে মানুষকে এরকম হাসি সবসময় ঠোঁটে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। রাখতে রাখতে অভ্যাস হয়ে যায়। অফিসের বাইরেও সেই ঝুলন্ত হাসিটা ঠোটে লেগে থাকে। অথচ একটু আগে চৈতী অনেক অন্যরকম ছিল। বোনের সামনে দিদিরা কেন পাল্টে যায়? স্মৃতির বয়সে চৈতী ঠিক কিরকম ছিল। 'কোন কলেজ', বলে অনুতোষ আর একটা সিগারেট ধরালো। দিদির দিকে তাকিয়ে নিয়ে স্মৃতি বলল, 'কলেজ নয়। স্কুল। স্কটিশে পড়ার খুব ইচ্ছে ছিল। দিদি পড়তে দিল না।'

অনুতোষের বড় বোন মিনু ক্লাস ফাইভে পড়ে। সারাদিন 'গুরুদেব দয়া কর দীনজনে' গাইছে কয়েকদিন ধরে। তার কথা মনে পড়ে যেতে কোনরকম ভূমিকা না করে অনুতোষ সরাসরি আদেশ করে বসল— স্মৃতি, তুমি এখন আমাদের একটা গান শোনাও। আবার দিদির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বড় বড় চোখে সে বলে ওঠে, 'ওমা আপনি কি করে জানলেন!' চৈতী বলে উঠল, 'আমি কিন্তু বলিনি কিছু'। অনুতোষ মজা পেয়ে গেল। বলল, 'আমি হাত গুনতে পারি' স্মৃতি কলকল করে উঠল, 'বলুনতো দিদি কি খেতে ভালবাসে?' পার্ট ভুলে যাওয়া অভিনেতার মত অনুতোষ চৈতীর দিকে তাকালো। চৈতী আদুরে গলায় ধমক দিল বোনকে। —'ইয়াকি হচ্ছে?' অনুতোষ বলল, 'দিদি তোমায় খুব বকুনি দেয়, না স্মৃতি?'

'সবসময়' বলে দ্রুত স্মৃতি পালিয়ে গেল।

এ্যাটলাসের ঘাড়ের ওপর পৃথিবীতে অনেকটা ছাই ঝেড়ে অনুতোষ বলল, 'আপনিও গান গাইতে পারেন আমি জানি।' চৈতী কোনো উত্তর দিল না। অনুতোষ দেখল তার চোখে নরম দুঃখ। পিতার মৃত্যুর

জন্যে ও চাকরি করার জন্যে হয়তো তাকে অনেক কিছু ছাড়তে হয়েছে। চৈতী হঠাৎ বলল, আপনাদের ওখানে চুরি হয় ? এখানেও কিন্তু ভীষন চুরি হয়। ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে কোথাও গেলেই হল। ঠিক চুরি হবে।'

—এত চুরি হয় ?

—সেই জন্যেই তো মা কোথাও যেতে পারে না।

—পুলিশ কিছু করতে পারে না ?

—চোরেরা বোধহয় পুলিশের চেয়ে চালাক হয়।

—সাবধানে থাকবেন ; কোনদিন আপনাকে কেউ চুরি করে নিয়ে যাবে।

—আর চান্স নেই। আমি অনেকদিন আগেই····

—কি ?

—আপনি কিন্তু কিচ্ছু খাচ্ছেন না।

—খাচ্ছি। তারপর কি হল ?

—হওয়ার তো কিছু নেই।

—সেই চোর ভদ্রলোক এখন কোথায় ?

—বিয়ে করে ঘর সংসার করছেন। আমারই বন্ধুর সঙ্গে। আমিই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম।

—নিজের ঘরবাড়ি নিজের হাতে ভেঙে দিলেন ?

—আমি কিছুই ভাঙিনি। স্বতপাকে দেখতে অনেক ভালো।

—রূপের মোহ আর ভালোবাসা কিন্তু এক জিনিস নয়।

—ভালোবাসা ? আমার বয়স এখন সাতাশ।

অন্ততোষের নিজেকে গ্যারেজ গামী খারাপ বাসের কণ্ডাকটার মনে হল। ইচ্ছে থাকলেও সে কোনো প্যাসেঞ্জার তুলে নিতে পারবে না। তবু বলল, জোর করলেন না কেন ?

জানালার কাছে উঠে গিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চৈতী

ব্যানার্জী প্রায় ঘোষনার মত বলল, 'সত্যি করে ভালবাসলে কিছু চাওয়া যায় না অনুতোষ। সে তো ভালো আছে। ত্যাটস্ মোর ত্যান এনাফ্।'

একটু চুপ করে থেকে চৈতী বলল, 'তাছাড়া…………

—কি ?

—বাবার সঙ্গে দেখা হলে বলতাম, সংসার আর স্মৃতির ভার আমার ওপর চাপিয়ে তুমি পালিয়ে গেলে কেন ? আমার কি কোন দোষ ছিল ? আমার কি অত ক্ষমতা আছে, তোমার কাজগুলো শেষ করব।

অনুতোষ অস্ফুটে বলতে যাচ্ছিল, আমি তো আছি। অফিসিয়াল এটিকেট তার গলা টিপে ধরল। চৈতী তার কলিগ। সাড়ে আট মাসের আলাপ পরিচয়। অফিস যে অনুতোষের ভেতরে এত ঢুকে গেছে, সে জানতো না। চারবছর আগে হলে কত সহজে সে বলে ফেলতে পারতো। দায়িত্ব নিতে পারতো। অনুতোষের সন্তাসংসারে দুটো ঘর। প্রচুর মশা। মশারি টাঙিয়ে তিনটে বিছানায় গাদাগাদি করে নজন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে রোজ রাতে। এর মধ্যে চৈতী ব্যানার্জীকে ভাববার ক্ষমতাও তার নেই। না।

বিকেল তিনটের সময় অফিসটা একটা শাদা কবরখানা হয়ে যায়। সরকারি অফিসে কাজ সাধারণত কম থাকে। বিশেষ কয়েকটা সেকশন ছাড়া অন্য সেকশানগুলোতে তিনটের পরে একদমই থাকে না। অথচ ততক্ষণে দিনের খবরের কাগজটা অনেকবার পড়া হয়ে গেছে। ছেলের অসুখের অথবা দুষ্টুমির গল্প, ঝিয়ের কাজে না আসার গল্পও একসময় ফুরিয়ে যায়। অগত্যা রাজনৈতিক কূটতর্ক শুরু হয় তখন। সরকারি কেরানীদের মধ্যেই সাধারণত রাজনৈতিক সর্বজ্ঞ বেশি থাকে। সেটাও যদি না জমে তাহলে আছে অধোবদনে অশ্লীল আলোচনা।

সুশান্ত সেনের কাছে গিয়ে অনুতোষ রবি ঠাকুরের গান শুনছিল। নিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি। সিগারেট খাওয়ালেই সুশান্তদা গান

শোনায়। যদি তারে নাই চিনি সে কি আমায় নেবে চিনে। প্রথম দিনে সুশান্ত সেনকে দেখে অনুতোষের মনে হয়েছিল, বিভূতিভূষণ আর রবীন্দ্রনাথ মাখানো একজন মানুষ। জীবনে কখনো টেরিকটের প্যান্ট পরেননি। পাজামা আর রুচিশীল রঙের পাঞ্জাবি। কথাবার্তায় সৌমিত্র চ্যাটার্জীর আদল এসে যায়। প্রিয় ছবি অপুর সংসার। অনেক ডায়লগ মুখস্থ। আমার কোনো অনুশোচনা থাকবে না। প্রিয় শখ ফুলবাগান করা। টিফিনবাক্স আর বাসভাড়া নিয়ে অফিসে আসেন। মাইনে পেলে পুরানো দোকান থেকে পনেরো-টাকায় তিনখানা ক্লাসিকস্ কিনতে পারেন। এইরকম সুশান্ত সেন চোখবুজে গান গাইছিলেন। পথে যেতে যেতে কোথা কোনখানে তোমার পরশ আসে কখন কে জানে। সত্যজিত রায়ের ওপর শ্রদ্ধা অনন্ত। হঠাৎ সেকশন অফিসার বরুন রায় বলে উঠলেন, 'আস্তে, একটু আস্তে। অফিসটাকে বাড়ি বানিয়ে ফেললেন যে।' বেলা চারটে বেজে পাঁচ। আর পঁচিশ মিনিট কাটিয়ে দিতে পারলে বাড়ি চলে যাওয়া যায়। বরুন রায় সাহেবি পোশাকের মানুষ। তার লাল রঙের টাইয়ের দিকে অন্যমনস্ক দোকানদারের মতন তাকিয়ে রইলেন সুশান্ত। টাই জিনিসটা সুশান্ত সেনের একদম সহ্য হয় না। একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, 'সরকারি অফিসে দেখবে অনুতোষ, যত উঁচু অফিসার তত এলেবেলে পোশাক। আর গ্রেড ফোর বেয়ারাদের দেখবে ঝকঝকে জামা, পালিশ করা জুতো।' অনুতোষ হেসে মেনে নিয়েছিল। এখন কথা ঘোরাবার চেষ্টা করল। 'গর্ম হাওয়া' দেখেছেন, সুশান্তদা?' গানের ব্যাপারে বাধা পেলে সুশান্ত সেনকে এত সহজে ভোলানো যায় না। বিয়ের পর একবছর বেকার ছিলেন। বাংলায় এম-এ। স্কুলের ডেপুটেশনের চাকরি সবে চলে গেছে! সেইসময় শাশুড়ি একবার সুর ধরেছিলেন, 'ইংরেজিতে এম-এটা করে নাওনা সুশান্ত।' ঠাণ্ডা মাথায় সুশান্ত সেন বলেছিলেন—গানের ব্যাপারে আরো যত্ন নাও, বলেন না।

তো কখনো। পুরোপুরি প্র্যাকটিক্যাল লোক দেখলে সুশান্ত সেন মনে মনে ঘৃণা করেন। এখন সুশান্তকে অতিরিক্ত গম্ভীর দেখাচ্ছে বলে অনুতোষ আবার চেষ্টা করল। রিজনেবল ভাড়ায় কলকাতায় একটা তিনকামারার ফ্ল্যাট কিছুতেই পাচ্ছি না, জানেন তো সুশান্তদা। চার বছর ধরে খুঁজছি।' এইবার হেসে ফেললেন সুশান্ত। 'মাত্র ?'—নিষ্ঠুর ব্যবসায়ীর গলায় বললেন, 'টাকা আয় করো। সব ঠিক হয়ে যাবে।' অনুতোষ চুপ করে গেল। কথাটার মধ্যে উপেক্ষার উত্তাপ ছিল। 'সন্ধেবেলা হোটেলে কিম্বা বারে বসে মদ্যপান করতে করতে বন্ধুদের বলতে পারবে, ছেলেবেলায় তুমি কত কষ্ট করেছো। লোকে বলবে—সেল্‌ফ্‌-মেড ম্যান।' অনুতোষ জোর করে হাসলো। 'আসলে কি জানেন, টাকা আয় করা একটা শিল্প। সবাই সে কাজ পারে না।' জানলার বাইরে বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে, সুশান্ত সেন তাই দেখছিলেন খুব মন দিয়ে। অনুতোষ আরো বলল, 'বাবা কি বলে জানেন, ব্যবসার কি সুখ তোরা বুঝবি না। পূজোর বাজারে একদিনে বাইশ হাজার টাকা আয় করেছি। জানেন সুশান্তদা, বাবাকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারবো না, টাকার পেছনে ছুটতে আমার কত খারাপ লাগে। কত ভালো ভালো বই আছে পৃথিবীতে। পড়ে শেষ করার জন্যে একজীবন খুব কম সময়। আর, ভালো সাহিত্য পড়ার যে আনন্দ, তার কোনো বিকল্প হয়, বলুন সুশান্তদা ?' সুশান্ত সেন অন্যরকম চোখে অনুতোষের দিকে তাকালেন। 'তুমি একদিন আমার বাড়িতে এসো অনুতোষ। সন্ধেবেলা। নতুন একটা হারমোনিয়াম কিনেছি। অনেক গান শোনাবো।'

অনুতোষ কিন্তু কোনো বন্ধুকেই কোনদিন নিজের বাড়িতে ডাকতে পারে না। বসাবে কোথায় ? দুটো ঘর জুড়ে আছে তিনটে বিছানা। আলমারি। আলনা। দড়িতে ঝুলছে ৯-জন মানুষের জামা কাপড়। বুবু মিনু আর

ডুডু সবসময় বাড়ি মাথায় করছে। এরই মধ্যে হাবলু অনার্সের অঙ্ক নিয়ে এক কোনো ভীষণ ব্যস্ত। যতক্ষণ বাড়ি থাকে অঙ্ক করে। বিবেকানন্দের জ্ঞানযোগ থেকে পড়ে শোনায় মাকে। লালু বি-কম পার্ট ওয়ান ফেল। বাজার করে। রেশন তোলে। মায়ের পার্সোনাল সেক্রেটারি। বাবার একজন বন্ধু আসেন মাঝে মাঝে। শাদা চুল শাদা দাড়ি। বাবার দোকানের সামনে ফুটপাতে বসে একসময় গেঞ্জি বিক্রি করতেন। এখন দোকান বড় হয়েছে। ছেলে দেখাশোনা করে। ভদ্রলোক সবসময় উত্তেজিত ভঙ্গিতে অনর্গল কথা বলেন। অনেকক্ষণ বকবক করে যাওয়ার পরে হঠাৎ বাবার শূন্য চোখের দিকে চেয়ে থেমে যান। বুঝতে পারেন আবার প্রথম থেকে বলতে হবে। বাবা কিছুই শোনেন নি। এরকম সময় ঋষির নিরাসক্তি নিয়ে বাবা আস্তে করে বলেন, 'ভালো পাত্রী আছে হাতে, সদানন্দ?'

ক্যালকাটা আয়রণ ফাউণ্ড্রির মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার সোমনাথ বক্সি যখন শিফট ডিউটি থেকে বাড়ি ফেরে, মশারির ভিতর শুয়ে কেরানী অনুতোষ বক্সি তখন আলজিরিয়ার মরুভূমিতে একটি অকারণ খুনের দৃশ্য পড়ছে। শ্যাওলা ধরা বুটজুতো খুলতে খুলতে সোমনাথ বক্সিকে অবসন্ন গলায় বলতে শোনা যায়—'এত রাত অব্দি জেগে থাকিস কেন। শরীর খারাপ হবে।' রিভলবার হাতে আলজিরিয়ার মরুভূমি থেকে অনুতোষ বক্সি কিছু শুনতে পায় না।

মায়ের সঙ্গে বাড়ি দেখতে যাচ্ছিল অনুতোষ। বেরোবার সময় বাবার সঙ্গে খুব একচোট ঝগড়া হয়ে গেল মায়ের। বাবা এখন কোথাও যেতে চায় না। কোনো ব্যাপারেই উৎসাহ নেই। মা রোজ সন্ধেবেলা রামকৃষ্ণ মিশন, সারদা মঠ, দক্ষিনেশ্বর কিম্বা কাশীপুর উদ্যানবাটিতে গিয়ে বসে থাকে। ধর্মসভা ভাগবতপাঠ শোনে। বুবু আর মিনু তেমন আপত্তি করে না সঙ্গে যেতেও চায় না। শুধু ডুডু, চিৎকার জুড়ে দেয়। বায়না

ধরে। এক্ষেত্রে বাবার অপরাধ দুটো। এক, ঘরবাড়ির খোঁজখবর যখন করতে পারবে না, তখন ছোট মেয়েকে সামলাও। বাবা সেটাও একদম পারে না। দুই, সারাজীবনে বাড়ি আর ব্যবসা করা ছাড়া আর সাত ছেলে মেয়ের বাপ হওয়া ছাড়া কিছুই তো করোনি। বসে বসে খাচ্ছো। এখন দয়া করে মরে গিয়ে শান্তি দিচ্ছো না কেন? বাবার পক্ষে অনেক-গুলো যুক্তি আছে। অনুতোষের মামা একবার বাবার কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকা ধার চেয়েছিল। মায়ের গয়না বেচে বাবা এককথায় দিয়ে দিয়েছিল, হাতে ক্যাশ ছিল না। গয়না খুলে দেবার সময় মা কোনো প্রশ্ন করেনি। বাবা বলেছিল ব্যবসার জন্যে দরকার। মা ভেবেছিল আবার তো হবে। মামা আর টাকাটা ফেরত দেয়নি কোনদিন। বাবা বলে 'তোমার ভাইদের মতন লোকেদের জন্যেই আমার সবকিছু শেষ হয়ে গেল।' মা চিৎকার করে ওঠে—'তুমি হাট করে প্যান্ট খুলে রাখলে দুনিয়ার লোক এসে মেরে দিয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি।' অনুতোষ তখন মাকে চিনতে পারে না। বাবা গুম মেরে বসে থাকে। রাগে আগুন বেরোয় চোখ দিয়ে। বলে—'তোমারই তো ভাই। তোমাদের পেটে ভাত জোগাতেই তো আমার সব গেছে।' এই সাত পুরোনো ঝগড়াটা আজ আবার একচোট হয়ে গেল। অনুতোষ কাউকেই থামাল না। ডুডুকে দুটো দশ পয়সা দিয়ে বলল, 'গরম সিঙ্গাড়া খাবি। দিদিকে দিবি না।' চুপ করে গেল সে। মাকে বলল—'আর দেরি করলে অঞ্জনার বাবা বেরিয়ে যাবে।' সন্তানকে ফেলে মিশনে গিয়ে বসে থাকতে মায়ের কেন খারাপ লাগে না, অনুতোষ বুঝতে পারে না। বোধহয় একের পর এক ছেলে মানুষ করতে করতে মা অনেক নির্মম হয়ে গেছে। মুড থাকলে মা খুব পুরোনো দিনের গল্প বলে। তখনো হাবলু হয়নি। পূজোর আগে মোটা মোটা কাপড়ের বাণ্ডিল আসতো। বাড়িতে হাঁটাচলার জায়গা থাকতো না। নতুন শাড়ির গন্ধ ঘরে, উঠোনে। তখনকার

দুশো টাকার বেনারসী মা কত যে পরেছে।

মিশন থেকে ঘরের ব্যাপারে দুটো যোগাযোগ পাওয়া গেছে। গোপাল লাল ঠাকুর রোডে পড়ে বনহুগলির দিকে একটু এগিয়ে বাঁদিকের একটা গলিতে ঢুকলো তারা। মামাতো দিদির ছেলে কি কি কথা বলে মা সেই গল্প বলছিল। কল্যানীকে অনুতোষ দিদি বলে ডাকতো। কল্যানীর ছেলে রাজা মাকে বলেছে—'দিদা, তুমি মিনি বাসে করে যেও না। বড্ড ভিড় হয়। বাসে করেও যেও না। বড্ড ভিড় হয়। তুমি হাঁটি হাঁটি করে বাড়ি চলে যাও।' অনুতোষ হেসে বলল, 'বাবা, রাজার এত বুদ্ধি হয়েছে নাকি! মায়ের সঙ্গে এমনিতে কোথাও যাওয়া হয় না বলে অনুতোষের আজ খুব ভালো লাগছিল।

বাড়িটার বাইরে চার পাঁচজন নানা বয়সের মেয়ে বসে ছিল। বিকেল শেষ হয়ে গেছে। একজনের মাথায় সিঁদুর। বয়স অল্প তবু সারাশরীরে পরিশ্রমী ও উদ্যমী গিন্নি গিন্নি ভাব। চারজনকেই আলাদা আলাদা ফ্যামিলির মেয়ে বলে মনে হল। মোট কতজন ভাড়াটে থাকে এ বাড়িতে? একতলায় প্রায়ান্ধকার উঠোনে একসঙ্গে তিনটে উনুনের ধোঁয়া। কোনরকমে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল তারা। মা বলল, 'বাবাঃ, আমরা তো অনেক ভালো আছি।' দোতলায় চৌকো রেলিঙের চারপাশে সারি সারি ঘর। সারি সারি ভাড়াটে। কোনো ঘরের দরজায় পর্দা। কোনো ঘরের সামনে বারান্দায় বাচ্চারা খেলা করছে। এই বাড়িতে মোট কতগুলো বাচ্চা আছে? সকালবেলা একসঙ্গে পায়খানা পেলে কিম্বা জল ফুরিয়ে গেলে এই বাড়িটার চেহারা কি রকম হয় অনুতোষ ভাববার চেষ্টা করল! বলল, 'একটা বাড়িতে এত ভাড়াটে থাকতে পারে আমরা কোনো আইডিয়া ছিল না।' একদম কোনের দিকের ঘরটায় অঞ্জনারা থাকে। অঞ্জনা গ্র্যাজুয়েট যুবতী। রোগা, উজ্জ্বল, শ্যামবর্ণা। চোখগুলো বড় বড়। মায়ের সঙ্গে তার মিশনে আলাপ। ঘর জুড়ে

একটা বিশাল চওড়া তক্তপোষ। একদিকে বিছানাপত্র উঁচু করে গোটানো। অঞ্জনার দু-ভাই সেখানে ছড়িয়ে বসে পড়াশোনা করছে। ঘরের এককোনে রামকৃষ্ণ সারদা-মা আর বিবেকানন্দের বড় বড ছবি। সেখানে হাত জোড় করে নতজানু হয়ে চোখ বুজে বসে আছে অঞ্জনার মা। অঞ্জনা একটু দূরে একই ভাবে বসে কি একটা শ্লোক বলছিল। মাকে দেখে সারা মুখে খুশি ছড়িয়ে বলল, 'আসুন জয়াদি। বসুন। বাবা তো বাড়ি নেই।' বাড়ির খোঁজ তাহলে অঞ্জনার বাবা ছাড়া এরা কেউ জানে না। কথাবার্তায় জানা গেল. বলবার মত কোনো খবরই তিনি রেখে যাননি। কিন্তু অনুতোষ ভাবছিল কোথায় বসবে। অঞ্জনা বসুন বলল কিন্তু নিজের কাজ থেকে উঠল না। পরে যোগাযোগ করবো এবং আর এক জায়গায় ঘর দেখতে যাবার তাড়া আছে তাই চা খাবো না— এইসব বলে মা চলে এল। অনুতোষ দেখল, অঞ্জনার মা এত কথার মধ্যে একবারও চোখ খোলেন নি। কথায় কথায় মা বলল, অঞ্জনা সারদা মঠের সন্ন্যাসিনী হতে চায়। বিয়ে করবে না। অঞ্জনার বাবা আসলে কতটা গরীব? অনুতোষের মন খারাপ হয়ে গেল। উপাসনার মধ্যে কি আশ্রয় আছে? কে জানে। অন্তত অনুতোষ জানে না। মাকে এসব খুব মানিয়ে যায়। টানা পাঁচ ঘণ্টা ঠাকুরের ছবির সামনে বসে থাকতে পারে মা। অবিচল। স্থির। কিন্তু অঞ্জনা? তার ব্যাপারটা কি অন্যরকম নয়। নিজের বাবার গলায় কাঁটার মতন আটকে আছে বলেই কি সে সন্ন্যাসিনী হতে চাইছে না? অনুতোষ দেখেছে, দুঃস্থদেরই ঈশ্বর বিশ্বাস বেশী থাকে। অথচ অনুতোষ জানে. মানুষের দারিদ্র্য মানুষেরই তৈরী। ঈশ্বরের রাজ্যে দারিদ্রের কোনো আলাদা স্বর্গ নেই। কিন্তু অঞ্জনা কি নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে না। তার কি নিজের কোনো ঘরবাড়ি হতে পারতো না! অথবা সে সত্যিই উপাসনার মধ্যে তার গোপন ঘরবাড়ি খুঁজে পায়! কে জানে। অনুতোষ আপাতত এসব

ভাবতে চায় না। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, দিনে দুবার পেট ভরে খাবার পেলেই তো বেঁচে থাকা যায়। ঈশ্বর—টিশ্বরের দরকার কি? পাঁচদিন না খেতে পেলে কারো ঈশ্বরের কথা মনে থাকবে কি? যার অনেক আছে, তার থেকে যে কোন ভাবে কিছু হাতিয়ে নেবার ইচ্ছে হবে না? মহাপুরুষদের ব্যাপার আলাদা। সাধারণ মানুষেরা আসলে নানারকম দুর্বলতা থেকে ধর্ম ও ঈশ্বর তৈরি করেছে। এই রুটি ঈশ্বরের দান। ভগবান—এবারের মত এই বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দাও। এ সবই দুর্বলতা। অনুতোষের আপাতত একটা তিন কামরার ফ্ল্যাট চাই। সেটা সে নিজেই খুঁজে নিতে চায়। ঈশ্বরের করুনায় পেয়ে যেতে চায় না। তার ঈশ্বর কোনো সুদখোর মহাজন নয়। তোষামোদপ্রিয় মন্ত্রীটন্ত্রী নয়। ঈশ্বরের রাজ্যে কোনো তিনকামরার ফ্ল্যাট নেই। তবুও ঈশ্বর ভদ্রলোককে অনুতোষ যে খুব অপছন্দ করে তা নয়। তাঁর দিকে যাওয়ার জন্য যতখানি নিঃস্বার্থ হওয়া দরকার, ততখানি স্বার্থহীন চেহারায় নিজেকে সে দেখতে পায় না। আপাতত মানুষকে তার আরো বেশি পছন্দ। প্রয়োজন। মানুষের সেবা সংযোগ। উত্তাপ। স্নেহ! ইত্যাদি। তার ভাল লাগে। মানুষ ঈশ্বরের অংশ—এরকম বাক্যের মধ্যে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয়। এরকম ভুল বিশ্বাস মানুষকে স্বাভাবিক রাখে। আসলে মানুষের মধ্যে মানুষ ছাড়া আর কিছু নেই। ঈশ্বরের বদলে রাস্কেল শব্দটা প্রথম থেকে চালু হলে কোনো ক্ষতি হত না। পৃথিবীর রামকৃষ্ণরা বলতেন, আমি রাস্কেলকে পেয়েছি। তাকে পেলে সব পাওয়া যায়। পৃথিবীর অনেক মহাপুরুষ অনেকবার এভাবে অনেক রাস্কেল বা ঈশ্বরকে পেয়েছেন। তাতে পৃথিবীর অনুতোষ বক্সিদের কোনো লাভক্ষতি হয়নি। লক্ষ কোটিবার সূর্য উঠেছে পূর্বদিকে। লক্ষকোটি শিশু দু-আনার চানাচুর খেতে খেতে ভেবেছে, পৃথিবী মধুর ও মনোরম। আনন্দময়। তারপর বয়েস বাড়লে বুঝেছে, অতৃপ্তিই জীবনের মানে।

সুখ পোষা বেড়ালের মত। বেহিসেবী হলেই দুধটা মাছটা খেয়ে যাবে।

পরের ফ্ল্যাটটা খুব পছন্দ হল দুজনের। বড় বড় তিনটে ঘর। বুক-সমান উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। একটুখানি বাগান করার মতন জায়গাও আছে। বাগান না করে সেখানে ব্যাডমিণ্টনও খেলা যেতে পারে।

বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক খুনীর উপেক্ষা নিয়ে জানালেন, 'বাঙালীদের ভাড়া দেবো না। আমার ইচ্ছে। মাড়োয়ারিদের পেমেণ্ট ভালো। তাছাড়া আমার পাঁচ হজার টাকা সেলামি চাই।'

অ্যাডভান্স দেওয়া যেতে পারতো। সেটা অ্যাডজাস্টেড হয়। অনুতোষের হিসেবে সেলামির কোনো এন্ট্রি নেই। ওটা ঘুষ। অনুতোষ অন্যায় অধিকার চায় না। সাধ্যও নেই।

ফিরে আসার পথে একটা তেলেভাজার দোকান দেখে মাকে বলল অনুতোষ, 'মা মুড়ি তেলে ভাজা খাবে? এখানে দারুন লঙ্কার চপ পাওয়া যায়। তুমি লঙ্কার চপ খাওনি কখনো, মা শান্ত গলায় বলল, 'ভালো লাগে তোর? তাহলে নে।'

অনুতোষ ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাতাসে আঁচল উড়িয়ে চৈতী এসে বলল 'এসো আমরা বাতাস হয়ে যাই। বাতাসের কোনো প্রতিবেশী নেই। বাতাসের কোনো ঘরবাড়ি লাগে না।'

হুহু হাওয়ার মধ্যে অনুতোষের ঘন চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সে অনেক মমতা নিয়ে চৈতীর দিকে তাকালো। 'দুজনেই বাতাস হয়ে গেলে আমাদের কোনো অনুভূতি থাকবে না। দুঃখ থাকবে না। সুখও থাকবে না।'

চরাচরে শোঁ। শোঁ। শব্দ হচ্ছে। চৈতী ছুটতে ছুটতে অনেকদূর চলে গেল। অনুতোষ মুগ্ধ চোখে দেখল, তার ছুটে যাওয়ার মধ্যে কোনো-রকম পালিয়ে যাওয়া নেই। শুধু খেলার আনন্দ আছে। ছুটতে ছুটতে ফিরে এসে চৈতী বলল, 'আমি একটা নদী দেখতে পাই। অনেকখানি

নির্জন বালিয়াড়ি। একটা কটেজ থাকবে ছোট্ট। তুমি স্নান করতে গিয়ে অনেক দেরি করবে। আমি রান্না শেষ করে তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলে যাবো। ফিরে এসে দেখবো, টেবিলে খাবার ঢাকা দিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো। তোমার চোখ ক্ষুধার্ত। তোমার ঠোঁট ক্ষুধার্ত।'

ঘুমের মধ্যে জায়গাটা কিছুতেই চিনতে পারলো না অনুতোষ। পুরনো চাঁদের পুরনো মায়া ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। কাছেই সমুদ্রশব্দ।

এসবের মাঝখানে জ্বরাচ্ছন্নের মত অনুতোষ কোনরকমে বলে গেল; 'নদী নয়, কটেজ নয় চৈতী। আমার চোখের দিকে তাকাও। আমার বুকের ভেতর চোখ রাখো। এখানে তোমার সেই ঘরবাড়ি সাজিয়ে রেখেছি। এখানে সারাবছর জল পাওয়া যায়। এখানে কোনো ভুল প্রতিবেশী নেই। বাড়িওয়ালার পাগল ছেলের লেকচার শুনতে হয় না। একপয়সাও ভাড়া দিতে হয় না। পৃথিবীর মানুষেরা এখানে পৌঁছতেও পারে না। আমাদের পরিশ্রমের অর্জন তাই চুরি হয়ে যাবার কোনো ভয় নেই চৈতী।'

অনুতোষের একটা হাত ধরে চৈতী বলল, চলো। তার আঁচলে সমুদ্র বাতাসের স্নেহ।

## আউট

বিকেলবেলা মেট্রোর নিচে দাঁড়িয়ে মিকির জন্যে অপেক্ষা করছিল চুনীলাল সাহা, আন্তঃ কলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ব্যাট হাতে নামলেই যে সেঞ্চুরী করে চুনী জানে। হাতে ব্যাট আর বলে চোখ আর মনটা পুরোপুরি ব্যাট চালানোর দিকে থাকলে আউট হওয়া অসম্ভব। চুনী দেখেছে, ব্যাটিং করতে করতে মন ক্লান্ত হয়ে গেলেই সে আউট হয়ে যায়।

আজ মিকির কলেজ ছুটি চুনী জানতো। দুপুরে ফোন করে অ্যাপয়েন্ট-মেণ্টটা করে নিয়েছে। ধর্মতলায় আসতে মিকির অল্প আপত্তি ছিল। বাড়ি ফেরার সময় ভিড় বাসে ফিরতে বড্ড অসুবিধে হয়। চুনী বলেছিল সে দায়িত্বটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।

আধ ঘণ্টা হয়ে গেল মিকির আসার সময় পেরিয়ে গেছে। কে আউট করে দিচ্ছে মিকিকে? কলকাতার ভিড় ভর্তি বাস-ট্রাম? কিন্তু বিকেলবেলার আপের বাসে মিকির মতন স্মার্ট মেয়ের উঠতে না পারার তো কোনো কারণ নেই।

অপেক্ষায় অধৈর্য হতে হতে চুনী বিকেলবেলার ধর্মতলা দেখছিল। একটা ঝাঁকড়া চুল সাহেব ছেলে তার পাশের মেম মেয়েটার কাঁধ জড়িয়ে ধরে হেঁটে গেল। চুনীর ইচ্ছে হল, ওইভাবে মিকির কাঁধ ধরে সে একদিন হাঁটবে। অবশ্যই নিরালায়। ধর্মতলার ফুটপাথে নয়। আমি তো আর সাহেব নই। সাহেবদের নানারকম পাশপোর্ট থাকে।

চুনী ভেবে দেখেছে, পৃথিবীর গায়েও মাটির শ্যাওলা থেকে মানুষ

পর্যন্ত এই লম্বা বিবর্তন আসলে ভুল ব্যাট চালিয়ে আউট হয়ে যাবার একটা ধারাবাহিক অঙ্ক। মিউজিয়ামে মিকিকে নিয়ে বেড়াতে গিয়ে একবার চুনী একটা লম্বা বিরাট কংকাল দেখে অবাক হয়েছিল খুব। এতবড় একটা জানোয়ার দুনিয়া থেকে আউট হয়ে গেল। কি করে? পরে অবশ্য নিজেই মনে মনে নিজেকে উত্তরটা দিয়েছে অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পরে যাবে।

মিকি আসছে না কেন, ভাবতে গিয়ে মনে মনে চুনী ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠতে গিয়েই দেখতে পেল, নীল জিনিস আর ইণ্ডিয়ান রেড চাইনিজ শার্ট পরে বাতাসে ছোট ছোট চুল উড়িয়ে রাস্তার ওপার থেকে মিকি এপারে আসছে। মাঝরাস্তায় এসে একটা প্রাইভেট কারকে বাঁহাতটা অসাধারণ ভঙ্গিতে তুলে ধরে থামতে বলে রাস্তাটা পেরিয়ে এল মিকি। চুনী মিকির এই হাত তুলে প্রাইভেট কারকে থামাবার ভঙ্গিটা মনে মনে ঢেকে রাখলো।

চুনীর কাছে এসে মিকি ঠিক সেইরকমভাবে একটু হাসলো যেরকম ভাবে মিকি ছাড়া আর কেউ হাসতে পারে না। বলল, অমল এসেছিল অনেকগুলো ছবি দেখালো—দারুণ এঁকেছে। ডোণ্ট মাইণ্ড, লেটস গো নাউ।

চুনী ভাবলো, অমল কি তার চেয়েও ভাল ব্যাটসম্যান? বেশ কয়েক দিন ধরে এই অমল নামের ছবি আঁকিয়ে খেলটা তাকে ডিসটার্ব করেছে। একদিন বাগে পেলে—। চুনী অবশ্য জানে, অমলকে আউট করতে হলে নিজেকে আরো বুদ্ধিমান বো'লার হতে হবে। কোন লেনথে কোন বলে অমল হেরে যাবে সেটা আবিষ্কার করতে হবে। কিন্তু মিকি নিজেই যদি অমলকে অ্যালাউ করে তাহলে আমি কি করতে পারি? মিকি অবশ্য মুখে বলে—ও আমার বন্ধু. উই হ্যাভ আ ভোর ফেয়ার রিলেশনশিপ।

মিকিকে কিছুই বুঝতে না দিয়ে মুখে বলল : খাবে কিছু ? মিকি বলল—ধেৎ, চলো একটু ফাঁকার দিকে যাই।

এসপ্ল্যানেড ইস্টের দিকে যেতে যেতে দুজনে দেখল, সারি সারি ভাঙাচোরা বাস। নানা কথার মাঝখানে মিকি বলল, ওয়েস্টেজ আমার একদম সহ্য হয় না। জাপানে জানো তো, কোনোকিছুই ফেলে দেওয়া হয় না। কাগজের কারখানার ছাঁট দিয়ে আবার অন্য কিছু তৈরি করে। নইলে হিরোশিমা নাগাসাকির পরে এত তাড়াতাড়ি একটা দেশ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে ?

ডেকার্স লেনের আগে গাড়িবান্দায় একটা কীসের মিটিং হচ্ছিল। এলোমেলো কথা বলতে বলতে ওরা মিটিংটার পাশ দিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর ইডেনে গাছের নিচে বসে মিকি চুনীকে নতুন দেখা একটা সিনেমার গল্প বলছিল : হঠাৎ কাঁধে ব্যাগ নিয়ে একজন রোগা চেহারার যুবক সামনে উবু হয়ে বসে পড়ে বলল—আপনাদের একটু ডিসটার্ব করবো দাদা। কিছু মনে করবেন না। আমি একজন শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েট বেকার। চাকরি পাইনি। আপনাদের কাছে প্যাটিস বিক্রি করে আমার পেট চলে। তিন বোন আর মাকে নিয়ে আমার সংসার। বাবা হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন গত বছর। আপনাদের দুটো প্যাটিস দিই ?

চুনী কিছু বলার আগেই মিকি বলল, চারটে দিন। ছেলেটি উজ্জ্বল হেসে পয়সা নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, মে গড ব্লেস ইউ।

মিকি কিন্তু একটা প্যাটিসও খেল না। খাওয়া-দাওয়ায় ব্যাপারে মিকি খুব অভিজাত। ব্যাপারটা চুনীর কাছে একটা কনস্ট্যান্ট প্রবলেম। মিকির তুলনায় চুনীরা বেশ গরীব। খেলার কারণে সে অবশ্য একটা মোটামুটি ভালো চাকরি পেয়ে যাবে। কিন্তু মিকির বাবার একসপোর্টের ব্যবসা। শেষঅব্দি মিকির বাবা তাদের বিয়েতে রাজি হবেন না চুনী

জানে। মিকির মা কিন্তু চুনির দলে। মিকির বাবাকে কি করে আউট করা যায় সেটা চুনীর শেষতম সমস্যা।

মিকি আবার তার শেষ দেখা ইংরিজি সিনেমার গল্পটা বলে যাচ্ছে আর চুনী দুটো প্যাটিস শেষ করে ফেলেছে, এমন সময় একটা ভিখিরি এসে হাত পাতলো, দিদি, দশটা পয়সা দেবেন। দিদি, দশটা পয়সা। চুনী তাকে বাকি প্যাটিস দুটো দিয়ে দিল।

মিকি বলল, শান্তিতে একটু বসবো, তারও কোনো উপায় নেই দেখছি। চলো হাঁটি। ময়দানের দিকে যাই।

কথা বলতে বলতে ময়দানের একটা গাছের নিচে দু'জনে বসলো। সামনে বিস্তীর্ণ মাঠে ঘাসের সবুজ সমুদ্র। ওপারের টাটা সেন্টার, জীবন দীপ এইসব বাড়িগুলো পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ছবির মতন দেখাচ্ছে। মিকি কিছুক্ষণ-তাকিয়ে থেকে বলল, ত্থাখ, আমেরিকা আমেরিকা মনে হচ্ছে না ?

কিছুক্ষণ পরে কথায় কথায় মিকি বলল—জানো অমল আমাকে একটা প্রশ্ন করেছে, আমি উত্তর দিতে পারিনি।

চুনী খুব নিচু গলায় ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, কী প্রশ্ন ?

মনে করো খুব ফাঁকা একটা মাঠ। সেখানে শুধু একটাই আম গাছ আছে। ঘুরতে ঘুরতে দুটো লোক গাছটাকে আবিষ্কার করল। একজন সঙ্গে সঙ্গে লোকালয়ে ফিরে এসে সব্বাইকে জানালো—অমুক জায়গায় একটা আম গাছ আছে, চলো চলো সবাই মিলে আম খেয়ে আসি। আর একজন কাউকে কিছু না বলে গাছে চুপচাপ আম খেতে লাগল। মানুষে মানুষে এই তফাতটা কেন হয় ?

চুনী একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, পাঁচটার সময় আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করেও তুমি অমলের সঙ্গে গল্প করো কেন ?

মিকি কিছু বলবার আগেই একদল যুবক নিজেদের মধ্যে খিস্তিখেউর

করতে করতে সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। তারা খেলা দেখে ফিরছে। তাদের কথাবার্তায় বোঝা গেল, তারা যে দলের সাপোর্টার সে দলটি এক গোলে হেরেছে বলে তারা ক্ষিপ্ত। চুনী আর মিকিকে গাছতলায় বসে থাকতে দেখে তারা অশ্লীল কিছু অঙ্গভঙ্গি করল। রক্ত গরম হয়ে উঠলো চুনীর। অপমান সে একদম সহ্য করতে পারে না। কিন্তু কিছু করার আগেই মিকি তার মুখ চেপে ধরলো। খেলা ফেরত ছেলেরা চলে গেলে মিকি বলল, জানো তো, রামকৃষ্ণের একটা কথা আছে, ভুঁড়ি আর মুড়ি সবসময় ঠাণ্ডা রাখবে। মুড়ি মানে মাথা আর কি। চুনী হেসে ফেললো। বলল, প্যাণ্টসার্ট পরে ঘুরে বেড়াও, কনভেণ্টে পড়াশোনা করেছো, তুমি এত রামকৃষ্ণ শিখলে কোত্থেকে ?

মিকি বলল, মায়ের কাছ থেকে। মা রোজ মিশনে যায়। লাইব্রেরি থেকে বই আনে। কি ইণ্টারেস্টিং বই সব। নিক কার্টার আর হ্যারল্ড রবিন্স পড়ে পড়ে চোখ পচে গেছে। থাকগে, তুমি একটা ভালো জোক বলো, শুনি।

চুনী বলল, চার্লস ল্যাম্ব একবার এক বিখ্যাত দার্শনিকের সঙ্গে দেখা করার সময় স্লিপে লিখেছিলেন অ্যালাউ মি ফিফটিন মিনিটস টাইম ফর ফাইভ মিনিটস টক। দার্শনিক ল্যাম্বকে দেখেই বলেছিলেন—তোমার তো বয়স কম। চিকিৎসা করাও, সেরে যাবে। কেন বলেছিলেন বল তো ?

মিকি নিঃশব্দে হাসলো। বলল, জানি না।

চুনী বলল, চার্লস ল্যাম্ব তোতলা ছিলেন।

মিকি খিল খিল করে অনেকক্ষণ হাসলো। তার হাসির শব্দ শুনতে শুনতে চুনী স্পষ্ট দেখতে পেল, বুকের ভেতর সরু আঁকা বাঁকা একটা ঝর্ণার পাশে নিচু হয়ে জল খাচ্ছে একটি হরিণ।

অন্ধকার হয়ে আসার কিছুক্ষণ পরেই একটা টর্চের আলো এসে পড়ল তাদের ওপর। চুনী চোখে হাত চাপা দিয়ে কড়া গলায় বলল, হু আর ইউ ? লোকটি বলল, দি প্লেস ইজ নট সেফ। হোয়াট আর য়ু ডুইং হিয়ার ?

মিকি বলল, আর ইউ এ পুলিশম্যান ?

লোকটি বলল, হাঁ। এখানে বসবেন না। যে কোনো সময় ছিনতাই হতে পারে।

মিকি বলল, থ্যাংক ইউ। আমরা এক্ষুণি চলে যাচছি।

ধর্মতলায় এসে তারা দেখল, যে যেদিকে পারছে দৌড়চছে। মিকি খুব ভয়ার্ত গলায় বলল, কী ব্যাপার বলো তো ?

চুনী বলল, ব্যাপার যাই হোক, চলো কোনো চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ি। একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কলকাতায় কোনো গোলমালই বেশিক্ষণ থাকে না।

চুনীর পেশীবহুল শরীরের দিকে তাকিয়ে মিকি একটু শান্ত হল।

চায়ের দোকানে ঢুকে চা খেতে খেতে আশপাশের লোকজনের কথাবার্তা থেকে যেটুকু জানা গেল তা হল, হেরে যাওয়া দলের সাপোর্টাররা উত্তেজিত হয়ে বাসে ট্রামে ট্যাকসিতে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়ছে। মাউণ্ট পুলিশ কয়েকজনকে তাড়া করেছে বলে তাদের রাগ পাবলিকের ওপর গিয়ে পড়েছে।

চুনী বলল, কিচছু ভেবো না। আধঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।

মিকি বলল, একবার কেউ বাড়ি থেকে বেরোলে সে যে কখন বাড়ি ফিরবে তার কোনো গ্যারাণ্টি নেই

চুনী বলল, তুমি তো কোনো দোষ করোনি, তোমার কিছু হবে না।

মিকি বলল, দোষটোষ কোনো ব্যাপারই নয়। আচমকা ঝামেলা বাধলে নিরীহ লোক বিপদে পড়ে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আবহাওয়া শান্ত হয়ে এলে মিকিকে একটা শেয়ার ট্যাকসিতে তুলে দিয়ে নিজে বাড়ি ফেরার বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে চুনী ভাবছিল, প্রেমের ব্যাপারটা কি আস্তে আস্তে কলকাতা থেকে আউট হয়ে যাচছে। কোথাও শান্তিতে একটু গল্প করারও জায়গা নেই।

## মায়ের সঙ্গে হাসপাতাল অব্দি

সকালবেলা বাবা বলেছে, খুব রাগী আর বোকা মানুষের মত মুখ করে, বলেছে—'জানি না, জানি না।' তারপরে, সন্তু যখন জানলায় বসে বাইরের ছোট বারোয়ারি মাঠের ওপারে ডালমিলের মাথার চিমনিটা দিয়ে অনবরত ধোঁয়া ওঠা দেখছিল, দেখছিল ধোঁয়াগুলো চিমনি দিয়ে বেরুচ্ছে তো বেরুচ্ছেই, ছোট ছোট মেঘ হয়ে যাচছে, কতরকম ছবি হয়ে যাচ্ছে আকাশে—বাবা ঘরের কোণে হেলান দিয়ে রাখা ক্রাচটা নিয়ে বোকা আর রাগী মুখ কার বেরিয়ে গেছে। ডালমিলের দেয়ালে ফাটা ফাটা দাগ, অশ্বত্থচারা, জ্যামিতির একস্ট্রার মতন শেকড়, মাঝখানে একটা বিরাট জানলা যেটা বন্ধ করা যায় না কখনো, কারণ পাল্লাফাল্লা কিছু নেই, গরাদ বলেও কিছু নেই। আরো অনেক প্রিয় ভাবনার মধ্যে সন্তুর একটা প্রিয় ভাবনা হল যে সে একদিন ওই জানলাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে ডালমিলের কালো কালো লোকগুলোকে দেখে আসবে, ছুঁয়েও আসবে। কেন যে এত কালো কালো দেখায় লোকগুলোকে এই জানলা থেকে—সন্তু জানলা দিয়ে সেইসব দেখছিল যখন, ঘরের বাইরে সরু বারান্দার ওপারে আড়াল করা যেখানটায় রান্না করে মা, বৃষ্টি এলে চটের থলের আড়াল ভেঙে সব ভেসে যায়, সেখান থেকে তারস্বরে কত কি যে বলে যাচ্ছে মা সন্তু শুনতে পাচ্ছিল। খানিকটা বাবাকে খানিকটা বিধাতা পুরুষকে উদ্দেশ্য করে, সন্তু তার অনেককিছুই শুনতে চায় না, শুনছিল না সে। জানলায় বসে এখান থেকে দেখতে পেল, মাঠের এপাশে, যেখানে একটা, টিউকল আছে, যেখানে

বেঁকে গেছে গলিটা, বাবা বেঁকে যাচ্ছে—দু বগলে লাগানো ক্রাচ, বাঁ-পাটা মাটিতে ঘষে ঘষে যাচ্ছে। জানি না, জানি না বলে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বাবা, রাগে আগুন জ্বলে উঠেছিল মাথায়, দাউ দাউ করে উঠেছিল শরীর—কে জানবে? জানি না মানে? অথচ এখন, টিউকলের পাশ দিয়ে গলির মোড়ে যখন বেঁকে গেল বাবা, বগলে ক্রাচ, তার মনে হল যেন বাবা নয়, যেন অন্য কেউ, একটা খুব বোকা রাগী আর দুঃখী লোক কোথাও চলে যাচ্ছে। খুব ময়লা নোংরা একটা পাজামা আর ফতুয়া তার গায়ে। পাজামাটার রং প্রায় ওই ডালমিলের চিমনির ধোঁয়ার মতন। একমাস আগেও ওই লোকটা এই ঘরের এক কোণে আলাদা বিছানায় শুয়ে পড়ে পড়ে চেঁচাতো—বাবারে-মারে-মারে গেলুম রে, আর খিস্তি—সন্তু জানতোই না তার বাবা এত খিস্তি জানে। সেই বাবা, দেশের বাড়ি থেকে দাদার হাত ধরে কলকাতায় বাবার দোকানে আসতো সন্তু। দোকানে কত সুন্দর সুন্দর তাক, কত সুন্দর গাড়ি, কত সুন্দর জিনিস, হাওড়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমেই কি যেন হয়ে যেত তার। কত লোক, কত গাড়ি, কত মজার মজার জিনিস তার চারদিকে। এ সবই সে দেখতে পাচ্ছে বিনা পয়সায়, ভাগ্যিস বায়না ধরেছিল তিনদিন ধরে কলকাতা যাবে বলে। মায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল দাদার, আর শুনতে পেয়ে সন্তু নাছোড়-বান্দা, কলকাতা সে যাবেই দাদার সঙ্গে। দোকানে উঠেও সেই কি যেন হয়ে যাওয়া সন্তু তার বাবাকে অন্য চোখে দেখতো, তিনজন কর্মচারী ছিল দোকানে—দিলীপকাকা, বেচোকাকা, আর একজনকে সে চেনে না। কি সুন্দর একটা বড় খেলনা হাতী ঝুলছিল দোকানের সামনেই, সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোকানে পা দিয়েই সেটা চোখে পড়তো, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিল সন্তু কিন্তু এত উঁচুতে ছিল যে—। দিলীপ-কাকার হাতে কাউন্টার ছেড়ে দিয়ে বাবা যখন কথা বলছিল দাদার সঙ্গে, সন্তু

হাঁ করে শুধু দেখছিল হাতিটাকে। শেষ পর্যন্ত হাতিটা না নিয়ে দোকান থেকে নামতে চায়নি সন্তু 'না, যাবো না' বলে বাবার জামা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল অনেকক্ষণ। শেষে, কেন যাবে না সে, অনেকবার জিগ্যেস করার পর সেই কি যেন হয়ে যাওয়া সন্তু আঙুল দিয়ে ঝোলানো হাতিটাকে দেখাতে পেরেছিল শুধু। বাড়ি ফেরার সময় তার মনে হয়েছিল সে সঙ্গে করে একটুখানি কলকাতা নিয়ে যাচ্ছে যেন। দেশের বাড়িতে মায়ের আলমারির নিচের তাকের বাঁদিকে হাতিটা এখনো আছে। সন্তু ঠিক করেছিল ওটা বাড়িতে গিয়ে শিগু মানে বুলবুলকে দিয়ে আসবে। তখন তার এইট ক্লাশ চলছে. মনে আছে স্পষ্ট—এখনো সন্তুর, শংকর যখন তেঁতুলবিচি নিয়ে গচ্চি খেলতে খেলতে তাকে বলেছিল কথাটা, মানে কিপ্টে বুড়ো সতীশ চাটুজ্জে তার আদরের নাতনিকে নিয়ে চলে যাবে আঁটপুর থেকে, এখানে আর পড়াবে না—তখন সন্তু ঠিক করেছিল ওই সুন্দর হাতিটা সে বুলবুলকে দিয়ে আসবে লুকিয়ে লুকিয়ে। লুকিয়ে, কারণ লোকের সামনে বুলবুলের সঙ্গে তখন তার কথা বন্ধ। ওই বয়সেই। ওঃ, সেকি কাণ্ড এখনো মনে আছে সন্তুর, স্পষ্ট। ক্লাশ ওয়ান থেকে তারা একসঙ্গে পড়তো তবু কিছুই হয় নি কোনদিন। একদম পড়া বলতে পারতো না বুলা। আর সন্তু ক্লাশের ফার্স্ট বয়। কি করে যে ফার্স্ট হয়ে যেত সন্তু নিজেও জানে না। বাবা তখন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারি। লালমোহন স্যার লাস্ট পিরিয়ডে জেনারেল সায়েন্স পড়াতো, ক্লাশ এইটে—সিক্সথ পিরিয়ডে ছিল জ্যামিতি, জ্যামিতির তরুণ স্যার আসেননি বলে সবাই খুব হৈ-চৈ চিৎকার গোলমাল করে যাচছে' পাশের ঘরে ক্লাশ ফাইভের ছুটি হয়ে গেছে বলে ফাঁকাই ছিল ঘরটা, সন্তু একফাঁকে সেখানে গিয়ে দেখে নিচ্ছিল পড়াটা—সাইফন কাহাকে বলে আর আর্টে-জীয় কূপ। মনে আছে স্পষ্ট এখনো সন্তুর। লালমোহন স্যার বড্ড বোকা আর রাগী লোক ছিল—হুবহু মুখস্থ না বললে হাত চালিয়ে দিত কিংবা

নীলডাউন, স্ট্যাণ্ড-আপ অন্ দি বেঞ্চ, পাশে ঘরে একা চুপচাপ তাকে পড়া করতে দেখে কখন যে বুলা নিঃশব্দে এসে তার পেছনে খুব ঘন হয়ে দাঁড়িয়েছিল সন্তু জানতেই পারেনি—হঠাৎ কানের কাছে গরম নিঃশ্বাস পড়তে ফিরে তাকাতে গিয়ে, পিঠ সোজা করতে গিয়ে বুলার বুকে তার ঘাড়-মাথা-কান ঠেকে গিয়েছিল আর বুলা গাল লাল করে, 'ইস, ভালো ছেলে, খুব পড়া হচ্ছে, এত ভাল্লাগে তোর বই পড়তে, আমার একদম ভাল্লাগে না' বলে যাচ্ছিল ঠিক তখনই দরজায় সুনীলের মুখটা দেখা গেল একবার আর দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল। বুলার একটা ঢোণ্ট-কেয়ার ভাব এমনিতেই ছিল, ফুটফুটে সুন্দর মেয়েদের যেমন থাকে। পাশে বসে পড়ে মাথা কাঁধের বাঁদিকে এলিয়ে দিয়ে বলল, 'কাল থেকে আমি কতবার পড়েছি জানিস, কিছুতেই তৈরী হচ্ছে না, পড়াটা যদি বুঝিয়ে দিতে পারিস আমায়—তাহলে বুঝবো তুই সত্যিই ভালো ছেলে।' তখন, সন্তুর মনে আছে স্পষ্ট, সে বলেছিল—'তুই বুঝে বুঝে ভালো করে পড়িস না তাই মনে থাকে না'। তারপর বুলা একটা করে শব্দ পড়ে আর একটু করে চুপ করে থাকে। আর্টেজীয়। কূপ। হুইল। সন্তু রেগে গিয়ে উঠে চলে এসেছিল। লালমোহন স্যার ততক্ষণে ক্লাশে এসে গেছে। লাস্ট পিরিয়ড। পড়া বলছিল দুখিরাম। ফার্স্ট বেঞ্চ ভর্তি। সন্তু সম্ভবত সেই প্রথম একদম লাস্ট বেঞ্চে গিয়ে বসল, একা। ঠিক পাঁচ মিনিট পরে এসে বুলাও বসল মেয়েদের দিকে লাস্ট বেঞ্চে। তারপর দুজনে যখন দুজনেরই অজান্তে দুজনকে সব ভুলে গিয়ে দেখেছে শুধু, গালে হাত দিয়ে তার দিকে ফিরে বড় বড় চোখে কি যে চেয়ে ছিল বুলা, মরে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সন্তুর সেই চেয়ে-থাকা মনে থাকবে। হঠাৎ লালমোহন স্যার 'তোমাকে এক চড় মারবো সুশান্ত' বলে উঠলো সন্তু যখন 'কেন স্যার' বলল তখন ক্লাশসুদ্ধ সবাই হো-হো করে হেসে উঠেছিল। পরদিন স্কুলে গিয়ে দেখল ক্লাশময় সারা দেওয়ালে আর ব্ল্যাকবোর্ডে সুশান্ত

প্লাশ শিখা, সুশান্ত প্লাস····লেখা, আর বুলা বিকেলে যখন বাড়ি ফিরছে তখন সবাই মিলে পেছন থেকে সুর করে তাকে সু-শা-ন্ত সু-শা-ন্ত বলে খেপালো অনেক। ব্যাপারটা সেখানেই মিটে যেতো। কিন্তু দুপুরবেলা একদিন সন্তু শংকরকে ছোটকাকার ঘরে বলে ফেলেছিল—আমি বুলাকে বিয়ে করবো, কারণ শংকর তার আগেই বলেছে সে মিনতি চোংদারকে বিয়ে করবে। 'আর তুই?' জিগ্যেস করলে সন্তু ওরকম বলে দেয়। কারণ শংকর আর বুলা কাশী বোসের কাছে পড়তো। শংকর কাশী বোসকে বলে দেয় কথাটা আর কাশী বোস সতীশ চাটুজ্জেকে কাশী বোস বুলাকেও ছাড়েনি, খুব বকে দিয়েছিল। আর সন্তু হুস হুস খেলতে খেলতে চোর দেবার সময় যেমন সে চুপচাপ বাড়ি চলে যেতো চিরকাল, কারণ সারা গাঁয়ে কে কোথায় লুকিয়েছে খুঁজে দেখার তার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই, যতক্ষণ সে চোর না হচ্ছে ততক্ষণ খেলাটা খুবই ভালো লাগে তার, কালীপুজোর রাতে সারারাত খেলা হত, একবার রাত আড়াইটের সময় দূর থেকে তাকে দেখে ফেলেছিল দুখীরাম আর 'হুস হুস সন্তু' বলে দিয়েছিল আর পরের দানে চোর দিতে গিয়ে বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সন্তু – সকালবেলা, সে যাকগে—হুস হুস খেলতে খেলতে একবার সে বুলাদের বাড়ির পেছনের টগরগাছটার নিচে দিয়ে ছুটে যাচছিল। বাড়ির পিছন দিকে একটা পরিত্যক্ত সিঁড়িতে বসে কতদিন গল্প করেছে সে আর বুলা, সেখানে তখন একা একা বসে ছিল বুলবুল, তাকে ছুটে যেতে দেখে ডেকে উঠেছিল—সন্তু, এই সন্তু শোনো। শোনো—শুনে থমকে থেমেছিল সন্তু। বুলা তাকে তুমি করে বলছে। কি ব্যাপার! বলতে যাচ্ছিল, এখন সময় নেই পরে শুনবো, কিন্তু গুটি গুটি এগিয়ে গেল সে বুলার দিকে। তখনো কিছুই জানে না সে। বুলার চোখ লাল, কেন যেন কেঁদেছে খুব। গাল লাল, যেন সন্তুকে ডেকেছে বলে লজ্জা। বুলাকে খুব নতুন

লাগল সন্তর। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কি'। তখনো মনে আছে স্পষ্ট—বুলার চোখে ছিল দুঃখ, অভিমান, আর অনেক রাগ। বুলা বলেছিল—'তুমি কি বলেছো আমার নামে'? আকাশ থেকে পড়া ভাবটা হজম করতে করতে কোমর কষে সন্তু বলেছিল, 'কই কিছু বলিনি তো'। বুলা তখন তার দিকে অনেকক্ষণ লাল দুঃখী চোখে চেয়ে থেকে বলেছিল -'আমাকে বললে না কেন, শংকরকে বলার কি দরকার ছিল'! আর যখন, সন্তু অর্ধেক বুঝে অনেক কিছু না বুঝে, মানে বুলা কি করে জেনে গেল, ইতিমধ্যে কি কি ঠিক ঘটে গেছে, সেসব বুঝতে না পেরে চুপ করে চলে আসছিল—বুলা বলেছিল, 'শোনো, তুমি এখন থেকে সবার সামনে আমার সঙ্গে কথা বলবে না।' তো, সন্তু আর কোনদিনই কথা বলে নি বুলার সঙ্গে। তার আগেই বুলাকে আঁটপুর থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। ফাঁকা ক্লাশঘরে বুলার সঙ্গে তার কিছুক্ষণ থাকা নিয়ে কথা রটেছিল। কথাটা রটতে রটতে ফেঁপে যায়, ফুলে যায়। আর সন্তু তখনো সত্যি সত্যি ভালো ছেলে, ফার্স্ট বয়, জন্মরহস্যও বোঝে না। বুঝিয়েছিল দুখে, দুখিরাম। খেলার মাঠে সন্ধেবেলা ফুটবল খেলার পর সন্তর সঙ্গে দারা সিং-এর কায়দায় কুস্তি লড়তো দুখে। সেই তাকে শিখিয়েছিলো শনিবার ছুটির পর বাড়িতে বই-খাতা ফেলেই দৌড়ে গিয়ে কিভাবে দুটো চৌদ্দোর মার্টিন ট্রেনে লাগিয়ে ওঠা যায় মাঝ রাস্তায়, তারপর জঙ্গিপাড়া, ভোলাচাউলির তের্পলের সিনেমা হলে উনিশ পয়সার টিকিট কেটে চটে বসলেই দারা সিং। ওটা মমতাজ—চিনিয়েছিল দুখে। আর সন্ধেবেলা খেলার মাঠে তাকে নিয়ে কুস্তি লাগাতো দুখে, কোনদিনই তার সঙ্গে পেরে ওঠেনি সন্তু। আসলে সে লড়তেই চাইতো না। খামোকা লড়ালড়ি তার আসলে পছন্দ নয় তেমন। রোগা-প্যাটকা দুখে সেই বয়সেই বেঁড়ে ওস্তাদের মতন বড় বড় কথা বলতো, মাথা দুলিয়ে বকবক করার একটা ভারিক্কি ভঙ্গি ছিল তার, যেটা সন্তর মনে হয় দুখে তার

দাদুর কাছ থেকে পেয়েছে। আর একটা গুণ ছিল দুখের, গলা খুলে গান গাইতো খুব। ও কোকিলা তোরে শুধাই রে, সবারই তো ঘর রয়েছে কেন রে তোর বাসা কোথাও নাই রে। কিংবা অলির কথা শুনে বকুল হাসে, কই তাহার মত তুমি আমার কথা শুনে ইত্যাদি। সন্তুর মনে পড়ল গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে গানটা তখন তাকে ভাবিয়েছিল খুব। স্টেশনের বড়পুকুরের পাড়ে মন্দিরতলায় ব্যায়াম খেলা হত সন্ধেবেলা, বিশাল বড়-পুকুরের ওপার থেকে ঘন গাছপালার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসতো মাইকের সুদূর সুর—গানে ভুবন ··। তো দুখে একদিন ইস্কুল থেকে ফেরার পথে জন্মরহস্য শেখাচ্ছিল সন্তুকে। তখন সন্তু অন্য কথা ভাবছিল, তবে তার নিজের জন্মের পেছনেও এই একই কারণ? তখন দুখেকে আর কিছু বলতে দেয় নি সন্তু। খেলার মাঠে কুস্তিতে সে কোনদিন পারতো না দুখের সঙ্গে। কিন্তু সেদিন, সেই একদিনই—কি যে মার খেয়েছিল দুখে তার হাতে। বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎই আচমকা হাত চালিয়ে দিয়েছিল সন্তু। আর থামেনি। এখন ভাবলে হাসি পায়।

হাতির কথা হচ্ছিল। কলকাতা থেকে হাতিটা নিয়ে চলার সময় মনে হয়েছিল সন্তুর, সে, একটুখানি কলকাতা, সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। আটপুর থেকে চলে আসার আগে ঠিক করেছিল সন্তু। সে তার ওই প্রিয় হাতিটা দিয়ে দেবে বুলাকে। দেওয়া হয়নি। সন্তু কখনো ভুলতে পারে না যে শুধু তার জন্যেই বুলাকে চলে আসতে হয়েছিল আঁটপুর থেকে। হাতিটা আঁটপুরের বাড়িতে মায়ের আলমারির নিচের তাকে একা একা দাঁড়িয়ে আছে। আজ হঠাৎ সন্তুর মনে হল, ওটাকে সে কলকাতায় বাবার দোকান থেকে নিয়ে গিয়েই ভুল করেছিল। না নিয়ে গেলে দোকানটা আজো থাকতো, হাতিটা ওই ঝকঝকে দোকানের মাঝখানে ছবির মত ঝুলতো। মনে হল সন্তুর। যেন সে এটাকে নিয়ে গিয়েছিল বলেই

দোকানটা উঠে গেছে। আর হাতিটা খুব দুঃখে একা একা আলমারির নিচের তাকে অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে। অত অন্ধকারে নিশ্চয়ই তার খুব কষ্ট হচছে! অব্যেস নেই তো। হিসেব করে দেখল সন্তু, প্রায় চার বছর পরেও হাতিটার ওপর তার মমতা একইরকম আছে। এখানে এই ঘরে খাটের নিচে একটা ব্যক্তিগত টিনের বাকস আছে তার। সেখানে আছে মায়ের কম বয়সের একটা ছবি, বিয়ের পরে তোলা— ঠোঁটের নিচে একটুখানি জায়গা পোকায় কেটেছে, শাদা মতন দাগ হয়ে গেছে, তবু মাকে যে কি সুন্দর দেখায় সেখানে। মায়ের কাছে গল্প শুনেছে সন্তু, বিয়ের পর সারা আঁটপুরে হৈ হৈ পড়ে গিয়েছিল! এত সুন্দর বৌ এ তল্লাটে নেই। দাস বাড়ির বড় বৌ বলে যত খাতির ছিল মায়ের তা শুধু ওই বড় বৌ হিসেবে নয়। সন্তুর মনে হয় ভালো দেখতে হওয়ার একটা বিরাট দাম আছে। দেখতে কেমন বিদ্‌ঘুটে হয়ে গেছে বলেই কি আর মাকে তার ততটা ভালো লাগে না? মনে হয় সন্তুর। তার টিনের বাকসে মায়ের ওই সুন্দর ছবিটার সঙ্গে এইরকম রূপোলি ফ্রেমে আঁটা বাবারও একটা ছবি আছে, বোধহয় দার্জিলিং-এর ম্যালে দাঁড়িয়ে আছে বাবা, পাহাড় দেখছে, গায়ে গলাবন্ধ কোট। তখন কি সুন্দর চেহারা ছিল বাবার। চার পাশের পাহাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকা বাবার ওই ছবিটা সন্তুর খুব পছন্দ। তবে মায়ের ছবিটার মতন নয়। মায়ের ছবিটা সন্তুর অন্য কারণে ভালো লাগে। এই মাকে সে চিনতে পারে না। টগর ফুলের মতন গায়ের রঙ, বড় বড় চোখে ছবির মা তার দিকে চেয়ে থাকে। আর সন্তু ভাবে, তার এখানকার মায়ের বসে যাওয়া গাল, রুক্ষ চুল, রক্ত কম বলে গায়ের রঙ বাসি গোলাপ ফুলের মতন দেখায়, এই মাকেই তার পছন্দ। ছবির ছবির মাকে সে চেনে না। তার এই টিনের বাকসে আরো অনেক কিছু আছে। পুরোনো চিঠি। সুকুমারের চিঠি। সুনীল, চন্দ্রা, গৌরী, ঝর্ণা,

রতনের চিঠি। শুধু বুলার চিঠি নেই। বুলা তাকে চিঠি লেখেনি! বুলাকে হাতিটা দেবার তার খুব ইচ্ছে ছিল। হাতিটা ওই টিনের বাকসে করে নিয়ে এলেই হত আঁটপুর থেকে। থাকতো। মাঝে মাঝে বের করে দেখতো সন্তু।

দেখতো, একটুখানি কলকাতা। সঙ্গে করে কলকাতা থেকে নিয়ে যাবার কত সুখ ছিল তখন। এখন এই এঁদো গলির মধ্যে জানলা দিয়ে ডালমিলের চিমনির ধোঁয়া দেখা যায় এই ঘরটাতে—সত্যিকারের কলকাতায় যখন চিরকালের জন্যে থাকতে এল সন্তুরা. কি বিচছিরি, কি একঘেয়ে এই গলির কলকাতা ; সন্তু, হাতিটা থাকলে—তার ছোট্টবেলার ভালো লাগার কলকাতাকে তারিয়ে তারিয়ে দেখতো।

ডালমিলের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সন্তুর মনে হল, অশ্বত্থ গাছের লম্বা লম্বা জ্যামিতির একস্ট্রার মত শিকড়গুলো এক সঙ্গে উঠে আসছে দেয়াল থেকে, স্কুল মাঠে—ভলি খেলার আগে মণ্টুদা জট পাকিয়ে যাওয়া নেট খুলতে সন্তুকে বলতো, জট খুলতে শেখ, সরল অঙ্ক করতে পারবি ভালো—একটা খুঁটি সন্তুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিপুণ কায়দায় জট ছাড়িয়ে যেতো মণ্টুদা—সেইরকম জালের মতন হয়ে যাচ্ছে শিকড়গুলো! শেকড়ের একটা বিরাট জাল দেখছে সন্তু, ওইটা কি হাত, আর ওইটা বোধহয় তার পা—হাত পা ছড়িয়ে এগিয়ে আসছে। মাথা নেই, চোখ নেই, শরীর নেই—শুধু লম্বা রোগা কঙ্কালের হাত-পায়ের মতন শেকড়।

বড় পুকুরের পাড়ে ছোট্ট মাচার ওপর বসে থাকতো অসীম সরকার, কপালে বুকে নারকোল ভাঙতো—যৌবনে সে বিখ্যাত ডাকাত ছিল। চোখ দুটো মড়ার মত ঠাণ্ডা আর লাল, সব সময় আফিম খেয়ে থাকতো। বুলা আঁটপুর থেকে চলে যাবার পর বিকেল বেলা খেলার মাঠে আর যেতো না সন্তু—একা একা ঘুরতে ঘুরতে একদিন জলের ধারে মাচার ওপর—

অসীম সরকারকে দেখে সন্তু দাঁড়িয়ে পড়েছিল, দীঘির কালো জল, শালুক ফুল, হাঁস আর বিকেলবেলার আকাশের দিকে লাল চোখে চুপ করে চেয়ে ছিল অসীম সরকার। কি ভেবে সন্তু তার কাছে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। অসীম সরকার তার ঘোলাটে চোখে সন্তুর দিকে তাকাতেই চোখ বুজে ফেলেছিল সন্তু। চোখ বুজেই সন্তু পরিষ্কার দেখেছিল—গন্ধমাদন পর্বত হাতে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে হনুমান। মাস্টারমশাই পড়তে এলে বাড়িতে ক্যালেণ্ডারের ওই ছবিটার দিকে তাকিয়ে পড়া বলতো সন্তু। অসীম সরকার পাহাড়ের মতন ভারী গলায় বলেছিল 'ভয় পাস কেন এত? তোরও তো হাত আছে। পা আছে। সোজা দাঁড়িয়ে থাকবি। মাথা নোয়াবি না। মা ছাড়া কারো কাছে মাথা নোয়াতে নেই।'

পাতলা কঞ্চিকে হাতে নিয়ে বেঁকিয়ে দিলে যেরকম বেঁকে যায়, সেইরকম বেঁকে যেতে যেতে বারান্দা থেকে ঘরে এসে নীচু তক্তপোষের ওপর বসে পড়লো মা। ডানদিকের কোমরে একটা হাত রেখে মা ক্রমশ পিছন দিকে হেলে যাচ্ছিল। এলোমেলো গোঙানির মধ্যে থেকে, সন্তু যখন রাগ দুঃখ আর অসহায়তার চোখে মায়ের দিকে চেয়ে আছে—মা বলল, রিকশা ডাক সন্তু, রিকশা। জামাটা হাতে তুলে নিয়ে গায়ে না গলিয়েই সন্তু দৌড়ে রিকশা ডাকতে চলে গেল। গলির ভেতরে রিকশা আসে না। কোথায় যেতে হবে সন্তু তাও জানে না। তবু 'হাসপাতালে' বলে রিকশা পেয়ে গেল চট করে। গলির মুখে দাঁড় করিয়ে রেখে আবার ছুটে ঘরে এল সে। মা ইতিমধ্যে অন্য একটা কাপড় পড়ে ফেলেছে। দরজাটা ধরে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে, যন্ত্রণা সামলাবার চেষ্টা করতে করতে, সন্তুর কাঁধে একটা হাত রেখে মা বলল—চল্। সিঁড়ির কাছটা অন্ধকার মতন, সেখান দিয়ে সাবধানে নেমে পিছল কলতলা, খুব সতর্কতার সঙ্গে সন্তু মাকে ধরে ধরে নিয়ে গেল। গলি দিয়ে যেতে যেতে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল

সন্তুর। সবাই কিরকম চোখে যেন তাকিয়ে আছে। ব্যথার জন্যে মায়ের সে সব খেয়াল নেই। শুধু ক্রমাগত ছোট ছোট যন্ত্রণাকাতর শব্দ বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে।

এখান থেকে খুব কাছেই দর্জিপাড়া মেয়ে হাসপাতাল। রিকশায় সন্তু খুব শক্ত করে মাকে ধরেছিল। হাতে টান। কলকাতার রিকশা সন্তুর একদম ভালো লাগে না।

মেয়ে হাসপাতালে পয়সা লাগে না। সন্তু কাছাকাছি গিয়ে একবার শুধু বলে ছিল, যদি জায়গা না থাকে? ভেঙে নুয়ে যেতে যেতে মা কোন রকমে বলল—জানি না, আমি কিছু জানি না। সন্তুর মনে পড়ল বাবাকে যখন সকালবেলা মা খুব যা-তা বলছিল—বাবাও তখন এইরকম করে বলে ছিল, 'জানি না, জানি না'। বগলে ক্রাচ নিয়ে পা ঘষতে ঘষতে কোথায় যেন চলে গেছে। বাবাকে তখন কেমন বোকা; আর রাগী মানুষের মতন দেখাচ্ছিল। মাকে একদম সেরকম দেখাচ্ছে না। মায়ের এখন ঠিক কতটা কষ্ট হচ্ছে খুব বুঝতে চাইছিল সন্তু। কিন্তু একদম বুঝতে পারছিল না বলে নিজের ওপর রেগে উঠেছিল ক্রমশ।

বাবা কিন্তু এরকম ছিল না। সন্তু তো ভালোইবাসতো বাবাকে। কি করে যে কি-সব হয়ে গেল—দোকানটা বিক্রি হয়ে গেল, এগারো মাস বিছানায় শুয়ে রইল বাবা, বাতের ব্যামো সহজে নাকি সারে না। একবার সারে তো কিছুদিন পরে আবার হয়। তখন বাবা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ইচ্ছে করে নোংরা করতো সব—মায়ের দিকে একদিন থুক থুক করে থুথু ছুঁড়ে মেরেছিল। বলেছিল, আমি মরে গেলে তুই আমার মাংস খাবি, আমি জানি। থুথু খা—তুই আমার থুথু খা। একটু যখন ভালো হয়ে উঠছে, কি একটা কবিরাজি তেল মালিশ করতো পায়ে, কেউ মালিশ করে দিত না বলে, ডাকলে কেউ সাড়া দিত না বলে, সে কি রাগ বাবার। কাশ্মীর থেকে কিনে আনা একটা সুন্দর খুব লম্বা মাফলার বাবা

তার কবিরাজি তেল মাখানো হাঁটুতে জড়িয়ে জড়িয়ে বেধেছিল বলে মায়ের সে কি রাগ। বাবা নাকি ছেলে মেয়ের জন্যে সংসারের জন্যে কোনদিন কিছু করেনি—শুধু নষ্ট করেছে! সন্তুর মনে হ'ত, বাবা যে এতদিন এত এত টাকা রোজগার করেছে। পূজোর সময় কত জামা কিনে দিয়েছে, রবিবারে সিনেমা দেখিয়েছে, কত জায়গায় বেড়াতে নিয়ে গেছে—মা সেসব ভুলে গেল কি করে।

বাবার কাছে কেউ কিছু চাইলে বাবা এক কথায় সব দিয়ে দিত—সন্তু দেখেছে দিতে না পারলে বাবার একটা কষ্ট হতো কি রকম। গলির মুখে একটা ইস্কুল আছে সেই ইস্কুলের একজন বুড়ো মাস্টারমশাই বাবার সঙ্গে গল্প করতে আসতো। তাকে দেখতে ছিল একদম রবীন্দ্রনাথের মত। সন্তু চেয়ে থাকতো হাঁ করে শাদা চুল, শাদা গোঁফদাড়ি—বুক অব্দি ঝুলে আছে, আর কি শান্ত নরম দুটো চোখ। সন্তু খুব বেলায় ঘুম থেকে উঠতো বলে সেই মাস্টারমশাই তাকে একবার বলেছিল—ভোরবেলাটা সারাদিনের মধ্যে সব থেকে বেশী দামী, জানো? তুমি ঘুমিয়ে থাকো বলে সেটা বুঝতে পারো না। এরকম কথা সন্তুকে কমবেশী সবাই বলে কিন্তু গা করে না সন্তু। কিন্তু এই মাষ্টারমশাইয়ের মুখে শুনে খুব লজ্জা পেয়েছিল সে। বোধহয় তাঁর শাদা গোঁফদাড়ির জন্যে....। সেই মাষ্টারমশাইকে বাবা একবার একটা বিস্কুট রঙের চাদর দিয়ে দিয়েছিল। সাত দিনও হয় নি সেটা কিনে এনেছিল বাবা আর রঙটা খুব পছন্দ হয়েছিল বলে সন্তুই সেটা গায়ে দিত বেশী।

বোধহয় অকারণে মানুষের উপকার করার এত ঝোঁক ছিল বলেই দোকানটা বাবা রাখতে পারল না। 'দিলীপ, দোকানটা বন্ধ করে দিস' বলে দিলীপকাকা আর বেচোকাকার হাতে দোকান ছেড়ে দিয়ে বাবা নাইট শো-য়ে সিনেমা চলে যেত। কর্মচারীর হাতে কেউ দোকান ছেড়ে দেয়? এখন বেচোকাকা দিলীপকাকা দুজনেই আঁটপুরে কি সুন্দর বাড়ি

করেছে। একবার সারা রাত গানের ফাংশান শুনে এসে বাবার শখ হয়েছিল গান শিখবে। সত্যি সত্যি বিখ্যাত একজন গায়কের বাড়ি গিয়ে গান শেখা শুরু করে দিয়েছিল বাবা আর একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড হারমোনিয়াম কিনে এনেছিল। বাবা যখন হারমোনিয়াম বাজাতো সন্তুরা তখন বাবাকে ঘিরে বসে থাকতো। পরে অবশ্য লুকিয়ে লুকিয়ে মা বেচে দিয়েছিলো হারমোনিয়ামটা। তারপরে—। সে এক বিরাট ঝামেলা। থাক্‌গে।

মামার বাড়িতে ছোটমামা সারাদিন বাড়িতে বসে বসে উকিলের কাগজপত্র টাইপ করে। মেশিনের ওপর ছোটমামা ঝড়ের বেগে আঙুল বুলিয়ে যাচছে আর শাদা কাগজ বড় বড় করে টাইপ হয়ে যাচছে—সেই দেখে বাবার ইচছে হল টাইপ শিখবে। দোকান ছেড়ে রোজ সন্ধ্যেবেলা বাবা টাইপ ইস্কুলে যেতো। কিছুদিন পরেই ছেড়ে দিয়েছিল অবশ্য।

বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে বাতে ভুগে ভুগে বাবা কিরকম যেন হয়ে যাচ্ছিল। কেউ বাবার কথা শুনতো না। মাকে কিছু বললে মা তো কাঁই কাঁই করে রেগে উঠতো। অথচ নিজের কাজটা বাবা কোনদিনই নিজে করে নিতে পারে না। চান করার সময় গামছা খুঁজে পায় না কোনদিন। চুল আঁচড়াবার সময় চিরুনি! কেউ কথা শোনে না বলে বাবা কিন্তু রেগে যেতো না খুব একটা। দুঃখ করতো, কাকুতিমিনতি করতো। রাগ দেখিয়ে কাজ আদায় করার চেয়ে কাকুতিমিনতি করে কাজ আদায় করতে বাবা ভালোবাসতো বেশী। তারপর একদিন—

না। সন্তু সেই দৃশ্যের কথা ভাববে না।

রাগ হয় নি তার। দুঃখও হয় নি। কোনদিন জলপ্রপাত দেখেনি সন্তু। তার শব্দও শোনে নি। অথচ মনে হয়েছিল মাথার মধ্যে সেরকম শব্দ হচ্ছে। খুব মনে পড়েছিল দুখিরামকে, এই সত্যি কথাটা বলার জন্যে তাকে একদিন খুব মেরেছিল সন্তু। রাগে, লজ্জায়, অপমানে। আর,

তখন সে খুব ছোট ছিল।

আর মনে হয়েছিল, যদি. যদি কোনদিন আবার কোথাও কখনো বুল-বুলের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়, যদি বুলবুল শোনে তার সব কথা, যদি বুলা সারা জীবন তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে—তাহলে, কোনদিনও সন্তু বুল-বুলের সঙ্গে এইভাবে ওইসব করবে না। কোনদিন না।

আর তখন হঠাৎ সন্তুর মনে হয়েছিল, বাবা বোধহয় মায়ের ওপর দুনিয়ার ওপর প্রাণপণে প্রতিশোধ নিচ্ছে। অসুখে ভোগার দেড় বছরের উপেক্ষা আর অপমানের প্রতিশোধ। আর, কি নিষ্ঠুরের মতন দেখাচ্ছিল বাবাকে। তখন।

না। সন্তু সেইসব আর ভাববে না।

হাসপাতালে বেঞ্চির ওপর বসে মা কুঁকড়ে যাচছিল, শাদা কাপড়-পরা একজন মাঝ বয়সী মহিলা সন্তুকে জিগ্যেস করে নাম-ঠিকানা লিখে নিচছিল খাতায়। লিখতে লিখতে 'ডেট?' বলে মহিলাটি নিরুত্তরে সন্তুর দিকে তাকিয়েই অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—'ও'। তারপর মায়ের দিকে তাকাতেই যা বিড়বিড করে কি যেন বললো। সন্তুর কান লাল হয়ে উঠলো আর হঠাৎ বাবার ওপর খুব রাগ হল তার। এই সময় কি বাবার থাকা খুব দরকার ছিল না মায়ের কাছে? বাবাকে হাতের কাছে পেলে সন্তু এখন··।

মাকে ভেতরে নিয়ে যাবার পর সন্তু বাইরের দিকে রাস্তার ধারে একটা ঘরে বসে রইলো অনেকক্ষণ। বেলা গড়িয়ে এসেছে অনেক। জানলা দিয়ে রোদ পড়েছে ঘরের মেঝেতে। একটা লোক বসে বসে মন দিয়ে সিগারেট খাচ্ছিলো জানলা দিয়ে ঢুকে পড়া রোদ্দুরের মধ্যে ধোঁয়া ছাড়লো এক মুখ। রোদ্দুরের মধ্যে ধোঁয়ার রঙ কিরকম নীল হয়ে গেল।

দেয়ালে হেলান দিয়ে বেঞ্চিতে বসে থাকতে থাকতে বোধহয় ঘুমিয়ে

পড়েছিল সন্তু। শাদা শাড়ি পরা সেই বিধবা মহিলাটি তাকে ঠেলা দিয়ে ডেকে তুললেন। কতক্ষণ কেটে গেছে কে জানে। ঘরে এখন অনেক বেশী রোদ দেখে সন্তুর মনে হল অনেক দুপুর হয়ে গেছে। সেই মহিলা হাসি হাসি মুখে সন্তুকে বললেন—যাও, তোমার মাসি-পিসিদের খবর দাও, সঙ্গে তো কেউ আসে নি, তোমার বোন হয়েছে—

সন্তু ছুটে মায়ের কাছে যেতে চাইছিল। মহিলাটি তাকে যেতে দিলেন না; ছেলেদের নাকি এখন যেতে নেই। সে মেয়ে নয় বলে সন্তুর খুব দুঃখ হল একবার। মা ভালো আছে শুনে আশ্বস্ত হল একটু। দৌড়ে বেরিয়ে এল সেখান থেকে। মামার বাড়ি যাওয়ার দরকার আগে।

বাইরে, রাস্তায়, ঝাঁ-ঝাঁ রোদ। এই প্রথম সন্তুর মনে পড়ল সকাল থেকে খাওয়া হয়নি কিছুই। খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে পেট।

হন হন করে হাঁটতে যাচ্ছিল সন্তু। হঠাৎ কাঁধের কাছটা খামচে ধরল একটা মোটা হাত। ঘাড় ঘুরিয়ে সন্তু দেখল,—ময়লা ফতুয়া, নোংরা হলদে হয়ে যাওয়া পাজামা, বগলে ক্রাচ, ঘামে জ্যাবজ্যাব করছে মুখ কয়দিনের না-আঁচড়ানো চুল, চোখে গভীর উৎকণ্ঠা—বাবা তাকে বলছে, 'কি হলরে, সন্তু? ভাই না বোন? মা ভালো আছে?

## ধারে হয় না

ঘুম ভাঙতেই অনুতোষ অন্যান্য দিনের মত হাত বাড়িয়ে মেয়েকে কাছে টানতে গিয়ে দেখল, বিছানায় কেউ নেই। চোখ খুলে ভালো করে তাকাতেই মনে পড়ল—কাল মুনিয়াকে সে মায়ের কাছে রেখে এসেছে নিজেই। মায়েরও তো নিজের নাতনিকে কাছে পাওয়া মাঝে মাঝে দরকার। দীপার সঙ্গে কথা না বললেও দীপার কচি মেয়েটা তো কোনো দোষ করেনি। আর তাছাড়া—অনুতোষ হাই তুলে অদ্ভুত বিকৃতভাবে হাসল তার কালো শিম্পাঞ্জির মতন মুখে এই হাই-হাসি কেমন মানাচ্ছে অনুতোষ জানে—আসলে, আজ বোধহয় ছাব্বিশ বা সাতাশ তারিখ এই শেষ চার পাঁচ দিন মুনিয়া কাছে না থাকলে, তাকে ধার করতে হবে কম!

দীপা কোথায়? ভাবতে ভাবতে অনুতোষ উঠে পড়ল। দেয়ালের দিকে অত্যন্ত অগোছালো আলনা, ঘরের মেঝেয় পুরু ধুলো—বিছানাটা সারাদিন পাট না করাই পড়ে থাকবে অনুতোষ জানে, ঘরে কোন আলমারি নেই. চেয়ার টেবিল তো নেইই; তাতে এমন কিছু ক্ষতিও হচ্ছে না অনুতোষের—আসলে দেড়খানা ঘরের এই ছোট ফ্ল্যাটটা দেবাশিসের, বিয়ের পর দেবাশিস এখানে থাকবে, যতদিন বিয়েটা না হচ্ছে ততদিন অনুতোষ নামমাত্র ভাড়ায়, যেহেতু সে দেবাশিসের দীর্ঘদিনের বন্ধু, এখানে থাকতে পারে; এবং যে কোনোদিন দেবাশিস বললেই এটা ছেড়ে দিতে হবে সঙ্গে সঙ্গে, তাই বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে থাকার কোনো মানেই হয় না, সাধারণতঃ মানুষ যেভাবে থাকে আর কি, কি দরকার—অনুতোষ বলেছিল

দীপাকে। কিন্তু, দীপা কোথায় ?

ছোট যে ফাটা আয়নাটা দেয়ালে ঝুলছে, ঘুম থেকে উঠেই তার সামনে দাঁড়ালে, অন্তত দু-এক মিনিটের জন্যে হলেও রোজ একটু দাঁড়ানো—অনুতোষের অভ্যাস, বা দিনের প্রথম কাজ বলা যেতে পারে। ঘুম ভাঙার পর এই ফাটা আয়নায় নিজের শিম্পাঞ্জি মুখটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বেঁকিয়ে চুরিয়ে যখন দেখে অনুতোষ—দীপা বলতো, আহা, এমনটি আর কে আছে। দীপার থিওরি—পৃথিবীর সব মানুষই আয়নার সামনে দাঁড়ালে এই কথাটাই ভাবে—এমনটি আর কে আছে! তা সে তাকে যেমনই দেখতে হোক। অনুতোষ আসলে রোজ সকালে দিন শুরু করার আগে নিজেকে একটু মেপে নেয়-কেমন দেখাচ্ছে তাকে, এই ম্যাড উইকে । ম্যাড উইক···· মাই মান্থস্ আর ডিভাইডেড ইনটু ফোর উইক্স্—গুড, ব্যাড, স্যাড অ্যাণ্ড ম্যাড উইক। এটা অনুতোষের থিওরি। আর আয়নাটা যেদিন খেলা করতে করতে প্রথম ফাটিয়ে ফেলল মুনিয়া, বাবা, বাবা, দেখো দুটো আমি, ভেঙে যাচ্ছি আমি, দেখো বাবা, দেখো না—সে কি উল্লাস। যার পর···আয়না ভেঙে গেলে মানুষও তাহলে ভেঙে যায়—এটা কি মুনিয়ার থিওরি ? আঃ, মুনিয়া, আজ ভোরে বাপীর সঙ্গে বেড়ু বেড়ু হল না তো! অবশ্য কাকুরা, পিসিরা তোকে বাপীর কথা ভাবতেই দেবে না। তোর মা কোথায় গেল বল তো মুন্নি ? বাথরুমে তো কোন শব্দ হচ্ছে না! তবে কি এই সাত সকালে দীপা কোথাও বেরুলো ? ওহ দীপা—। তোমার জন্যে ভাই বোন মা-বাবাকে ছেড়ে এই যাযাবর জীবন····তবু সকালে উঠেই আমাকে··· ঘুম থেকে ওঠবার সুযোগটুকুও না দিয়ে কোথায় চলে গেলে বলো তো····। এখন এক কাপ চা খেতে গেলেও হয় নিজেকে স্টোভ ধরাতে হবে নয়তো মোড়ে গিয়ে বড়ুয়ার দোকানে····। আপাতত সেটাই অনেক সহজে মনে হল অনুতোষের। হে বাঙালি, চা খাও, কেরানী হও তুমি—ইংরেজের শেখানো এই জীবনবেদের নির্ভুল উল্লেখ অনুতোষ বক্সী—লুঙ্গির ওপর

পাঞ্জাবিটা চাপিয়ে মুখেচোখে অল্প জল দিল, বাইরে এসে একবার চাবি দেবার কথাও ভাবল, তারপর ভাবল—ধুর, কি আর চুরি হবে, ভুল করে কোনো চোর যদি ঢুকেও পড়ে তাহলে হয়তো লজ্জায় ঘুমিয়ে পড়বে সে আমার বিছানায়, এতটা ভাবতে পেরে আবার একটু হাসল অনুতোষ নিজের মনে, দরজায় আলতো করে পরস্ত্রীকে টিপ পরিয়ে দেবার ভঙ্গিতে ছিটকিনি লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল। উদ্দেশ্য—দীপাসন্ধান, আসলে, একটু চা খাওয়া।

কিন্তু এই সকালবেলা দীপা গেল কোথায়? বাজারে যায়নি; বাজারে যাবার মত টাকা নেই ওর কাছে। শোবার আগে দীপা বলেওছিল—কালকের চিন্তা আজ করে রাখার অভ্যেস আজও তোমার হল না। অনুতোষ একটা লম্বা হাই তুলে ভূতের মুখে রাম নাম, বলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। দীপার বেহিসেবী মন অনুতোষকে প্রভাবিত করে বেশী না অনুতোষের দায়িত্ববোধহীনতা দীপাকে···সে হিসেবও বোধহয় কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকেই মানাবে। অনুতোষের মনে পড়ল, গতকাল অফিসে সে অনেক জনের কাছ থেকে এক টাকা দুটাকা করে অন্তত গোটা দশেক টাকা জোগাড়ের আপ্রাণ চেষ্টা করেছে; এক দুটাকার বেশী কেউই দিতে চাইবে না এই মাসের শেষে, সে জানতো। কিন্তু হায়, উল্টে কয়েকজন তাদের পুরনো পাওনার তাগাদা করেছে তার কাছে—কবে দিচ্ছো, বা ও ব্যাপারটা ভুলে যাওনি তো, খুব অসুবিধেয় আছি ভাই···শালা। কেউ হয়তো বেশী নয় চার টাকা পাবে কেউ দশ-এগারো; তাতেই এমন একটা ভাব করে। যেন এই সামান্য টাকাটার জন্যে তাদের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে—দেখা হলে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায় যেন অনুতোষের সংগে কথা বললেই সে টাকা চেয়ে বসবে। বড় পাওনাদাররা আসে মাইনের দিনে—অন্যদিন আসতে বলে নিজেই কেটে পড়তো, সে কায়দাটা আজকাল একদম জানাজানি হয়ে গেছে ···মুশকিল। মাইনের দিনে সবাইকে কিছু কিছু করে দিয়ে, যার জন্যে

এত কথা বলতে হয় অনুতোষকে—যেসব কথা বলার জন্যে কোনওরকম সাড় থাকে না নিজের মধ্যে, একটা রাগ গুমরে ওঠে বুকের ভেতর, মানুষ কেন খুন করে যেন টের পায় সেইসব সময়ে, অনুতোষ, বাড়ি ফিরলে টাকার অংকটা দেখে দীপা খিলখিল করে হাসে—তোমার বিয়ে করা উচিত হয়নি। অনুতোষের আবার রাগ হয়। তোমার জন্যেই তো···চিৎকার করে উঠতে গিয়েও চেপে যায়, কি হবে, মনে পড়ে—সে তো বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমান মানুষেরা চিৎকার করে না, কৌশল করে তাকে যে শেষ পর্যন্ত জিততে হবে। যার ধার নেই, যে সৎ, যার শত্রু নেই, যে মিথ্যা বলতে পারে না, সে তো গাছ। বোকার মত দাপিয়ে বেঁচে থাকার চে বুদ্ধিমানের মত পালিয়ে বেঁচে থাকায় মজা বেশি, অনুতোষ কাউকে বোঝাতে পারে না। বাইরে বেরুলেই দীপার মিনি কিংবা ট্যাক্সি চাই, সপ্তায় দুটো নাইট শো, ইন্টারভ্যালে আইসক্রীম যার দাম মিনিমাম পাঁচ টাকা; অথচ অনুতোষ দশ পয়সার বিড়ি কেনার আগে ভাবে সিগারেট তো চেয়েচিন্তেই জুটে যায়, এ ব্যাপারে অনুতোষ নিপুণ শিল্পী। অফিসে কেউ সিগারেট ধরালেই অনু-তোষ তার কাছে গিয়ে জাঁ লুক গদার বা ডায়ালেকটিকাল মেটেরিয়ালিজ্‌ম্ বা হার্ট অ্যাটাক বা জিনিসের দাম বা নির্বাচন রাজনীতি, লোক বুঝে শুরু করে দেয়। অর্ধেক খাওয়া হলে অনুতোষ এমন অন্তরঙ্গভাবে হাতটা বাড়িয়ে দেবে··· আলোচনাটা জমাতে পারলে কিংবা যারা নিজেদের এঁটো সিগারেট অন্যদের দিতে ভালোবাসে না—ড্রয়ার টেনে প্যাকেট থেকে পুরো সিগা-রেটই অনুতোষকে দিয়ে দেবে··· যেন অনেক আগেই অনুতোষকে সিগারেট অফার করা তার উচিত ছিল।

এ জায়গাটার নাম নেতাজী কলোনী কেন হল, নেহরু কলোনী বা গান্ধীনগর হল না কেন—এ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই · ভাবতে ভাবতে অনুতোষ পাঞ্জাবীর পকেটে কয়েকটা খুচরো পয়সা পেয়ে গেল। আহ্, অন্ততঃ বিড়ি ফিরি খাওয়া যাবে দু-একটা। মোড়ের দোকান থেকে

বিড়ি কিনে দিনের প্রথম বিড়িটা ধরিয়ে একটা টান দিতেই মনে হল — বেঁচে থাকা খুব ভালো। তারপরই অনুতোষ দেখতে পেল—বড়দার চা-য়ের দোকান থেকে নীলু ডাকছে, টেবিলে বাজারের থলে রেখে হাতের খবরের কাগজটা নামিয়ে এই সকালে অনুতোষকে দেখতে পেয়ে সে যে খুশি, তা তার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়। অনুতোষ ভাবলো, ঈশ্বর আছেন। দোকানে ঢুকেই অনুতোষ দেখল, দেয়ালে লেখা—ধারে হয় না। অনুতোষ মনে মনে শয়তানের মতন হাসলো।

২

একটা ঠোঙার মধ্যে নীলুর বাজার থেকে চেয়ে নেওয়া কিছু আলু, কিছু পটল ইত্যাদি নিয়ে বাড়ি ফিরে অনুতোষ দেখল, দীপা ভাত চাপিয়ে দিয়েছে, তরকারি শেষ, এমন কি, মাছ কুটছে। প্লাস্টীকের ছোট চাঙাড়ি যেটায় বাজার থাকে, সেখানে ঠোঙা থেকে কষ্টার্জিত বিনি পয়সার সাবু-গুলো ঢালতে ঢালতে অনুতোষ বলল – নীলুর বাড়ির সামনে একটা পুকুর আছে না, সেখানে একটা পিকিউলিয়ার পাগল দেখলাম। যেন অনুতোষ জানে, দীপা বাড়ি গিয়েছিল, মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে শ্যামবাজার থেকে জিনিস কিনে যে রান্না চাপিয়েছে, এ ব্যাপারে কথা বলার কোনো মানে হয় না। অনুতোষের ঢালা বাজার দেখতে দেখতে দীপা বলল—কিরকম ? অনুতোষ বলল, নীলুদের বাড়ির পাশে একটা নতুন বাড়ি হচ্ছে। ইঁট ঢালা ছিল অনেক। পাগলটা একটার পর একটা ইঁট পুকুরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল, জানো তো। আর বিড় বিড় বিড় বিড় করে এন্তার গালাগাল দিচ্ছিল। বেশ ভিড় জমে গেছে। তা যার বাড়ি সে জানতে পেরে ছুটে এসে যখন পাগলটাকে ধমক লাগাল, পাগলটা কি বলল জানো ? দীপা কুকারের একটা ভোঁ থামার সময় দিয়ে বলল—কি। অনুতোষ একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল—একটুও না ঘাবড়িয়ে পাগলটা যার বাড়ি তাকে উল্টে ধমকাতে শুরু করল। আকাশের দিকে হাত তুলে বলল—সূর্য,

তোর? লোকটা অবাক হয়ে বিরক্ত মুখ করে বলল, সূর্য আবার আমার হতে যাবে কেন? তারপর পাগলটা পুকুরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—জল তোর? লোকটা বলল—না, কেন? পাগলাটা বলল—মাটি তোর? লোকটা এবার খেপে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল—মাটি তোর বাপের শালা, কেন, কি হয়েছে কি? তা পাগলটা না, আরো জোরে চেঁচিয়ে কি বলল জানো? অনুতোষ থেমে আছে দেখে দীপা বলল—কি বলল বলবে তো। অনুতোষ বিড়িটা ফুক ফুক করে টেনে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে বলল—এই লোক যদি পাগল হয় তাহলে কে সুস্থ - কি বলল জানো, বলল—সূর্য তোর না, জল তোর না, মাটি তোর না, আর এইসব জিনিস দিয়ে তৈরী এই ইঁটগুলো তোর? শালা, হারামি···অনুতোষ বাথরুমে ঢুকে জল ঢালতে ঢালতে শুনতে পেল—দীপা তখনো হাসছে। কুকারের ভোঁ, দীপার হাসি, পাগলটার যুক্তি, এসবের মধ্যে অনুতোষ নিজের মাথায় জল ঢালতে লাগল।

৩

অফিসের পথে বাসে যেতে যেতে, রোজ খানিকটা রাজনীতি হয়। অনুতোষ সেসব মন দিয়ে শোনে। নিজে কোনদিন কিছুই বলে না। অফিসে গিয়ে বন্ধুদের কাছে বলে। অনুতোষ শোনে—আজকাল রাজনীতির মধ্যে অনেক নোংরামি ঢুকে গেছে। দু-হাজার সালের মধ্যে পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলো সব ধ্বংস হয়ে যাবে—কোন জ্যোতিষী বলেছে। নাতির আমলে বোধহয় পাতাল রেল চললেও চলতে পারে। পাতাল রেল চালু হলে এল আই সির এজেন্টদের সুসময় আসবে। নকশালরা আবার পুলিশ খুন করছে, পুতুল বানিয়ে খুন করলেই পারে। আমার জামাইয়ের ব্যাংক-ডাকাত বন্ধু আছে। মডার্ন ইকনমিতে বলে—ডেফিসিট অ্যাকাউন্ট ছাড়া উপায় নেই। কলকাতায় ট্রাফিক প্রবলেম। ইমার্জেন্সি অনেক ভালো ছিল। সাধুদের দেশটা চোরের দেশ হয়ে গেল

কি করে। থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হবেই। ভারত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। মিলিটারি শাসন ছাড়া বাঁচার রাস্তা নেই। কুকুর পচা গরম পড়েছে। ইত্যাদি শুনতে শুনতে অনুতোষ অফিসে পৌঁছে যায়।

অফিসে মোটামুটি তিন রকম মানুষ আছে। একদল সব সময় খেলা নিয়ে কথা বলে। একদল সব সময় রাজনীতি নিয়ে কথা বলে। তৃতীয় দলের লোকেরা কোনকিছু নিয়েই কথা বলে না, সব সময় নিজের ধান্দায় থাকে। অনুতোষ এদের সবাইকে নিজের পছন্দমতন মোট দুভাগে ভাগ করেছে—একদল, যারা তাকে ধার দিতে অরাজী নয়; অন্যদল—যারা তাকে জীবনে কোনদিন ধার দেবে না। দ্বিতীয় দলের লোকজনদের সঙ্গে অনুতোষ একদম সময় নষ্ট করে না। কি দরকার। সুবিধে না দেখলে পৃথিবীর কোনো পিঁপড়েও এক পা নড়ে না। অবশ্য, লোকে যেটা বোঝে না, সেটা হল—অসুবিধেটাও এক ধরনের সুবিধে। আগে শুধু একটা 'অ' আছে। নিজের অসুবিধে করেও যারা অন্যের সুবিধে করে দেয়, তাদের কাছে এই অ-টার বিশেষ তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। এই আর কি। ব্যাপারটা সুফলকে বললে, সুফল বেশ মজা করে বলেছিল—অ। বুঝেছি।

টিফিনে সুফলকেই ধরল অনুতোষ। সুফল পরিষ্কার বলে দিল—জানো তো আমি বাস ভাড়া আর টিফিনের বাক্স নিয়ে অফিসে আসি। সিগারেট খাই না। চা খাই না। ধার করি-ও না। ধার দিইও না। অনুতোষ বিরক্ত হল না। বলল—সন্ধ্যেবেলা তোমার বাড়ি যাবো। বৌ তো চাকরি করে তোমার। বেশি নয়, দশটা টাকা···। সুফল বলল - সরি। অথচ এতক্ষণ যা নিয়ে কথা হচ্ছিল—সুফলের ছোট কাকিমা, কোন গ্রামে থাকে, অনেকগুলো ছেলে মেয়ে ভালো করে খেতে পর্যন্ত পায় না, বাড়িতে এসে মাকে বলেছে—আর কিছু না, অন্তত দুটি ভালো করে খেতে চাই বৌদি। তারপর যথারীতি··· টাকাটা আসলে কয়েকজন লিমিটেড লোকের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে—সিস্টেমটা না পাল্টালে··· অনুতোষ জানে এসব

কথার মধ্যে তার কোনো ভূমিকা নেই। সে শুধু মাইনে পাবার আগে যে করে হোক সামান্য কয়েকটা টাকা চায়। অনুতোষ মরিয়া হয়ে বলল—সুফল, এই যে তুমি শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছ, মাটির তলার জল টিউবওয়েল থেকে তুলে খেয়ে এলে—প্রকৃতির রাজ্য থেকে এসব অনুগ্রহ নেওয়া মানে আসলে ওই ধার নেওয়াই, এমনকি তোমার আত্মাটাও তোমার না, তোমার জন্মের আগে অন্য লোকের ছিল, মৃত্যুর পরে অন্যের কাছে চলে যাবে—বলা যায়, এক রকম ধারেই তুমি বেঁচে আছো কিন্তু। সুফল বলল—সন্ধ্যেবেলা তুমি আমার বাড়ি যেতে পারো, গান শোনাবো, আড্ডা দেবো, কিন্তু ধার দিতে পারবোনা। থ্যাকারে আর ডিকেন্সের তফাৎ কোথায় জানো? দারিদ্র বলতে থ্যাকারে বুঝতেন ধার বাড়িয়ে যাওয়া, আর ডিকেন্স বুঝতেন, না খেয়ে থাকা। ডিকেন্সকে লোকে মনে রেখেছে। থ্যাকারেকে শুধু পরীক্ষার আগে ছাত্র ছাত্রীরা···। দুঃখী মানুষের বিরক্ত হতে নেই বলে অনুতোষ বিরক্ত হল না। হাত থেকে ঘড়িটা খুলে নিয়ে বলল—দরকার হলে তুমি এটা রাখতে পারো সুফল। সুফল বলল, শুনেছি শেক্সপীয়র বন্ধকী কারবার করতেন গোপনে। আমি সামান্য সুফল সেন, আমাকে মাপ করো ভাই। কাজের কথা বলো তো—তোমার এখন টোটাল ধার কত? অনুতোষ বলল—হাজার পাঁচেক। লোকে পরিশ্রম করে লাখপতি হয়, ধারটা এক লাখে নিয়ে গিয়ে আমি ধারে লাখপতি হতে চাই, বুঝলে? এবার দুজনেই হাসলো মন খুলে। উঠে আসতে আসতে অনুতোষ বলল—বাইরে এমন সুকুমার মোলায়েম চেহারা হলেও ভেতরে তুমি এমন কঠিন মানুষ আমি জানতুম না সুফল। তুমি অনেক কিছুই জানো না—সুফলের অস্ফুটে বলা এই কথাটা অনুতোষ ভালো করে শুনতে পেল না।

ধারের ফাঁদ পাতা ভুবনে···গুনগুন করতে করতে অনুতোষ সেকশনে গেল। তিনটের পর থেকেই অফিসের মহিলারা বাসের ভিড় নামক বাঘের ভয়ে ত্রস্তা হরিণীর মত টুক টুক করে পালাতে থাকে। অনুতোষের

সেকশনে এক মধ্যবয়স্কা অবিবাহিতা ছোটোখাটো মহিলা আছে, প্রতিমা দত্ত, তার কাছে চাইবে নাকি····। অনুতোষ কাজের ভান করতে করতে প্রতিমার দিকে তাকালো ভালো করে। থাকলে দিয়ে দেবে বলেই মনে হয়, কিন্তু না থাকলে দুঃখিত হবে খুব। না, না চাওয়াই ভালো। ভিখিরিদেরও এক ধরনের আত্মসম্মান বোধ থাকে। অনুতোষ দেখেছে।

৪

আসতে না আসতেই তোর মেয়ে আমার দুটো কাপ ভেঙেছে—কিনে দিবি। মায়ের অনুযোগ শুনে মুনিয়াকে কোল থেকে নামিয়ে দিল অনুতোষ—যাও, তোমার সঙ্গে আড়ি, আড়ি, আড়ি। মুনিয়া ঘরের কোণে গিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। বকুনি খেলেই মুনিয়া এভাবে ঘরের কোণে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। মুনিয়ার ছোট পিসি এসে তাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল। ঘরের ভেতর থেকে অনুতোষ শুনতে পেল—বাইরে বারান্দায় বসে মুনিয়ার ছোট পিসি তাকে এন্তার হামি খাচ্ছে। মুনিয়া বলছে—হামি খেলে কেন, বিস্কুট দাও।

হঠাৎ গাটা কেমন গুলিয়ে উঠলো অনুতোষের। চারপাশের দেয়ালগুলো বনবন করে ঘুরছে কেন। আহ্.. কি অন্ধকার।

## লালইমলির শ্যামবাজার

লালইমলিকে প্রথম শ্যামবাজার চিনিয়েছিল দাদু। এইখান থেকে তুমি পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যেতে পারো—এক কুয়াশাময় শীতের ভোরবেলা, লালইমলি তখন খুব ছোট, মাথায় লাল উলের টুপি, গায়ে লাল ফুলহাতা সোয়েটার, দাদুর সঙ্গে ভোরবেলা বেড়াতে যাওয়া একটা ভারি প্রিয় বিলাস ছিল তখন—শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে দাদু বলেছিল—এই দিক দিয়ে সোজা চলে গেলে তুমি পেয়ে যাবে দমদম এয়ার-পোর্ট, সেখান থেকে ইয়া বড় বড় উড়োজাহাজ পৃথিবীর সব জায়গায় যাচ্ছে। আর এই দিক দিয়ে চলে গেলে তুমি পাবে শিয়ালদা স্টেশন—সেখান থেকে তুমি কোথায় যাবে লালইমলি? করবী, যার আদরের ডাকনাম লালইমলি, কিছু না ভেবেই বলেছিল—দার্জিলিং। দাদু মোটা গোঁফের আড়ালে অল্প হেসে বলেছিলেন—হ্যাঁ, দার্জিলিং। শুধু দার্জিলিং কেন, আরো অনেক জায়গায় যেতে পারো। আর এই রাস্তাটা দিয়ে চলে গেলে কোথায় গিয়ে পড়বে বলো তো? কলেজ স্ট্রীটে। সেখানে কি আছে বলো তো? লালইমলি সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল—সেখানে? কেন, কলেজ আছে। দাদু বলেছিল—হ্যাঁ, কলেজ তো আছেই, আর আছে বই। অনেক, অনেক বইয়ের দোকান আছে সেখানে, তোমার যে বই চাই, সব আছে। দুনিয়ার সব চেয়ে বড় বইপাড়ার নাম কলেজ স্ট্রীট, বুঝলে? ফুটপাথের ওপর ছড়ানো বই, রেলিঙে লাইন দিয়ে বইয়ের দোকান, সরু সরু গলির মধ্যে বিরাট বিরাট বইয়ের দোকান—সে একটা অদ্ভুত জগত। শুনে লাল-ইমলি বড় বড় চোখগুলো তুলে বলেছিল—এত বই? আমাদের ক্লাশে তো

শুধু চোদ্দটা বই আছে। শুনে হো-হো করে হেসে উঠেছিল দাদু। বলেছিল—এই একটা জিনিসের কোনো শেষ নেই, বুঝলে? পৃথিবীতে যে মোট কত বই আছে কেউ জানে না। লালইমলি অবুঝের মতন বলেছিল —এত বই কে পড়ে দাদু? দাদু হাসতে হাসতেই বলেছিল—কত লোক আছে। বইয়ের মতন মানুষেরও তো কোনো শেষ নেই। বড় হওয়ার পর শ্যামবাজারে এসে হাতিবাগানের দিকে চোখ তুলে তাকালেই লালইমলির মনে হলে—ওই কলেজ স্ট্রীট দেখা যাচ্ছে।

বড় হতে হতে লালইমলি কখন যে শ্যামবাজারের প্রেমে পড়ে গেল, লালইমলি নিজেও জানে না। পরিষ্কার ঝকঝকে সেণ্ট্রাল এভিনিউটা একদিন ভূপেন বোস এভিনিউ হয়ে গেল—তাতে তেমন কোনো আপত্তি ছিল না তার। প্রথম যখন পাতাল রেলের জন্যে শুরু হল খোঁড়াখুঁড়ি, লালইমলি ভীষণ কষ্ট পেয়েছিল। এই ভাড়াবাড়ির ঘুপচি অন্ধকার থেকে অন্তত দিনে একবার, বেশির ভাগ দিন সন্ধের মুখে, শ্যামবাজারে আসতে না পারলে ভালো করে ঘুম আসতো না তার। পাঁচমাথার মোড়ের গায়ের চানাচুরওয়ালার কাছ থেকে একটুখানি চানাচুর কেনার জন্যেও অন্তত একবার শ্যামবাজার যাওয়া চাই। বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি তো আছেই। বিশেষ করে ভূপেন বোস দিয়ে এসে মোড় ঘুরে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট দিয়ে একটুখানি এগিয়ে শ্যামবাজার ট্রাম-ডিপো থেকে থেমে থাকা ট্রামে উঠে জানলার ধারে বসে দুলে দুলে কোথাও যেতে যে কি ভালো লাগে! আর জি কর হাসপাতালের দিকের ছোট পোস্ট অফিসের দোতলার বারান্দা থেকে সন্ধের মুখে সদ্য জ্বলে ওঠা সার্কুলার রোডের সব আলোগুলো– রাস্তার দুধারের সারি সারি আলো—মনে হয় কোথায় যেন নিয়ে যাবে আমাকে।

স্কুল পেরোবার আগে দাদু আর কলেজ পেরোবার আগে বাবা হঠাৎ হঠাৎ টুক টুক করে মরে গেল। দাদার বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই যমজ ভাইপো হল লালইমলির। ছোড়দাও চাকরি পেয়ে গেল। একমাত্র

দিদিরও অনেক দিন আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল—এখন দিদির ছেলে মিনিল এই শ্যামবাজারের বাড়িতেই বেশিরভাগ দিন থাকে। দিদি রাতদিন জল ঘাঁটে আর ঘর মোছে বলে, মিনিলের স্কুলটাও শ্যামবাজারের বাড়ি থেকে কাছে হয় বলে, আর মিনিল মায়ের চেয়ে মাসীকেই বেশি ভালো-বাসে বলে, মামার বাড়িতেই তার সারা সপ্তাহ কেটে যায়। রবিবারটা মা-বাবার কাছে কাটিয়ে এসে সোমবার লালইমলির কাছে মিনিলের কত অভিযোগ। মা ঘরে শ্যাডো প্র্যাকটিস করতে দেয়নি, তিনটে অঙ্ক কিছুতেই মেলাতে পারেনি বলে বাবা চড় মেরেছে… । দাদুর মৃত্যুর পর থেকেই আস্তে আস্তে একা হয়ে উঠছিল লালইমলি, বাবা চলে যাবার পর, দিদি আর দাদার বিয়ে হয়ে যাবার পর, মা বুড়ি হয়ে যাবার পর—এখন শুধু লালইমলির বন্ধু বাড়ির উনুন, মিনিল, আর শ্যামবাজার।

ঘুম ভাঙলেই উনুনের কাছে বসতে হয়, সেই শুরু। প্রথমে জলখাবার তারপর রান্না, মাঝখানে মিনিলকে স্কুলে দিয়ে আসা, সব মিটতে মিটতে সেই দুপুর। বৌদি জোড়া বাচ্চা নিয়ে হিমসিম, তাকে সামলাও। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের অসুখও বাড়ছে—তাকে সামলাও। এর মধ্যে নানানরকম আত্মীয়ের যাওয়া আসা আছে। আছে হঠাৎ হঠাৎ আলো চলে যাওয়া। বাড়ির অবিবাহিতা কুমারী মেয়ে, যত ঝামেলা সব তোমার। দাদার স্কুল আর টিউশানি, ছোড়দার অফিস আর আড্ডা, মিনিলের হাজার রকম অত্যাচার, মায়ের খিটিমিটি, সব সামলে লালইমলি যখন সন্ধের মুখে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে এসে দাঁড়ায়—তখন বাতাসে দাদুর কণ্ঠস্বর ভেসে আছে ট্রাম বাস ট্যাক্সি টেম্পো ডবলডেকার আর গিজ গিজ মানুষের কলকল্লোল ছাপিয়ে—এইখান থেকে তুমি পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারো। কিন্তু কোথায় যাবে লালইমলি?

কলেজের ফাইনাল পরীক্ষার ঠিক আগে বাবা মরে গেল বলে রেজাল্টটা খুব খারাপ হয়ে গেল। রোগা, ছোট্ট, শাদা চেহারার লালইমলির সামনে

কোনো চাকরি নেই। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার কোনো সুযোগ নেই। তবু কিছুদিন ইউনিভার্সিটিতে যাতায়াত করল লালইমলি। অন্তত ভূপেন বোস দিয়ে হেঁটে এসে মোড় ঘুরে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো থেকে ট্রামে তো ওঠা যাবে, জানলার ধারে বসে দুলতে দুলতে কলেজ স্ট্রিট অব্দি যাওয়া যাবে!

মা মাঝে মাঝে গুনগুন করলেও তার বিয়ে নিয়ে বাড়ির কারুর যে তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই লালইমলি জানতো। আর বিয়ে? লালইমলির মনে হয়, সে তো শুধু অন্য এক উনুনব্যস্ততা; তার ওপর একজন অচেনা লোকের অচেনা সংসারের হাঁড়ি ঠেলা—এখনকার জীবনের সঙ্গে সে জীবনটা খুব কি তেমন তফাতের হবে? না বোধহয়! কি দরকার আমার! লালইমলি মাঝে মাঝে ভাবে—আমার তো অভাব নেই কিছুরই। মিনিলকে প্রায় নিজের ছেলেই মনে হয় মাঝে মাঝে, শুধু মা বলে ডাকে না এই যা। যে কোনো বিবাহিত মেয়ের মত সমান ব্যস্ত সে, সংসার নিয়ে সমান বিপর্যস্ত। মাঝখান থেকে সিঁথিতে সিঁদুর পরার লোভে জায়গা পাল্টানোর কি দরকার! এরা তবু আমার নিজের লোক—মা, দাদা বৌদি, ভাইপো, ছোড়দা, মিনিল। পরের সংসারে গিয়ে এন্তার অচেনা, রক্তের বন্ধনহীন লোকজনের বেগার খাটা—ধুর! আর তাছাড়া, দূরে কোথাও চলে গেলে—আমার এই সন্ধেবেলার শ্যামবাজারের কি হবে। কোনোদিন আলতা, কোনদিন বিস্কুট, কোনদিন চা, এইসব টুকিটাকি জিনিস কেনার ছল করে পাঁচমিশেলি শ্যামবাজার থেকে জীবনের রস শুষে নেওয়ার খেলাটা যে হারিয়ে যাবে। না, বিয়ের কথা লালইমলি একদম ভাবে না। শুধু নিঃঝুম দুপুরবেলা, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, মিনিল যদি স্কুলে থাকে, জানলার বাইরের গলি দিয়ে ফেরিওয়ালার ডাক যখন দূর থেকে আরো দূরে চলে যায়, দুপুরবেলার পাখা যখন ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ থেমে গেলে নষ্ট-আসা ঘুম-ঝিমুনিটা কেটে যায়, তখন একা একা বিছানায় এপাশ ওপাশ

করতে করতে লালইমলির মনে হয়—যদি একজন অন্তত এমন কোনো মানুষ থাকতো যে তাকে…. ।

বাড়িতে একদিন কোত্থেকে এক বুড়ো জ্যোতিষীকে ধরে নিয়ে এল দাদা। বাড়িসুদ্ধ সবাইয়ের হাত দেখল, পুরনো কথাগুলো মোটামুটি মিলেও যাচ্ছিল ঠিক ঠিক। তারপর যখন লালইমলির পালা এল, প্রথমে কিছুতেই হাত দেখাবে না সে, কি জানি কি বলবে ভেবে খুব লজ্জা হলো, পরে কিন্তু, কৌতূহলও হল খুব, দেখাই যাক না কি বলে। তারপর সে যা বলল, সব শুনে মনে হল হাতটা সে না দেখালেই পারতো। তার নাকি দুটো বিয়ে—প্রথম বরটা বিয়ের পরই নাকি মরে যাবে ; আর এই দুটো বিয়ে ছাড়াও অন্য একজন বিবাহিত পুরুষ তাকে আজীবন জ্বালাবে! ম্যাগো! ভাগ্যিস সে অন্য কারো সামনে বলেনি। তবু দাদাকে কি আর বলবে না! বলুক না, আমি তো আর বিয়েই করছি না যে বর মরে যাবার কথা আসবে। আর আমার সঙ্গে কোনো বিবাহিত ছেলের আলাপই নেই। সে তো পার্কের কোণের বাড়ির অনীতার আছে—লোকটা অনীতার মেজকাকার বয়েসী, কি বিচ্ছিরি মোটা, অনীতা যে কি করে ওকে পছন্দ করল, ছোট ছেলেটাকে পড়াতে যাবার নাম করে অনীতা রোজ…লোকটার বৌও তেমনি, সব জেনেও অনীতার কাছে এসে নাকে-কাঁদবে—জানো, তোমার দাদা আমাকে একটাও সিনেমা দেখায় না, কতদিন ধরে বেড়াতে যাবো ভাবছি, তা ছাই এই ঘোড়ার ডিমের সংসার নিয়ে কোথাও কি আর যাবার জো আছে, আগে কত যেতাম, দাদা তো রেলের পাশ পায়, এখন আর কোথাও যেতে চায় না, তুমি ভাই একটু বলে দেবে তোমার দাদাকে ? এসব কথা বলতে বলতে অনীতার সে কি হাসি! লালইমলি তখন নিজের ভেতর আয়না ভেঙে যাবার ঝনঝন শব্দ শুনেছিল।

ইউনিভার্সিটিতে প্রথম প্রথম তারি আড়ষ্ট লাগতো। তার অনার্স

নেই, সে রেগুলার ছাত্রী নয়, সবায়ের নাম ডাকা হয়ে যায়, লালইমলির কোনো রোল নম্বর নেই, তার নাম কেউ আর ডাকে না। উজ্জ্বল ছেলে-মেয়েরা সামনের দিকে বসে, নামীদামী কলেজের চকচকে ঝকমকে ছেলে-মেয়ে সব, টক টক করে লেকচারারদের সঙ্গে কথা বলে, নোট নেয়, কত জটিল জিনিস নিয়ে তর্কাতর্কি করে, তাদের পাশে লালইমলির নিজেকে খুব ম্লান লাগে ; ফুরফুর করে সবাই যখন ইংরেজি বলে, মনে মনে হাসি পেলেও বাইরে লালইমলি খুব লাজুক গম্ভীর মুখে চুপ করে থাকে। চারপাশের যৌবনের উতরোলের মধ্যে নিজেকে নিঃশব্দে ভাসিয়ে দিতে ভালো লাগে, নিজের ঘরের স্যাঁতসেঁতে আধো-অন্ধকার বিছানায় এই দুপুরবেলায় এপাশ ওপাশের চেয়ে ক্লাসঘরের এই বিচ্ছিন্ন উত্তাপময়তা কি অনেক আনন্দদায়ক নয়! আস্তে আস্তে একজন দু'জন করে নতুন নতুন বন্ধু হয় তার, এক একজনকে দেখে মনে আত্মবিশ্বাস বাড়ে—এ যদি পাশ করতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই আমিও পারবো। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে বাড়িতে তার বই খোলার কোনও সময়ই নেই, রান্না হুল্লোট মিনিল, দাদার ছেলেরা, আত্মীয়স্বজনের আসা-যাওয়া, অসুখবিসুখ—এইসবের মধ্যে কেউ তাকে বইয়ের পাতায় মন বসাতে দেবে না। তবু নোট নিতে শেখে লালইমলি, ক্লাসে অন্য মেয়েদের যে দলটার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে, তাদের সঙ্গে অনবরত অবান্তর কথা বলে যেতেও শিখে নেয়। চারপাশে অজস্র যুবকের সহজ সরব উপস্থিতি তাকে বুঝিয়ে দেয়, ইউনিভার্সিটিটা ঠিক মেয়েদের মর্নিং কলেজ নয় : এখানে স্মার্ট হবার প্রতিযোগিতায় কখন যে কার পা হড়কাবে কেউ জানে না।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অনেক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল, ছেলেদের কেউ কেউ চাকরি পেয়ে ক্লাসে আসা কমিয়ে দিল, স্পেশাল পেপার আলাদা হয়ে যাবার জন্যে ক্লাসের ভিড় কমে গেল, বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কটা আরো গাঢ় হল। আধ ঘণ্টা বাসে এসে যে কৃষ্ণা রোজ সুদূর খড়্গপুর স্টেশন থেকে

ট্রেনে এসে ক্লাস করে ফের ট্রেনেই ফিরে যায়, জানা গেল সে বাঙালি ছেলেদের চেয়ে অবাঙালিদের পছন্দ করে বেশি, পরে আরো জানা গেল—তার একজন অবাঙালি প্রেমিকও নাকি আছে ; অনুরোধ উপরোধের চাপা-চাপিতে তার সঙ্গে সবায়ের একদিন আলাপও করিয়ে দিল কৃষ্ণা, ভারি সুন্দর স্বাস্থ্য ছেলেটির—বজরংগ আগরওয়াল, গোঁফ দাঁড়িহীন মুখে একটা কাঠ কাঠ পৌরুষলালিমা লালইমলি লক্ষ করল, ছেলেটির চোখ বেশ অশালীন, নির্লজ্জ, কামুক। তবু, ধর্মতলার একটা চমৎকার রেস্টুরেন্টে, একটা লম্বা খাওয়া দাওয়ার পর বিদায় নেবার পালা এলে, বজরংগ হঠাৎ যখন বলল—আপ এতনা দুবলা লেকিন বহুৎ বিউটিফুল ভি! লালইমলির খুব কি খারাপ লেগেছিল? না বোধহয়।

মুখটা প্রায় কাকাতুয়ার মত, শিখা হালদার হঠাৎ বিয়ে করে কিছুদিন ডুব দিয়ে ফের নিয়ম করে ক্লাসে আসতে লাগল, বর বলেছে পরীক্ষা তাকে দিতেই হবে। একদিন তার বাড়িতেও সবাই মিলে হৈ হৈ করে বেড়িয়ে আসা হল, বরের সঙ্গে আলাপ হল না, তিনি ছিলেন না বাড়িতে, বাড়ি মানে ছোট্ট ফ্ল্যাট, বুড়ি বিধবা মা-ই সব কাজ করে নেন, ঝি আছে, বৌকে প্রায় পড়াশোনার অজুহাতে কিছুই করতে হয় না, দেখেশুনে লালইমলির হিংসে হল খুব, এসবের জন্যে কপাল করে আসতে হয়, নিজেকে বোঝাল। বাড়ি ফিরতে সেই প্রথম রাত হল। বুকে চাপা বিদ্রোহ নিয়ে বাড়ি ফিরে, প্রায় ন'টা নাগাদ, দেখল সবাই বেশ গরম হয়ে আছে, দাদা থানায় খবর দিতে যাবার জন্যে প্রায় তৈরি। প্রথমে মা, বেশ চড়া স্বরে, তারপর গুন-গুন করে বৌদি, তারপর গম্ভীরভাবে দাদা—সবায়েরই এক বক্তব্য—বলে যেতে কি হয়েছিল, আমাদের দুশ্চিন্তায় ফেলে—তোমার তো যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, বিবেচনা····। লালইমলি কাউকেই কিছু বলেনি। শুধু নিঃশব্দে হাত পা ধুয়ে পোশাক পাল্টে শুয়ে পড়তে পড়তে মাকে বলেছিল—আমার

জন্যে তোমাদের কত চিন্তা, আমার জানা আছে। পরে মা সান্ত্বনা দিতে এলে—আরো বলেছে লালইমলি—ঠিক আছে, কাল থেকে তোমার ওষুধ আমি আর এনে দিতে পারবো না, কাল থেকে মিনিলকে আমি স্কুলে দিয়ে আসতে পারবো না, কাল থেকে আমি আর ভোর হলেই হেঁসেলে ঢুকতে পারবো না···। সারাদিন শুধু শুয়ে থাকবো আমি। কিচ্ছু করতে পারবো না তোমাদের জন্যে। ব্যাস্।

পরে আর, দৈবাৎ দেরি করে ফিরলে, কেউ তাকে তেমন কিছু বলতো না। দেরি করে অবশ্য ফিরতো না লালইমলি। শুধু···

শুধু শিবনাথ যেদিন তাকে আটকে রাখতো, ক্লাস পালিয়ে কফি হাউসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে সন্ধে হয়ে এলে বাড়ি ফেরার কথা বললে শিবনাথ বলতো—চলে যাবি? আমি তাহলে এখন কি করবো, লালইমলি? শুনে লালইমলির খুব অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হত, সে বাড়ি চলে গেলে ওই কোঁকড়ানো চুল, চশমা পরা রোগা ছটফটে ছেলেটার সত্যিই কিছুই করার থাকবে না। তবু, মুখ নিচু করে, প্রায় ফুটপাথে মিশে যেতে যেতে লালইমলি বলতো--তুই কি করবি আমি কি জানি। শিবনাথ প্যান্টের দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলতো—চল তাহলে তোর বাড়ি যাই। শুনে লালইমলি কেঁপে উঠতো অল্প—বাড়ি? না না। সেখানে তো সংসারের কৌটো-কেটলি, বাইরের ঘরে দাদার ছাত্রদের ভিড়, সেখানে শিবনাথকে মানাবে না।

কিছুদিন, ক্লাসে শুধু তাকিয়ে থাকতো শিবনাথ। লালইমলি টের পেত—একদিন কিছু বলবে সে; কিন্তু কিছু বলতো না। অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হৈহৈ করতো, ক্লাস কাটতো খুব, পরে একদিন জানা গেল শিবনাথ চাকরি পেয়েছে। তবু মাঝে মাঝে ক্লাসে আসতো শিবনাথ, প্রফেসরের লেকচারে কান না দিয়ে ঠায় তাকিয়ে থাকতো লালইমলির দিকে, লালইমলির ফরসা মুখ শুধু লাল হয়ে যেত বসে থাকতে থাকতে। তারপর একদিন, বিকেল

তিনটে নাগাদ, ক্লাসে লালইমলির দলের অন্য মেয়েরা কেউ নেই, ক্লাসও নেই তখন, হঠাৎ শিবনাথ লালইমলিকে করিডোরে ধরে খুব শান্তভাবে বলল—শোনো, আমার এখন কিছু ভালো লাগছে না, তুমি আমার সঙ্গে চা খেতে যাবে? লালইমলি হেসে ফেলেছিল একটু। কি বলতে হবে বুঝতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল খানিকক্ষণ। শিবনাথও কিছু বলেনি। পরে লালইমলি গলায় অনেক কষ্টে একটু জোর এনে বলেছিল—ক্লাস থেকে ব্যাগটা নিয়ে আসি।

প্রথম দিন চা খেতে খেতে শিবনাথ শুধু তার চাকরি পাওয়ার আনন্দ, আর চাকরি পেয়ে যাওয়ার জন্যে ক্লাস করতে না পারার দুঃখের কথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বলেই চলল। বেশ খানিকক্ষণ শিবনাথ একনাগাড়ে কথা বলে যাবার পর একটু থামলেই লালইমলি দুম্‌ করে বলেছিল—ক্লাস তুমি কত করতে আমি জানি। আর চাকরি করলে অবশ্য ইউনিভার্সিটিতে এসে রোজ মেয়েদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা যায় না। শুনে শিবনাথ প্রায় উলঙ্গ চোরের মতন লালইমলির দিকে তাকিয়ে রইল। তার অবস্থা দেখে লালইমলি খিল খিল করে হেসে ফেলেছিল। এমন হাঁ-করার মতন চেয়ে থাকার কি আছে, মেয়েরা তো দেখবারই জিনিস....তবে অফিস থেকে ঘন ঘন পালিয়ে আসাটা ঠিক না, হাজার হোক নতুন চাকরি....। শিবনাথ একটা গভীর শ্বাস ছেড়ে খুব যত্ন করে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বার করেছিল। লালইমলি যে তার সঙ্গে বেশ দখলের সুরে কথা বলছে, তাতে সে আরাম পেয়েছিল খুব। চাকরি পাবার পর আজকাল সে একসঙ্গে এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে পারে। ঠোঁটে সিগারেট ধরিয়ে দেশলাই জেলে ধরাতে শিবনাথ গুনগুন করে বলেছিল—ভালো দেখে একটা লাইটার কিনতে হবে। অফিসের একটা ছেলে নেপাল যাচ্ছে। এনে দিতে বলবো। লালইমলি চায়ে একটু চুমুক দিয়ে খুব উদাসীন গলায় বলল—নিজের জিনিস নিজে কেনাই ভালো।

তাছাড়া, লাইটার বাজে। দেশলাই অনেক ভালো। সুন্দর একটা লাইটারের ওপর শিবনাথের আজীবনের শখ, লালইমলি সেটাকে স্রেফ হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছে দেখে শিবনাথ একটু তর্ক করতে গেল—কেন, লাইটার বাজে কেন?

লালইমলি রেস্ট্রেণ্টের ভেতর থেকে একবার রাস্তার লোকজন দেখল, একবার দোকানের অন্যসব চা-মগ্ন লোকজন দেখল, তারপর আস্তে আস্তে, থেমে থেমে বলল—এক-একজন মানুষকে, এক একটা জিনিস দিয়ে চেনা যায়! যারা লাইটার ব্যবহার করে, সেইসব ছেলেরা চোর হয়। শুনে শিবনাথ হো-হো করে হেসে উঠতে যাচ্ছিল, অন্য কেউ বললে হেসেও উঠতো—আর বিশেষত, অন্যদের গম্ভীর মন্তব্য শুনে এতদিন সে হাসির জোরেই সেসব নাকচ করে দিয়েছে, তবু এখন লালইমলির হাবভাব দেখে শিবনাথ হাসল না। একটু আগের অপমানের শোধ নেবার জন্যে খুব ক্যাজুয়াল গলায় বলল—কেন, লাইটারওলা কোন ছেলে তোমার কি চুরি করেছে? লালইমলি ফিক করে হাসল। বলল—এইভাবে কথার পিঠে কথা বলাটা ভারি বোকা বোকা। আমি আমার একটা অনুভূতির কথা বলছি। যেমন কোণের দিকে ওই যে, ওই বুড়ো মতন লোকটা বসে আছে, ওই লোকটা চোর, জানো তো। শিবনাথ সাবধানে লোকটাকে দেখল, সে লাইটার ব্যবহার করে এমন কোনো প্রমাণ নেই, দেখেও তাকে বেশ ভদ্রলোক বলেই, সৌম্য প্রৌঢ় বলেই মনে হয়, অথচ তাকে চোর বলা হল কেন, শিবনাথ ঠিক বুঝল না। নিচু গলায় বলল—কেন, চোর কেন? লালইমলির শাদা রোগা মুখ অল্প লাল হল। সে তুমি বুঝবে না। বলে শিবনাথের সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে মন দিয়ে দেখতে লাগল।

সেদিন শিবনাথ তিন কাপ, আর লালইমলি দু'কাপ চা খেয়ে দোকান থেকে বেরিয়েছিল ঠিক দু'ঘণ্টা পরে। বেরিয়েই শিবনাথ বলেছিল, ধুত্তেরি, সোয়া চারটে বেজে গেছে, এখন অফিসে ফিরতে কারো ভালো লাগে?

লালইমলি ভিড় বাস দেখতে দেখতে বলেছিল—মানুষ যা কিছু করে তার বেশির ভাগ কাজেই তার ভালো লাগে না। সেগুলো মেনে নিতে না পারলে, ভালো লাগার কাজগুলোও আর ভালো লাগবে না। শুনে শিবনাথ, বাসস্টপের অপেক্ষমান ভিড়, ফুটপাথের বইওলা, চারপাশের লোকজন—সবাইকে উপেক্ষা করে লালইমলিকে মনে মনে অনেকগুলো চুমু খেল। একটা থার্টিফোর আসতেই শিবনাথ বলল, তুমি উঠে পড়ো, আমি তোমাকে তুলে দিয়ে ফিরবো। লালইমলি বলল—এইসব বাঙালপাড়ার বাসে আমি উঠি না। আমি ট্রামে যাবো। তাড়া থাকলে তুমি যাও। আমাকে তুলে দিতে হবে না। কবে আসবে ? লালইমলিকে ফেলে চলে আসতে খুব খারাপ লাগলেও, সে আবার বেশ দখলের সুরে কথা বলছে দেখে, শিবনাথের নতুন করে ভালো লাগল। বলল—আচ্ছা তুমি রোজ ক্লাশে এসো কিন্তু, আমি যে কোনোদিন হঠাৎ চলে আসবো। লালইমলি মিষ্টি করে ঘাড় নাড়ল—আচ্ছা। শিবনাথ প্রায় উড়তে উড়তে অফিসে ফিরে এল।

সেই শুরু। তারপর থেকে লালইমলি ক্লাশে যেতো শুধু শিবনাথের জন্যে অপেক্ষায় থাকবে বলে, শিবনাথ না এলে মুখ ম্লান করে বাড়ি ফিরে আসবে বলে। শিবনাথ এলে, অফিস মিটিয়ে সাড়ে তিনটে চারটের মধ্যে চলে আসতো। একদিন ক্লাশ ছিল না বলে, সবাই চলে যাচ্ছে বলে, তিনটের আগেই চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল লালইমলি, আর শিবনাথ এসে ক্লাশঘরে তাকে পায়নি বলে পরের দিন সে কি রাগ ! হাঁটতে হাঁটতে শিবনাথের নানারকম অবান্তর অভিযোগ শুনতে শুনতে যখন তারা একসঙ্গে শ্যামবাজার পৌঁছলো, লালইমলির মনে হল—নদীপথে আসতে আসতে হঠাৎ যেন সমুদ্রের সঙ্গে দেখা হল। কথাটা সে আড়ষ্টমুখে লজ্জা লজ্জা ভাব করে শিবনাথকে বলেও ফেলল। হজম করতে খানিকটা সময় নিল শিবনাথ। শ্যামবাজার নিয়ে এত ভাবে মেয়েটা ! ভারি অদ্ভুত তো !

শিবনাথের ঘোর কাটার আগেই লালইমলি বলেছিল, হাতিবাগানের মোড়ে একটা লোক কি চাকরি করে দেখেছো—যেসব ট্রাম চিৎপুরের দিকে বেঁকে যাবে সেগুলোর জন্যে একটা ছোট লাঠি দিয়ে ট্রামের লাইনটা ঠিক করে দেয়। খুব মজার চাকরি, তাই না? শিবনাথ সাংঘাতিক অবাক হয়ে লালইমলির দিকে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়েছিল—তাই তো, এটা তো খেয়াল করিনি কোনদিন! পাঁচমাথার মোড থেকে চানাচুর কিনে শিবনাথের হাতে একটু দিয়ে লালইমলি বলেছিল—পিছন ফিরে চেয়ে দেখো। দেখেও কেন দেখতে বলা হল, শিবনাথ কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। লালইমলি খুব মিষ্টি করে বলেছিল—মনে হচ্ছে না, যেন কলেজ স্ট্রীটটা দেখা যাচ্ছে! শিবনাথ এবারও কিছু বলে উঠতে পারেনি। শুধু ভালো লাগার, বিস্ময়ের, আনন্দের একটা অতল খাদে তলিয়ে যেতে যেতে সে টের পেয়েছিল, লালইমলি যেন ক্রমশই ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে।

তারপর লালইমলি শ্যামবাজার চেনালো শিবনাথকে। একটা আলতা-সিঁদুর-কপালের টিপ বিক্রেতা মেয়েকে দেখালো; মেয়েটা কালো, বেঁটে, পাগুলো ব্যাঁকা, মুখটা হনুমানের মত, তার নিজের কপালে হয়তো কোনদিনই সিঁদুর উঠবে না, তবু তার আলতা-সিঁদুর বিক্রি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মাংস-রুটির দোকান, যার ডাকনাম গোলবাড়ি—সেখানে রোজ যে কত লোক মাংস খেতে ঢোকে, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে মনে হয় সারা দেশের সব লোক বোধহয় সবসময় মাংস খায়! প্রায় রোজ সন্ধ্যেবেলা গোলবাড়ির সামনে কিছু লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কত কি-যে চেঁচিয়ে মেচিয়ে বলে যায়, কারা যে সেসব কথা শোনে, আর সত্যিই কেউ আদৌ কিছু শোনে কিনা, লালইমলির যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এইসব লেকচারেরর জন্যে দেশের কারুর কিছু উপকার হয় কিনা লালইমলি জানে না, তবে ডিমওলাদের যে যথেষ্ট অসুবিধা হয়, লালইমলি দেখেছে।

লেকচার না থাকলে, গোলবাড়ির সামনের এই জায়গাটায় বেশ কয়েকজন ডিমভাজা বা সেদ্ধডিমবিক্রেতা লাইন দিয়ে বসে রোজ। বক্তৃতার দিন সন্ধ্যেবেলা তারা যে কোথায় যায় লালইমলি জানে না। সার্কুলার রোডের ওপাশে এখন যেখানে কাপড়ের দোকান, সেখানে নাকি কফি হাউস ছিল। দাদুর সঙ্গে ছোটবেলায় কয়েকবার গেছে লালইমলি। এখন দাদুও নেই, কফি হাউসও নেই। আর একটু এপাশে পর পর দুটো বইয়ের স্টল, লালইমলি মাঝে মাঝেই এখান থেকে পাঁচরকম পত্রিকা কেনে। এই নিরীহ স্টলগুলোর ওপর কারা যেন মঝে মাঝেই হামলা করে, লালইমলি তাদের পছন্দ করে না একদম। আর জি কর রোডের দিকে পড়ে হঠাৎ বাঁদিকে একটা মন্দির দেখাল লালইমলি, শিবনাথ কোনদিন এই ভিড়-শ্যামবাজারের ভেতরে এই মন্দিরটাকে খেয়াল করেনি। মন্দিরের সামনে যাবার আগে লালইমলি শিবনাথকে 'এসো' বলে টেনে নিয়ে গেল, 'তোমায় একটা জিনিস দেখাবো', ফুটপাথের পাশে যেখান থেকে পুরো কালীমূর্তিটা দেখা যায়, সেখানে শিবনাথকে দাঁড় করিয়ে লালইমলি ফিস-ফিস করে বলল—ওই দ্যাখো, কালী।

শিবনাথের চোখের সামনে থেকে চকিতে মুছে গেল শ্যামবাজারের ভিড়সর্বস্বতা, মুছে গেল লোভসংস্কার, মুছে গেল অতীত। অস্বস্তিকর এক নিরালম্বময়তার মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শিবনাথ লালইমলির দিকে ফিরে দেখল, লালইমলি হাসছে, সে হাসি দুষ্টুমির নয়, সে হাসি আনন্দেরও নয়, শিবনাথ দেখল—সে হাসি অনেকটা আবিষ্কারের, গোপন অবলম্বনকে লুকিয়ে দেখাতে পারার পরিতৃপ্তির হাসি। শিবনাথও, বিফল হাসলো।

তারপর কদিন পরই টাইফয়েড হল। প্রথমে, ভেবেছিল সামান্য জ্বর, এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে, যেমন যায়। 'খিদে নেই' বলে শুয়ে পড়েছিল কাজকম্ম মিটিয়ে। তিন দিনের দিন, বসে থাকতে থাকতে, রান্নাঘরে, হঠাৎ দাঁড়াতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে গেল, পরিষ্কার পড়ে গেল লালইমলি,

মাথার মধ্যে রাজ্যের অন্ধকার গোল হয়ে ঝেঁকে ঝেঁকে নেমে এল। এই প্রথম, বাড়িতে তাকে নিয়ে রীতিমত সাড়া পড়ে গেল। স্কুল থেকে দাদাকে ডেকে আনা হল, ডাক্তার, লম্বা প্রেসক্রিপশন, একগাদা ওষুধপথ্য, জানা গেল—টাইফয়েড। মায়ের অস্ত্র শুধু একটাই—বসে বসে চিৎকার করা, এটা হল না, ওটা কেন হল সেটা কে করবে—লালইমলির অসুখের সময় প্রথম কিছুদিন চিৎকারটা বিলাপে দাঁড়াল ; রান্নাঘরে বৌদি, মায়ের কাছে বাচ্চারা, মামার বাড়ি থেকে দুই মামাতো বোন এল কিছুদিনের জন্যে—পলি মলি, মিনিল গম্ভীরভাবে লালইমলির বিছানার কাছে বসে রইল মাঝে মাঝে, কোন শিশুরই অসুস্থ মানুষকে বেশিক্ষণ ভালো লাগার কথা নয়, মিনিলেরও লাগল না। একদিন দিদি এসে তাকেও নিয়ে চলে গেল, অসুখের বাড়িতে থাকলে ছেলেরও যদি হঠাৎ কিছু হয়। মলি পলি দু-একদিন থেকে চলে গেল, তাদের মা নেই, বাবার থাকা খাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে। লালইমলি জ্বর নিয়ে শুয়ে রইল একমাস, সঙ্গী বলতে ঘরের ছাদ, ওষুধ বার্লি, জানলা দিয়ে ঢুকে পড়া হঠাৎ-রোদ, আর বাড়ির অন্য ঘর থেকে ভেসে আসা ব্যস্ততার, অভিযোগের কলস্বর। অনেক দূরে সরে গেল দুপুরবেলার ইউনিভার্সিটি, পাশ করার স্বপ্ন, দূরে সরে গেল বাড়ির বাইরের চলন্ত জগৎ ; শুয়ে, থাকতে থাকতে, শুয়ে থেকে রোগা শরীরে আরো রোগা হয়ে যেতে যেতে, একটা আশঙ্কা, একটা আশা, লালইমলি খুব যত্নে লালন করল নিজের ছোট্ট বুকের ভেতর—যদি ইউনিভার্সিটিতে তাকে না পেয়ে, ক্ষিপ্ত বিষণ্ণ চঞ্চল শিবনাথ কোনদিন তার বাড়িতে চলে আসে, যদি।

শিবনাথ কিন্তু একদিনও এল না।

সে তখন, চাকরির দ্বিতীয় বছরে, অফিস নামের কালো মরুভূমির মধ্যে একটি শাদা মরুদ্যান খুঁজে পেয়ে—বুঝতে পেরেছে, ভালো বাসবার মত, সময় কাটাবার মত, নিজের আনন্দ-অনুভূতি, দুঃখ-বেদনার কথা

কাউকে বলবার জন্যে, জীবন ভাগ করে নেওয়ার জন্যে, রোজ রোজ কলেজ স্ট্রিট না গেলেও চলবে। অফিসের সেই কাজলনয়নার নাম সুদেষ্ণা, অ্যাপয়েন্টমেন্টের দিন থেকেই শিবনাথ তাকে চিনে নিয়েছিল, তখন ভাবেনি এই শ্যামলা স্বপ্নময় চোখের মাঝারি স্বাস্থ্যের মেয়েটি, সুদেষ্ণা মুখার্জি, তাকে এত কাছে টেনে নেবে, অফিসের রসকষহীন সময়গুলিকে করে তুলবে মনোরম, সহনশীল। সেও এসেছিল সায়েন্স কলেজ থেকে সরকারী অফিসের চেয়ারে, সোজাসুজি, পরীক্ষার আগেই। এক শীতের দুপুরে, কেরানী জীবনের সেই মহার্ঘ সময়ে, যাকে বলে টিফিন—শিবনাথ আর সুদেষ্ণা অফিস-পাড়ার ভিড় ফুটপাত থেকে শালপাতায় ভরা যত্নে কাটা ফলমূল খেতে খেতে—অনেক হাসাহাসি করতে করতে—মেনে নিয়েছিল—সরকারি চেয়ারের পেলব স্পর্শ থেকে পশ্চাদ্দেশকে বঞ্চিত করাটা শুধু বোকামি নয়, কিছুটা অন্যায়ও। কি দরকার, 'উচ্চাশা' নামের একটি ছোট্ট শব্দের ফাঁদে পড়ে, সামান্য কিছু বেশি অর্থের লোভে, অনেক বেশি দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিয়ে, ব্যক্তিজীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলার। মানে হয়না, সুদেষ্ণার যে হাসি শিবনাথকে আমূল নাড়া দেয়, সেইরকম হাসতে হাসতে সুদেষ্ণা বলেছিল—অফিসার হওয়ার কোনও মানে হয় না। অফিসার না হতে পারলে যাদের জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়, তাদের মুখে না, আমার খুব বাঁ হাত বুলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। বলে সে কি হাসি। শিবনাথও দমকে দমকে হাসছিল। হঠাৎ থেমে, সুদেষ্ণা বলেছিল—আপনি আবার হঠাৎ কোনদিন অফিসার হয়ে যাবেন না তো? শিবনাথ, একদম দেরি না করে, বলেছিল—যদি আপনি আপনার বাঁ হাতটা মুখের বদলে বুকে বুলিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন…। হাসি থামিয়ে, সুদেষ্ণা, যেভাবে মেয়েরা সারা জীবনে শুধু একবারই তাকাতে পারে, সেইভাবে শিবনাথের চোখের অস্তিমে তাকিয়ে বলেছিল—আর ইউ সিরিয়াস?

এসব কথার মাস ছয়েক পরে, এক রবিবার সন্ধেবেলা, আগে থেকে কেটে রাখা টিকিটে দুপুরের শোয়ে সিনেমা দেখে, গোলবাড়ি থেকে অল্প কিছু খেয়ে নিয়ে, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে, বাসের জন্যে অপেক্ষা করছিল শিবনাথ আর সুদেষ্ণা, তারা এখন একই বাড়িতে থাকে। 'মিনিবাসে যাবো' বলে বুকের ওপর দিয়ে শাড়ির আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে নিচ্ছিল সুদেষ্ণা। 'যদি বসবার জায়গা থাকে'—বলে উল্টোদিকের ফুটপাথে তাকাতেই, শিবনাথ দেখল—লালইমলি। টুক টুক করে হাঁটছে, হাতে একটা নতুন কেনা সুদৃশ্য জেলির শিশি। শিবনাথ স্ত্রীকে নিয়ে যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল, তার পিছনের ফুটপাথে দু'জন হকার জায়গা দখল নিয়ে তখন খুব ঝগড়া বাঁধিয়েছে। মুখে একটা আলগা বিরক্তি ফুটিয়ে শিবনাথ বলল, চলো সুদেষ্ণা, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই। চারদিকের এই চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে, ভালো করে দেখতে না জানলে, সে জিনিসটা, আছে তবু নেই মনে হয়। সুদেষ্ণা একটু অবাক হয়ে বলল —কি বলো তো। শিবনাথ বলল—চলোই না। ওই তো ওই কোণটার দিকে যাবো। আর জি কর রোডের দিকে, বাঁদিকটায়। যাবো আর আসবো। ততক্ষণে বাসের ভিড়ও অনেক কমে যাবে।

## অবিশ্বাস

( বাবা )

বাবার বয়স এখন চুয়ান্ন। মানুষ হিসেবে তিনি খুবই সরল ও বোকা। আবেগপ্রবন ও অল্পবিস্তর পরিশ্রমী। ধর্মভীরু। দুশ্চিন্তাপ্রিয় ও অকর্মণ্য। দাদু যা যা তৈরী করেছিলেন—বাড়ি, জমিটমি ও ব্যবসা; সবই তিনি, মানে আমার বাবা,, সযত্নে নষ্ট করেছেন। কেউ অভিযোগ করলেই বলে ওঠেন—কর্মফল, গীতা, কপাল, সংসার বাঁচানোর জন্যে সব বেচে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না—ইত্যাদি। যৌবনে শোনা নেতাজীর বক্তৃতা, মহম্মদ আলীর বকসিং, পেলের পায়ের কাজ, বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র, আয় মায়ের বহুবিধ দোষত্রুটি—এই-ই হচ্ছে বাবার প্রিয় বিষয়। কারণে অকারণে হিসেবের খাতায় জমাখরচ লিখতে খুব ভালোবাসেন। অসুখের মধ্যে তাঁর আছে ব্রঙ্কাইটিস, বাত, আর অল্প হাঁফানি। ছোটবেলায়, একটু হাই তুললে দশজন ঝি-চাকর ছুটে আসতো। তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ আয় দিনে বাইশ হাজার টাকা। পূজোর বাজারে হাতিবাগানের শাড়ির দোকান থেকে। আঁটপুর বস্ত্রালয়। এখন সেখানে দুটো দোকান।

বাবা সন্ধ্যেবেলা সেই বিশাল দোকান বেচোকাকার হাতে ছেড়ে দিয়ে নাইট শোয়ে মাকে নিয়ে সিনেমা চলে যেতো—দোকানটা বন্ধ করে দিস, বেচো। সেই বেচো এখন আঁটপুরে একটা চমৎকার বাড়ি করেছে, মেয়েকে শিশুমঙ্গল হাসপাতালে নার্সিং পড়ায়। বাবার কর্মচারী বলে সেই বেচোকে আমি বেচোকাকা বলতাম। তার ভালো নাম ছিল বিজয়কৃষ্ণ দে। আর একজন কর্মচারী ছিল দিলীপ সিংহ। সে বাড়ি করেনি, তবে দমদমে

স্মল টুলসের ব্যবসা করেছে। লেদ কিনেছে।

দোকানে তখন বছরে বিক্রি হত দু' লাখ টাকা। বার্ষিক নেট আয় বিশ হাজার। আঁটপুর আর কলকাতার মোট সংসার খরচ ছিল বছরে দশ হাজার। বাকি দশ হাজার টাকা ছিল দোকান খরচ। এর মধ্যেই বড় বোনের বিয়ে দিতে বাবা খরচ করেছিল বারো হাজার। উনিশশো পঁয়তাল্লিশের বারো হাজার। মেজ আর সেজ বোনের বিয়েতে খরচ বেশি হয়নি। ছোট বোনের বিয়েতে রিজার্ভ ব্যাংকের অফিসার পাত্র পাওয়া গেল। অর্থাৎ পনেরো হাজার। দোকানের মহাজনের খাতায় ততদিনে দেনা বেড়েছে অনেক। এক লাখ দশ হাজার। বাষট্টি সালে দোকানের দাম উঠলো পঁচানব্বই।

সোম থেকে বেস্পতিবার অব্দি বাবা থাকতো কলকাতায়। শনি রবি থাকতো দেশে। তখন ম্যানেজার নন্দকিশোর দে একা দোকান চালাতো আর আঁটপুরে জমি কিনতো। বাবার আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। জয়েন্ট ফ্যামিলি। বাবারা পাঁচ ভাই চার বোন।

এক লাখ দশ হাজারের দেনা কথাবার্তা বলে পঁচানব্বই হাজারে মেটানো হল বাষট্টি সালে। সে বছরই বিধান রায় মারা গেলেন। বাবা তাতে দুঃখ পেয়েছিল বেশি। ফিউনারেলে গিয়েছিল।

ছোটবেলায় বাবা দেখেছে দাঙ্গা, দেখেছে কলকাতার রাস্তায় পাহাড় করা মৃতদেহ, দেখেছে কলাকাতার ওপর দিয়ে পঙ্গপাল উড়ে গেল। দেখেছে স্বদেশী আন্দোলন—ডাঁই করে বিলিতি পোশাক পোড়ানো হচ্ছে কেন। বুঝতে পারতো না ঠিক।

তারপর কলকাতায় এল সত্তর সাল। বাবা কাশীনাথ চাটুজ্জের সঙ্গে পাটের ব্যবসা করতো। ব্যবসাটা আসলে ছিল কাশীনাথ জেঠামশায়ের। বাবা শুধু হিসেব লিখতো। আমি তখন স্কুলে পড়ি। স্কুলের মাইনে দেবার নাম করে আসলে সিনেমা দেখার জন্যে যখন জেঠামশায়ের গদিতে

গিয়ে বাবার কাছে টাকা চাইতুম, আঁটপুরে, বিশাল একটা দাঁড়িপাল্লায় তখন পাটের বস্তা ওজন করা হতো মহাসমারোহে—কাশীনাথ জেঠু সুর করে কাঁটা বাটখারা দেখতে দেখতে বলতো, আয়, বস্তা যায়, বিয়াল্লিশ। বাবা লিখতো—বিয়াল্লিশ, মানে বিয়াল্লিশ কেজি। এসবের মাঝখানে আমি গিয়ে টাকা চাইলে বাবা বলতো, ইয়ে—কাশীবাবু দশটা টাকা দিন তো। উদাসীনভাবে দাঁড়িপাল্লার বস্তার দিকে চেয়ে জেঠামশাই বলতো —দিচ্ছি। কথা ছিল, ব্যবসা যেরকমই হোক, কাশী জেঠু মাসে বাবাকে পাঁচশো টাকা দেবে।

কাশী জেঠু খুব ভালো লোক ছিল। আমাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতো।

তারপর কলকাতায় সত্তর সাল এল। কলকাতার বাড়িতে আট বছরের মাড়োয়ারি ভাড়াটে। ভাড়াটে বসানোর খবর শুনেই ঠাকুমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। অথচ ঠাকুমা গোলা থেকে লুকিয়ে ধান বিক্রির পয়সা জমিয়ে একা একা গোমুখ ঘুরে এসেছে নির্বিঘ্নে। দাদুর নিজের হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তৈরী করা বাড়ি।

বাবা বলেছিল—দুশো টাকা ভাড়া দেবে। বাড়িটা তো খালিই পড়ে থাকে। দোকান যখন নেই তখন কলকাতার বাড়িতে কারো থাকার কোনো কারণ নেই। ভাড়াটে বসালে ক্ষতি কি। লাভের মধ্যে মাসে মাসে দুশো টাকার নিশ্চিন্তি। মাড়োয়ারিদের পেমেন্ট ভালো। সত্যিই ভালো। তারা এখনো এক তারিখে ঠিক ঠিক দুশো টাকা আমার পিস-তুতো দাদার হাতে তুলে দেয়। বাড়িটা এখন তার। ভাড়াটে আছে বলে আর কোন খদ্দের না পেয়ে বাহাত্তর হাজারে বাবা সেটা আত্মীয়কেই বেচেছে। সেন্ট্রাল এভিনিউর ওপর তিনতলা দক্ষিণখোলা বাড়ি। বিকেলের বারান্দায় এখন মোটা ছোটগিন্নি শকুন্তলা আগরওয়াল বুক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ছোটবেলার ওই বারান্দায় আমরা ভাইবোনেরা

কত খেলেছি।

শরিক ছিল ছজন। পাঁচ ভাই আর ঠাকুমা। বারো হাজারে টেনে টুনে বছর দুয়েক চলেছিল। প্রতি সোমবার বাবা একশো টাকা তুলে আনতো ব্যাঙ্ক থেকে।

দেশের ধানজমি বাষট্টি সালের পর থেকে ততদিনে বেচতে বেচতে ফুরিয়ে গেছে। বাড়ি না বেচলে খাবো কি? কাশীনাথ চাটুজ্জের পাঁচশো টাকায় কিছু হয়! বাবা বলেছিল। ওঃ বলতে ভুলে গেছি—আমরা তখন পাঁচ ভাই আর দুই বোন। আমি মেজো।

আমি হায়ার সেকেণ্ডারি দিই একাত্তরে। ওই গোলমালের মধ্যে কি করে যেন ডিভিশন পেয়ে গেলাম। প্রেসিডেন্সিতে চান্সও পেলাম। অথচ একদিন আমার হাত ধরে বাবা এক জায়গায় নিয়ে গেল। সেখানে অনেক ভাঙ্গাচোরা টাইপমেশিন ছিল। অনেক তুমড়ে যাওয়া চশমাপরা বৃদ্ধ ছিল। পরে জানলাম সেখানে উকিলের কাগজপত্র টাইপ হয়। পৃথিবীতে হাইকোর্ট নামে একটা জিনিস আছে। সেখানে অনেক টাইপ করা কাগজ লাগে।

আস্তে আস্তে টাইপ মেশিন আমার খুব বন্ধু হয়ে গেল। প্রায় একমাত্র বন্ধু। সারা দিনের টাইপ সেরে সন্ধেবেলার বিদ্যাসাগর কলেজ আমার যাওয়াই হত না। গেলে দেখতুম—প্রফেসরের মাথাটা সারা ঘরে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। কানে ঢুকতো না কিছু।

বাবা তখন হনুমান হরলালকার কাপড়ের দোকানে খাতা লিখতো। মতি শীল স্ট্রিটে। এখনো লেখে।

সম্প্রতি, একটা পুরো সেদ্ধ ডিম বাবা পকেটে করে কিনে এনে সেদিন রাত্তিরে একা একা একটু একটু করে খেল। ছোট বোন খুব কাঁদছিল। তখন মা, পুরনো কোনো খারাপ রেকর্ড বাজানোর মত একটানা চিৎকার করছিল। আর বাবা, পরম যত্নে ডিমাহার সমাপ্ত করে বলল—পাক্কা

দু'বছর পরে ডিম খেলুম কিনা। আসলে আত্মাকে কষ্ট দিতে নেই, তাই খেলুম। ঠিক দু বছর পরে কিনা, তাই কাউকে দিলুমনি। ওরা তো সারা জীবনে অনেক ডিমই খাবে।

বাবার মাইনে এখন দেড়শো টাকা। সন্দেহজনক ম্যানেজারকে ওয়াচ করার কাজে তাঁকে লাগানো হয়েছে বলে ইদানীং পাঁচ টাকা মাইনে বেড়েছে।

কেউ কথা শোনে না বলে বাবার একটা দুঃখ আছে। ছুটির দিনে বাড়ি থাকলে তিনি এগারো বছরের বড় মেয়েকে আদর করার নামে অনবরত পিঠে কিলচড় মারতে থাকেন। সুযোগ পেলেই। বোন রান্নাঘরে ঘর্মাক্ত মাকে গিয়ে নালিশ করে। রান্না ফেলে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে এসে মা একটানা মিনিট পনেরো বড় অশ্লীল স্বরে বাবাকে বকাবকি করেন। মাকে তখন মা বলে কিছুতেই চেনা যায় না। আর বাবার মুখে এক ধরনের অপমানিত সুখ দেখা যায়। বুঝতে পারি, মায়ের মনোযোগ আদায় করতে পেরে তিনি খুশি হয়েছেন।

কথা বলতে গেলে, একটা সেনটেন্স তিনবার না বললে বাবা বুঝতে পারেন না। মেজাজে থাকলে, বাবার এই অভ্যেসটা নিয়ে মা খুব মজা করে।

সেদিন পিসতুতো বোনের বিয়ে ছিল। খেয়ে-দেয়ে সবাই বাড়ি চলে গেছে। এই পিসতুতো বোনটি একদম আমার বয়সী। বৃদ্ধ আত্মীয়দের ধারণা ছিল, ঝর্নার সঙ্গে আমার একটা স্বতন্ত্র সম্পর্ক আছে। ধারণাটা মিথ্যে হলেও ঝর্ণার সঙ্গে আমার অনেক কথা হত। মেয়েদের অনেক জটিল ও মসৃণ তথ্য আমি তার কাছেই শিখেছি। বিয়ের রাতে সাড়ে বারোটা নাগাদ ঝর্ণাকে তার বরের সঙ্গে, অনেকদিন আগে থেকেই যাকে আমি চাঁদু-দা বলে চিনি—সেজগুজে বসে থাকতে দেখে বলেছিলুম—কিরে ঝুনু, তোর তাহলে বিয়ে হয়ে গেল? জায়গাটা ছিল

আহিরিটোলা। আমরা বরানগরের ন-পাড়ায় থাকি। তাই ঝর্ণা আমাকে বাড়ি পাঠানোর জন্যে ব্যস্ত হল।

বাড়ি যাবার জন্যে বাইরে এসে দেখি, ফুটপাথে পেতে রাখা অতিথি-দের ফাঁকা চেয়ারগুলোর মধ্যে একা বাবা।

তোর জন্যে এক ঘণ্টা বসে আছি। সবাই বাড়ি চলে গেছে। তুই কি করছিলি এতক্ষণ। এখন যদি বাস না পাওয়া যায়।

অথচ আমার তখন খুব সিগারেট খাওয়া দরকার। আর বাবা, কোম্পানিবাগানের পাশ দিয়ে সেণ্ট্রাল এভিনিউএর মোড়ে আসতে আসতে সেই প্রায় মধ্যরাতে আমাকে বলছিলেন, দইটা খুব ভালো ছিল, না? আমি অনেকবার চেয়ে চেয়ে খেয়েছি। তুই?

স্কুলে পড়ার সময় সন্ধেবেলা কাশী জেঠুর গদিতে গিয়ে পি কে দে সরকারের বই থেকে প্যাসেজ ট্রানশ্লেসন করে বাবাকে দেখাতুম। তারপর থেকে কতদিন যে বাবার সঙ্গে কথাই বলি না।

বিডন স্ট্রিট থেকে শেষ মিনিবাসটা পেয়ে গিয়ে বাবাকে সামনের সিটে বসতে বলে আমি একদম পেছনের সিটে বসে সিগারেট ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে বুঝতে পারলুম বাবাকে আমার এই প্রথম খুব বাবা বাবা লাগছে। আর বাবা আমার বন্ধু হতে চায়।

চাঁদুদাকে আর লুকিয়ে লুকিয়ে ঝর্ণার বিছানায় যেতে হবে না। সামনের সিট থেকে বাবা গোপনে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

মধ্যরাতের মিনিবাস হু হু করে ডানলপ যাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত আমি আর বাবা ছাড়া বাসে কোনো প্যাসেঞ্জার নেই। শ্যামবাজার থেকে কেউ উঠলেও উঠতে পারে।

ভরা পেটে শেষ সুখটান দিয়ে সিগারেটটা জানলা দিয়ে ফেলে দিতে গিয়ে, অনেকখানি ধোঁয়া গিলে, মনে হ'ল এই আরামের জন্যে আমার এই সামনের সিটের ভদ্রলোকটির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমার

এই হাত-পা, চোখ, চুল, ক্ষুধা—সবই তো তিনিই দিয়েছেন।

আমার বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্তে আমি কি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবো আরো? আমিও একদিন বাবা হয়ে যাবো, স্রেফ সেকারণে আমি কি আমার এই চির-অকৃতকার্য বাবাকে ক্ষমা করে দেবো? বুঝতে পারি না।

রোজ রাতে দশটা সাড়ে দশটায় বাবা যখন সারাদিন খাতা লিখে পা টেনে টেনে দু'হাত পিছনে রেখে বাড়ি ফেরে—আমি তখন সুভাষ কিংবা হাবুর সঙ্গে বরানগর সাধারণ হাসপাতালের পুকুরপাড়ে বসে গাঁজা খাই। সুভাষ গাড়ি চালায়। হাবু কিছু করে না। বাড়ি ভাড়া পায়। আর একটা প্রাইভেট ভাড়া খাটায়। আর সারা দিন মেয়েদের পেছনে লাগে। একদিন বাবা ওরকম ক্লান্ত বেবুনের ভঙ্গিতে বাড়ি ফিরছে—সুভাষ বিড়ি খাচ্ছিল—আমি বললুম, এই সুভাষ, আমার বাবা। শুনে বাবু আর সুভাষের সে কি হাসি। এই লোকটা তোর বাবা? হতেই পারে না।

তারা নেশাগ্রস্ত ছিল বলে ক্ষমা করেছি। তবু আমি মাঝরাতে নপাড়ার এই ভাড়া বাড়িতে মশারির ভেতর মশা মারতে মারতে বুঝতে পারি না, আমি আমার কোন বাবাকে বিশ্বাস করবো। যে বাবা বাড়ি ব্যবসা বেচে দিয়ে অনেক দিন পরে ছোট্ট মেয়েকে ভাগ না দিয়ে একা একা সেদ্ধ ডিম খায় তাকে; না যে বাবা পা টেনে টেনে পেছনে হাত রেখে রাত দশটায় এই চুয়ান্ন বছর বয়সে অক্ষয় মুখার্জি রোড দিয়ে একশো পঞ্চান্ন টাকার চাকরি করে বাড়ি ফিরে আসে, তাকে।

( মা )

মা এখন দক্ষিণেশ্বরে যায় রোজ। দক্ষিণেশ্বরের কাছে কোন মঠের এক প্রৌঢ়া প্রসন্না সন্ন্যাসিনী মাকে এখন জীবনের সারমর্ম শেখাচ্ছেন রোজ। মা আজকাল বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ আর শ্রীশ্রীমায়ের ছোট ছোট

বাঁধানো তিনটি ছবির সামনে জবাফুল ছড়িয়ে টানা চার পাঁচ ঘন্টা ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকতে পারে। কি করে পারে আমি বুঝতে পারি না।

প্রিয়তমা রমণীটির সামনেও আমি এভাবে টানা চার পাঁচ ঘণ্টা বসে থাকতে পারবো না। অনেক কিছু করে ফেলবো। বকবক করবো এন্তার। সুখী হবো হয়তো কখনো, দুঃখীও হবো, বিষণ্ন বা ক্লান্তও হতে পারি মাঝে মাঝে। মা বোধহয় এসবের বাইরে চলে গেছে। রোজ বিকেলে সন্ধের মুখে বেরিয়ে যাবার সময় চার বছরের ছোট মেয়ের আকুল কান্না মাকে আজকাল একটুও আটকাতে পারে না।

অথচ মাসের শেষ দিকে সংসার খরচের টাকা ফুরোলে, একটু সর্দি-টর্দি যদি হয় কখনো, দেখেছি মায়ের মুখ কেমন পাহাড়ী মেষপালকের মত হয়ে যায়, যার অনেকগুলো পশু সারা দিনের চারণপর্বে হারিয়ে গিয়েছে। বিহ্বল ও বিরক্ত সেই মুখে কান্নার মেঘ ঝুঁকে আসে। সেই মাকে তখন আমার খুব মায়ের মতন লাগে।

বিয়ের সময় মায়ের বয়েস ছিল চোদ্দ। বাবার একুশ। উনিশশো আটচল্লিশ সাল। সদ্য স্বাধীন কলকাতার ছিদাম মুদির লেন থেকে হুগলী জেলার দামোদরতীরের এক সম্পন্ন ব্যবসায়ী শুধু রূপ ও সারল্য দেখে মাকে বড় ছেলের বৌ করে এনে ফেললেন খোলা আকাশ, ধানখেত, আম-জাম আর তাঁতকলময় এক গ্রামে। সকালবেলার বেণী দুলিয়ে স্কুলে যাওয়া আর সন্ধেবেলায় হারমোনিয়ামে চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে··· ভুলে গিয়ে মা দেখল আট চালায় পাহাড় হয়ে আছে সুতোর বাণ্ডিল বাঁধা গাঁট, এই সুতো দিয়েই তবে শাড়ি টাড়ি তৈরি হয়। গোয়ালে বাচ্চা দিচ্ছে গাইগরু। দুধ জিনিসটা আসলে গরুর বাঁট থেকেই দুইতে হয়। খিড়কিপুকুরে স্নান করার সময় কলকাতার অন্ধকার কলঘরের শাসন ও জল ব্যবহারের কৃপণতাময় ঐতিহ্য কোনো কাজে লাগে না। সিনেমা দেখে পাশের গ্রাম থেকে ইস্কুলবাড়ির পাশ দিয়ে চোৎদারদের আমবাগান বাঁয়ে

ফেলে বাড়ি ফেরার সময় কখনো কখনো চাঁদের হাসি এত বাঁধভাঙ্গা হয়ে ছড়িয়ে থাকে যে তা নিয়ে গান গাইতে গেলে হাসি পেয়ে যায়।

পুরুষেরা কলকাতার বাড়িতে দোকান দেখছে। এখানে সন্ধের কাঁধে হাত দিয়ে রাত আসে। সদর থেকে রান্নাবাড়ি ওব্দি হেঁটে যেতে গা ছমছম করে। বিকেলবেলায় কাঠঠোকরা আমড়াগাছে ঠোঁট ঠুকে ঠুকে বলে—অপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো।

রাতদুপুরে কর্তা কিংবা শ্বশুরমশাই কলকাতা থেকে অতিথি নিয়ে হঠাৎ চলে আসে। সদরের সিংদরোজায় কর্তা হলে কড়া নাড়ার শব্দ হয়। শ্বশুর হলে বাজখাঁই ভরাট গলা পাওয়া যায়—বড় বৌমা। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে মা দেখতো ঘরের লোকের হাতে হরিণের মাংস। রান্না করো।

বড় হয়ে মায়ের শাড়ির আলমারির তলা থেকে একটা বই পেলুম। একান্ত গোপন কথা। সেই আমার প্রথম অবিশ্বাস। মাও তাহলে মানুষ।

ন-পাড়ার এই ভাড়া বাড়িতে জায়গা কম বলে ব্যবহারিকভাবে অদরকারী জিনিসগুলো খাটের নিচের শ্যাওলা ধরা একটা তোরঙ্গে ঢোকানো আছে। সেখানে মায়ের একটা কমবয়েসী নিষ্পাপ বাঁধানো ছবি আছে। বাস্তবে সেই ছবির মাকে আমি কখনো দেখিনি বা দেখতে পাবো না বলে আমার একটা দুঃখ আছে, একটা সুখও আছে। বড়লোকের ছেলেমেয়েদের গায়ে একটা ঘামতেল মাখানো থাকে। সেই ঘামতেলের নাম পয়সা। ছবির মায়ের গায়ে সেই ঘামতেলের ফিনিফিনিং আছে বলে খারাপ লাগে। আমার আসল মায়ের ছেচল্লিশ বছরের ভগ্নস্তূপ স্বাস্থ্য। সাতটি জীবিত ও একটি মৃত সন্তানের জন্মদান ও প্রতিপালনের পরে শুধুই মানুষের আবহাওয়া তার চারপাশে—উনুনের সামনে সত্যিকারের ঘামে ভেজা এই মা পোস্ত আর বিউলির ডাল দিয়ে ভাত বেড়ে দিলে মনে

থাকে না—ছেলেবেলায় কিংবা আমার জন্মের আগে মা ঠিক কি রকম ছিল। সেই অচেনা মাকে আমার কোনো দরকার নেই। বিশ্বাস নেই।

সেদিন ভোররাতে দর্জিপাড়ার মেজদাদু মরে গেলে সেজোকাকার স্কুটারে চেপে ঝর্ণা এসে বলল, বড়মাইমা, দাদু আর নেই। বাড়ির সবাই সেখানে চলে গেল। শিশুদের শ্মশানে বোধহয় মানায় না বলেই মা ছোট বোনকে অনেক কান্নাকাটি সত্ত্বেও নিয়ে গেল না। জুয়াড়ী ও স্বেচ্ছাচারী মেজদাদু যিনি যৌবনে অশ্বারোহণ ভালবাসতেন তাঁকে আমি সন্দেশদাদু বলতাম কারণ জীবনে যে কয়েকবার তাঁর কাছে ঘটনাচক্রে গিয়ে পড়েছি ততবারই তিনি আমাদের সন্দেশ খাইয়েছেন। মৃত্যু ও অশৌচ আমি বিশ্বাস করতে পারি না বলে কোন দিন আমি শ্মশানবন্ধু হতে পারিনি। ফলতঃ পাঁচ বছরের ছোট্ট বোনের সঙ্গে নানারকম গল্পগুজব ও খেলাধূলা করতে হল। মায়ের দিয়ে যাওয়া একটা টাকা দিয়ে সে আমাকে লুকিয়ে পুরো একটা রাজভোগ একা খেয়েছে বলে আমার নকল কান্নায় সে বিস্তর মজা পেল যা দেখে আমারও এক ধরনের সার্থকতার সুখ হয়েছিল। তাড়াতাড়িতে রেঁধে রেগে যাওয়া শুধু ভাত খেতে গিয়ে দেখি ডালটা দুর্গন্ধময় হয়ে গেছে। তরকারি নেই। পাড়ার চায়ের দোকানে ডিম সেদ্ধ ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না।

মড়া পুড়িয়ে ফিরে এসে মা বলল, সামাজিকতা না মানলে আমার কাছে থাকা চলবে না। আমার অপরাধ আমি অশৌচ না মেনে ডিম খেয়েছি। কোনো খাবারই যে ছিল না সেটা কোনো অপরাধ হতেই পারে না। ছোট মেয়েকে ফেলে যাওয়া সম্পর্কে অভিযোগ করলে মা বলল, আমার আর ভালো লাগে না। তোরা কি করতে আছিস।

আমি বিশ্বাস করি না একজন জীবিত শিশুর চেয়ে একজন মৃত বৃদ্ধের প্রতি বেশী সম্মান দেখানো উচিত।

তবু আমি মাকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারিনি। দূরে চলে যাওয়া বা কাছে থাকা কোনোটাতেই আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি না।

আমার ছোটখাটো প্রয়োজনগুলো আমার মায়ের মত পৃথিবীর আর কোন নারী কোন দিন বুঝতে পারবে না আমি জানি। বোধহয় সে কারণেই ভালোবাসা ও দাম্পত্য আমার অর্থহীন মনে হয়। সেসব হল আসলে শাদা, নিরুপায় ও নানারকম মেনে নেওয়া।

( সেজোকাকা )

যৌবনে সেজোকাকা ছিলেন ঘোর নাস্তিক। ঈশ্বরসন্ধানে গোমুখ পেরিয়ে জনমানবহীন পার্বত্যপথে একবার তাঁর খুব আমাশা হয়েছিল।

বাবাকে চিঠি লিখেছিলেন—বড়দা, টাকা পাঠাও, আমি মরে যাচ্ছি।

গ্র্যাজুয়েট হবার পরে দোকানে বসবার ভয়ে তিনি বন্দুক হাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এখন তিনি পুলিশের ও-সি।

ছোটবেলায় তীর-ধনুক দিয়ে তাঁর পাখি মারা দেখেছি আমরা। একটু বড় হয়ে কলকাতার বাড়ির ছাতে বুকে বালিশ দিয়ে কাক মারা দেখেছি। নিচের রাস্তায় ঠিক বৃত্ত হয়ে ঝরে পড়তো মৃত কৃষ্ণপক্ষীকুল। আমরা ছুটোছুটি করে ডাস্টবিনে ফেলে আসতুম। যে যতগুলো ফেলবে সে ততগুলো রসগোল্লা। রসগোল্লার লোভে তখন থেকেই বোধহয় মিথ্যে কথা বলতে শিখি।

সেজোকাকা শিকার ক'রে ক'রে বুনো খরগোশ, খরহাঁস, জলপিপি, ঘুঘুপাখি ইত্যাদি কত কি যে আনতো। মা মিথ্যে করে রাগ দেখাতো কিন্তু বেঁধে দিতো ঠিক আর আমরা খুব মজা করে খেতুম।

পুজোর সময় সেজোকাকা স্কুটার চাপিয়ে কুয়ো ভ্যাদিস জুতো কিনে দিতো। একবার আমার ভাই হাবলুর আর কিছুতেই জুতো পছন্দ হয়

না। সারা কলকাতার সবকটা দোকান যখন ঘোরা শেষ, তখনই আমি বুঝতে পারলুম, হাবলু আসলে স্কুটার চাপার সুখের জন্যে জুতো পছন্দ হচ্ছে না বলে আসছে।

এখন যিনি আমার সেজোকাকিমা তিনি বাড়ির সামনে এসে খেলা থেকে ডেকে আমার হাতে ছোট ছোট চিঠি দিতেন। সেরকম একটা চিঠি দুপুরের ঘুম থেকে তুলে সেজোকাকার হাতে দিলে কাকা বলেছিল—এই ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানির কি শেষ নেই? আমি পরে মাকে গোপনে জিগ্যেস করেছিলুম—ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানি মানে কি গো মা?

বাড়ি থেকে চলে যাবার আগে সেজোকাকা তবলা বাজাতো। আর আমাকে ডেকে ডেকে বলতো—এই বেঁটে, বলতো তবলাটা কি বলছে। আমি যখন যা ইচ্ছে হতো বলে দিতুম। একবার বলেছিলুম—চান করবো না, ভাত খাবো না, বেড়াতে যাবো। চান করবো না ভাত খাবো না বেড়াতে যাবো। সেজোকাকা খুব হেসেছিল।

এই সেজোকাকা এখন আর একদম হাসে না। আমাকে আই-এ-এস কিংবা ডবল্যু-বি-সি-এস-দিতে বলে। তবলা বাজায় না। কিছু জিগ্যেস না করলে নিজের থেকে কোনো কথা বলে না। দু বছর অন্তর কোয়ার্টার পাল্টায়। সেখানে টি-ভি ফ্রিজ বিলিতি কুকুর ইমার্সন হিটার এইসব।

বাড়ি-দোকান বিক্রির পর থেকে মা কিংবা দাদা কিংবা বাবা মাঝে মাঝেই এই সেজোকাকার কাছ থেকে টাকা চেয়ে আনতো। একদিন শেষতম ঠিকানায় খুঁজে খুঁজে গিয়ে দেখলুম দুনম্বর চৌরঙ্গী টেরেস আসলে চৌরঙ্গী থেকে অনেক দূরে, রবীন্দ্রসদনের কাছে। দরজা খুলে দিয়েই কাকীমা বললেন—ডেরার সন্ধান পেলি কোথায়?

ভেতরে তখন একজন কালোমতন লোক জাঙ্গিয়াপরা সেজোকাকাকে চাপড়ে চাপড়ে ম্যাসেজ করছিল।

গত বইমেলায় সেজোকাকার সঙ্গে শেষ দেখা। সঙ্গে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্র বুলা, কাকার ছেলে। তার হাতে ছিল অ্যাটম বোমা তৈরির ইতিহাস জাতীয় একটা মোটা ইংরেজি বই। আর কাকার হাতে দেখলাম—শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী।

( ন-কাকা )

ন-কাকার বিছানায় অনেক ছারপোকা অথচ তার কোনো অসুবিধা হয় না। ন-কাকার গোঁফ খুব মোটা। গলার স্বর নাকি-নাকি ও উচ্চতা চার ফুট চার ইঞ্চি। এর মধ্যে ন-কাকার পিঠে একটি চমৎকার কুঁজ আছে।

আমি যখন ক্লাশ সিকসে পড়ি তখন ন-কাকা আমার কিংবা দাদার সঙ্গে দাবা খেলতে গিয়ে হেরে যেতো।

ছোটকাকা সব পরীক্ষায় তরতর করে এগিয়ে যেতো আর ন-কাকা এক ক্লাশে অনেক বছর ধরে থাকতে থাকতে স্কুলে যাওয়াই ছেড়ে দিল। তারপর দর্জির কাজ শিখতে শুরু করলো। কুঁজো হয়ে কাজ করতে করতে আর পিঠে বালিশ দিয়ে শোয়া অভ্যাস ছিল বলে আস্তে আস্তে একদিন পিঠে কুঁজ হয়ে গেল।

দেশের বাড়িতে ন-কাকা একা একা থাকে আর জমিটমি দেখাশোনা করে। দেশের বাড়িতে দুর্গাপূজো হয়। একবার পূজোর সময় কালী বলে একজন লোক যে যৌবনে কয়লা বয়ে দিতো অথচ এখন ভিখিরি হয়ে গেছে—আমার কাছে এসে অনেকক্ষন ধরে ভাত খেতে চাইছিল।

আমি ন-কাকাকে বললুম, কালীকে কিছু খেতে দাও।

ন-কাকা বলেছিল, চাষ করতে কি পয়সা লাগে না?

অথচ দেশে সারদা ভবন নামে যখন প্রেমানন্দ মঠের গেস্ট হাউসটি তৈরী হল তখন যাবতীয় কড়িবরগা নকাকা দিয়েছিল। সারদা ভবনের দাতাদের লিস্টে ন-কাকার নাম আছে।—দাতা শ্রীবিজয়বসন্ত দাস।

আমি এম-এ পরীক্ষা দিচ্ছি শুনে ন-কাকার বাল্যবন্ধু আমার ছোটবেলার মাস্টারমশাই সুদর্শন চক্রবর্তী আমাকে বললেন—পরীক্ষার পর নোটগুলো দিস। প্রাইভেটে বসবো। ন-কাকা শুনে বলল—কাউকে নোট দিবি না। পড়বার সময় ওরা পয়সা দিয়েছে ?

( ভাই-বোন )

আমার বড় বোন আমাকে রোজ সকালে ঘুম থেকে তুলে দেয়। আমাকে প্রায়ই সংস্কৃত মানে বই কিনেদিতে বলে। সে এখন ক্লাশ সেভেনে পড়ে। আজকাল শরীর খারাপের অজুহাতে সে প্রায়ই স্কুলে যায় না।

কাঁচের গ্লাস বা চায়ের কাপ ভেঙ্গে ফেললে বা ছোট বোনের সঙ্গে অকারণে ঝগড়া মারামারি করলে তাকে যত বকুনি বা প্রহার করা হয় সে তত হাসতে থাকে। একদিন অসম্ভব রাগে তাকে অনেকক্ষণ মারধোর করার পর সে কেঁদে ফেলে। বকুনি দিলে সাধারণত যে হেসে থাকে, তাকে কাঁদাতে পেরে বড় খুশি লেগেছিল সেদিন, মনে আছে।

আমার পরের ভাই সারাদিন অঙ্ক করতো ঘরের এক কোনে বসে। কলেজ লাইফে। তার কোনো বন্ধু নেই।

এখন সে সেজোকাকার থ্রু দিয়ে একটা চাকরি পেয়েছে। সেটা এত দূর যে যাতায়াতেই আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। বেরিয়ে যায় সকাল ছটায় আর বাড়ি ফেরে সাতটা-আটটা, সন্ধ্যেবেলা। এসেই ঘুমিয়ে পড়ে বলে তার সঙ্গে আমার ছুটির দিন ছাড়া দেখা হয় না।

সে ছ'মাস চাকরি ক'রে তিনশো টাকা মাইনে থেকে টাকা জমিয়ে কিভাবে যেন একটা ঘড়ি কিনে ফেললো। আমার দুশো টাকা শুধু হাতখরচ তাও সবান্ধবে চা-সিগারেট মজলিসি নেশাতে সব দশ দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়।

একদিন মায়ের কাছে শুনলাম, ভাই আমার সম্পর্কে বলেছে—ও

কিসের এত লাটের বাঁট যে একা এও খরচ করে ?

তার পেট এত খারাপ যে কোনো খাবারই ঠিক ঠিক হজম হয় না, না বাড়ির না বাইরের। অনেকদিনই অফিস যাবার সময় বাস স্ট্যাণ্ডের অর্ধেক রাস্তা গিয়ে বাড়ি ফিরে আসে ও কোনো কথা না বলে গম্ভীরভাবে পায়খানায় ঢুকে যায়।

সে আমার চেয়ে একবছরের ছোট বলে ছোটবেলায় তার সঙ্গে আমার সবচেয়ে বেশি মারামারি হতো।

তার পরের ভাই ভক্ত মানুষ। সে বি-কম পার্ট-ওয়ান ফেল। আমার বন্ধুবান্ধব বাড়িতে এলে সে প্রশ্ন করে—জীবন কি ? মুক্তি কি ?

একদিন তার একটা চিঠি এল।

লালুভাই,

তোমার সহিত সাক্ষাতের আগে পর্যন্ত আমি সবিশেষ মনোকষ্টে ছিলাম। তোমার সহিত কথাবার্তা বলিয়া আমি মুক্তির সন্ধান পাইয়াছি। আমি দীক্ষা নিতে চাই। কবে কোথায় যোগাযোগ হইতে পারে জানাইয়া পত্র দিও।

ইতি

শ্রীবিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

লালু বাড়ির বাজার করে। রেশন তোলে। দীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে আমি তাকে একবারও ভেবে দেখতে বলিনি।

কোনো একদিন সে কোনো মিশনের মহারাজ হয়ে গেলে আমার খারাপ লাগবে কিনা আমি বুঝতে পারি না। শুধু বুঝতে পারি, লালু যে মুক্তির কথা বলে, সেই মুক্তিও একধরনের বন্ধন। আর সেই বন্ধনের ভার অনেক, অনেক বেশি।

( দাদু )

একটা চিৎকার আমি আজও মাঝে মাঝে শুনতে পাই। বাম অঙ্গ

প্যারালিসিসগ্রস্থ শীর্ণ-আত্মা দাদুকে একজন খালি গা অনেক পাথুরে মালা পরা ওঝা মন্তর-টন্তর ঝাঁড়ফুকসহযোগে দেশের বাড়ির আটচালায় জোর করে হাঁটাচ্ছে। অপদেবতাকে উদ্দেশ করে দাদুর গায়ে মন্ত্রপূত ঝাঁটা পেটাচ্ছে। সঙ্গে চলছে বীভৎস খিস্তি আর গালিগালাজ। আটচালায় ভেঙ্গে পড়েছে সারা গাঁয়ের মানুষ। দাদুর অমানুষিক চিৎকার আর গাঁয়ের মানুষজনের দিকে কোটরাগত করুণ চোখে তাকানো মনে পড়ে। আজও দেখতে পাই সেই চোখে কী তীব্র অবিশ্বাস ছিল।

আজ তোমরা যারা মজা দেখছো আপাত-অসহায় মুখ করে, তারা সবাই আমার শংকরী মাছের চাবুক আর দামী বেতের পরিচয় আজীবন পেয়েছে। তোমাদের দুর্বল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে প্রতিহিংসাতৃপ্ত এক একটি মুখ নিয়ে আজ তোমরা ঘরে ফিরবে।

দু'দিন চলেছিল ওঝার অত্যাচার। সকাল-সন্ধ্যে দাদুর চিৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত চরাচর। বিকেলে দাদু এমনিতে বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে 'বাবলু' বলে ডাকলে আমরা বোদের পাড়ের খেলার মাঠ থেকে শুনতে পেতাম। সেই বাজখাঁই গলার প্রাণান্তকর চিৎকার আজও প্রায় মর্মে গেঁথে আছে।

ঠিক দু বছর দাদু প্যারালিসিসে ভুগেছিল। ঠাকুমা আগেই মারা গেছে। সিঁড়ির মুখে দাদুর ঘর থেকে পালাক্রমে বাড়ির সবাইকে দাদু কাছে ডাকত। জল চাইত। কেউ আসত না।

শুধু বড় বৌমা, মানে আমার মাকে দেখেছি দাদুর মুখ ধুইয়ে দিতে; ভাত খাইয়ে দিতে; বেডপ্যান পাল্টে দিতে।

এভাবে অনেক দিন চলার পরে একদিন সকালে দাদুর ঘরে খুব ভিড় হল। দাদু মারা যাচ্ছে।

ন-কাকার হাতে ছিল সিন্দুকের চাবি। বাবার হাতে গীতা। আর সবাই গোল হয়ে দাদুকে ঘিরে। খুব সজ্ঞানে গীতা পাঠ শুনতে শুনতে

আস্তে আস্তে দাতু মারা গেলেন।

ছ ফুট লম্বা চেহারার একটি উজ্জল শাদা গোঁফ ছিল দাতুর। বিকেল-বেলায় ছড়ি হাতে দাতুর প্রশ্ন ছিল, কে কটা লিচু চুরি করেছ? ঠিক ঠিক বললে কম মারব। আমি চুরি করতাম সবচে বেশি; স্বীকার করতাম সবচে আগে। বেত খেতাম সবচে কম।

সেজোকাকা খবর পেয়ে বিকেলবেলা গাড়ি এনে ব্যাকসিটে মৃত দাতুকে কোন রকমে শুইয়ে কলকাতা নিয়ে গেল। বিদ্যুৎ-চুল্লীতে পোড়ান হবে। সঙ্গে গেল বাবা।

সারা গাঁয়ের লোক বলল—আমরা কি আমাদের পূর্ণ দাসকে কাঁধে নিতে পারতুম নি? আমরা কি নেই?

# লোভী কুকুর ও ধূর্ত শিয়ালের গল্প

অফিস থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে পা দিয়েই প্রায় বাজে কোনো আধুনিক গান শুরু হলে সঙ্গে সঙ্গে রেডিও বন্ধ করে দেবার মেজাজ একটা সিগারেট ধরায় অনুপ। ব্রহ্মতালু ওব্দি মানুষের আরামের জন্যে তৈরি সিগারেট থেকে যতটা ধোঁয়া পাঠাবার ক্ষমতা তার আছে ঠিক ততটাই ধোঁয়া পাঠিয়ে প্রাণপণে ভাববার চেষ্টা করে, মাথা ধরাটা এবার কমে যাবে। অফিসে এসে পৌছলে তার জীবনের একটি প্রধান সমস্যা, সকালবেলার ড়িড়বাস যাকে অফিস টাইমের রাশ বলা হয়, সেসব দেখলে অনুপের মাথার মধ্যে কুরকুর কুরকুর করে একটা রাগ তিনশো পিঁপড়ে যেভাবে একটা গোটা মরা আরশোলা খেয়ে ফেলে সেইভাবে অনুপকে আস্তে আস্তে খেয়ে ফেলতে থাকে। মাথা ধরাটা শুরু হয়। প্রথমে পরিবহন ব্যবস্থা, তারপর মানুষের সহনশীলতাবোধ, তারপর মানুষের ভোট দেবার ইচ্ছে, তারপর ভারতবর্ষের রাজনীতি নামক কেলোর মায়ের ওপর তার রাগটা আটকে যায়। পরিবহনমন্ত্রী, যথেষ্ট সহনশীল, ভোটদাতা বা রাজনৈতিক পার্টির সক্রিয় কর্মী ইত্যাতি কোনোটাই হতে পারেনি বলে, না, অনুপের কোনো দুঃখ নেই। ফ্রান্সে বা আমেরিকায় না জন্মে তাকে কলকাতায় জন্মাতে হয়েছে বলেও, না, অধিকাংশ আঁতেল বাঙালি যুবকের মত, অনুপের কোনো দুঃখ নেই। শুধু দুপুর তিনটে নাগাদ অফিসের ফাইল, বিলের জটিল হিসেব থেকে যন্ত্রনায় ছিঁড়ে যেতে থাকা মাথাটা তুলে যখন ভাবে—পাঁচটা কেন এখনো বাজেনি—পৃথিবীর সভ্যতা তখন অল্প অর্থহীন মনে হয় অনুপের। এখন ফুটপাথের হকারদের ভিড় আর ছুটির পরের

মানুষজনের যার যেদিকে খুশি চলে যাওয়া দেখতে দেখতে সারা পৃথিবীকে হিংসে করতে থাকে অনুপ। অনুপ মুখার্জি ছাড়া পৃথিবীর কোনো যুবকের মাথার মধ্যে এই ভরা বিকেলবেলায় দপাং দপ খটাং খট করে অন্তহীন তাঁতকল চলছে না। কি করলে এই মাথাধরা কমবে অনুপ বুঝতে পারে না। কলকাতায় আসার আগে এই বীভৎস বৈকালিক মস্তিষ্কপীড়ন তার ছিল না। কলকাতায় আসার এক বছরের মধ্যে চশমা, দুবছরের মধ্যে বাঁধা পেটের অসুখ, আর বছর চারেকের মধ্যে এই করুণ মাথাধরাটি তাকে উপহার দিতে পেরেছে কলকাতা।

অন্য যে কোনো দিকে যাবার আগে অনুপ বুঝতে পারে কলেজ স্ট্রিট তাকে বাঁধা বেশ্যার মত টানছে। কলকাতায় এসে কলেজ স্ট্রিট চেনার পর কি করে যেন তার এই মাথার যন্ত্রনার মতন বিরক্তিকর অথচ একদম নিজস্ব হয়ে গেছে এই কলেজ স্ট্রিট। সন্ধ্যেবেলায় ভিড়কোলাহলের মধ্যে হেলান দিয়ে দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে থাকা বা অনর্গল বকবক করা, কফি-খানার সাদা উর্দিপরা বেয়ারাকে নাম ধরে ডেকে জল চাওয়া অনেক দূরের কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে অনেক কথা হয়ে যাওয়া, এসবের একটা আলাদা নেশা আছে।

চাকরি জিনিসটা হাতে পাবার আগে চাকরি পেলে ওই করবো তাই করবো সবাই ভাবে ; কিন্তু পাবার পর অনেকেই সেসব করে উঠতে পারে না। কেউ কেউ অবশ্যই পারে। তারা ব্যতিক্রম। তারা নিয়ম প্রমাণ করে। একবছরের মধ্যে ঘড়ি কেনে, বাড়ি সারায়, মাকে বেড়াতে নিয়ে যায়, বোনকে সিনেমা দেখার পয়সা দিয়ে ভালো করে পড়াশোনা করতে বলে, বিয়ে করে। অনুপ কোনটাই করে উঠতে পারেনি, কারণ সে, একটু মাতাল। সন্ধ্যেবেলা একটু অন্তত মদ খেলে, তার মাথা ধরাটা সেরে যায়।

হস্টেলে বা মেসে থাকার ব্যবস্থা আজো করে উঠতে পারেনি ব'লে,

পারিবারিক দায়িত্ব কিছুটা থেকে গেছেই ব'লে, চুল আঁচড়াবার সময় রোজ কিছু কিছু চুলের উঠে যাওয়া অনুপ যেভাবে মেনে নিয়েছে, সেভাবেই মেনে নিয়েছে, মদ খেয়ে কিংবা না খেয়ে—তাকে রোজ রাতে বাড়ি ফিরতে হবে। হবেই। ইচ্ছে থাকলেও, তাই বন্ধুর বাড়িতে বা খারাপ পাড়ায় সে সারারাত থাকতে পারে না!

অথচ মদ না খেয়েই যার পৃথিবীর সভ্যতাকে অল্প অর্থহীন মনে হয়, নিজের নৈমিত্তিক মাথাধরা সারিয়ে দেবার মতন ওষুধ পৃথিবীর জানা নেই বলে—ডাক্তার বলেছে কোনো নির্মল পার্বত্য প্রদেশে চাকরি নিয়ে চলে যান, সিনেমা নেশা আর উত্তেজনা জীবন থেকে বাদ দিয়ে দিন, ভালো থাকবেন—যা বেঁচে থাকার পক্ষে প্রায় অসম্ভব প্রকল্প; মদ খেয়ে এইরকম অনুপের বাড়ি না ফেরার ইচ্ছে হওয়া, বা ঘরবাড়ি ভাইবোন বৌ মা-বাবা ইত্যাদি সম্পর্ক সমূহকে আননেসেসারী মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তবু অনুপ, বুকস্ মেডমি মোর স্টুপিড—কাফ্‌কার এরকম একটা লাইন পড়লেও, বুঝতে পারে, বুঝতে চায়—বইটই পড়েই, যা সে জীবন বা বেঁচে থাকা সম্পর্কে মোটামুটি বুঝেছে: মানুষের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্যা তার পেট; দ্বিতীয় সমস্যা পেটের নিচের শরীরাংশটি; তৃতীয় ও প্রায় শেষ সমস্যা মাথা, মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে নেওয়া, তৈরি করা, বা মাথাকে নিশ্চিন্তে সমালোচনাহীন আরাম দেওয়ার চেষ্টা করা।

অনুপের প্রথম সমস্যাটি, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দুর্দশা ও পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রাধীন সরকারের কল্যাণে, মিটেছে। রিলিফ এ্যাণ্ড ওয়েল ফেয়ার বিভাগের ইন্সপেক্টার, অফিসে তাকে এরকম বলা হয়। দ্বিতীয় সমস্যাটির জন্য মানুষের তৈরি নিরাপদ নিয়মটির নাম বিবাহ; কেউ কেউ যাকে আইনসম্মত বেশ্যাবৃত্তি বলেছেন। কথাটা ঠিক কিনা অনুপ জানে না। তবে কথাটাকে স্বীকার করে নিলে বিয়ে করার ইচ্ছেটা অনেক কমে যায়, অনুপ লক্ষ্য করেছে। সম্প্রতি বাবা মারা যাওয়ার কারণে, একমাত্র বৌদি

আর বৃদ্ধা মায়ের রাত্রিকালীন খাওয়াদাওয়ার সময়কার কদাপি কচিৎ মৃদু অনুযোগ ছাড়া, আর দু তিনজন কন্যাদায়গ্রস্ত অফিস কলিগ ছাড়া অনুপকে কেউ বিয়ের কথা বলে না। মদ খেতে শিখে অনুপ জেনেছে, নিজের আয়ের মধ্যে নিজের খরচ সীমাবদ্ধ রাখা—পৃথিবীর কঠিনতম কাজ, যদি আয়টি সীমাবদ্ধ ও ক্ষুদ্রকায় হয়। মাসের কুড়ি তারিখের পর অনিবার্য ভাবে টাকা কমে আসে, মাথাধরা বেড়ে যায়, মদ খাবার পয়সা থাকে না, সুতরাং ধার হয়, ধার হতে থাকে। মাইনে পেলে সেই ধার শোধ দিতে হয়, পরে আবার ধার পাবার আশায়, অভ্যাসে। এই গোল অভ্যাসটির মধ্যে বিয়ে, মানে একটি রক্তমাংসের যুবতীর সুখদুঃখ, সেবা অসুখ, শাড়ি কেনা, শায়া ব্রেসিয়ার হিন্দিসিনেমা মিনিবাসে বাড়ি ফেরা—এইসব, অনুপ সসম্মানে প্রেস করতে পারে না। না। .. সুতরাং অনুপের দ্বিতীয় সমস্যাটি আজো অটুট। নেশা বেশি হয়ে গেলে, পকেট ভারি থাকলে, নিজের মা বা প্রিয়তম বন্ধুর চেয়েও সহ্য-করা-যায় ধরনের সুন্দরী বেশ্যাসঙ্গ, অনুপ বেশি পছন্দ করে। নেশার কল্যাণে, এ ব্যাপারে তার তেমন কোনো কমপ্লেক্স নেই।

যা বাকি থাকে, সেই তৃতীয় সমস্যাটি, মাথা। নিজের মাথা হাজার রকম ভাবে খাটিয়েও অনুপ এই সমস্যাটির কোনো সমাধান খুঁজে বার করতে পারেনি। টেমপোরারি রিলিফ হিসেবে মাসের প্রথম দিকে নিজের পয়সায়, শেষদিকে ধার করে সামান্য বা বেশি পরিমাণ মদ্যপান করা ছাড়া। সমাধানের বদলে তাতে সমস্যা গাঢ়তর হয় অনুপ জানে। পৃথিবীতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাথাটি দুহাতে চেপে ধরে অনুপ এই নিষ্ঠুর সত্যটি ব্রেনসেলের প্রত্যেকটি অনুপরমাণু দিয়ে বুঝতে পারে। তখন প্রেম, পিতৃত্ব, যৌনতা, ভ্রমণ—কোন কিছুই যে মানুষের প্রকৃত কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে না, অনুপ বুঝতে পারে। বুঝতে হয় তাকে।

আজ কত তারিখ, মনে পড়ছে না দেখে অনুপ আকাশের দিকে

তাকায়। ঘুম ভাঙতে দেরি হয় বলে অনুপ খবরের কাগজ পড়ে না। মার্কসিস্ট বন্ধুদের কাছে এ কারণে সে আউটসাইডার। তারিখ মনে না থাকা, খবরের কাগজ না পড়া—এগুলো কি আউটসাইডারের লক্ষণ? আজ কত তারিখ মনে পড়লে আমার কি কোনো উপকার হবে—আজ কত তারিখ মনে পড়লে আমার কোন কোন ঝামেলা মিটে যাবে, ভাবতে একজন ভিখারী বালিকা অনুপের কাছে এসে হাত পাতলো। খেঁকি কুকুরের কান্নার মতন একটা আওয়াজ বেরোলো তার গলা দিয়ে। অনুপ দেখল, মেয়েটির অপুষ্ট শরীরে পাঁউরুটির ওপর শাদা মাখনের মতন কালো ময়লার স্তর মাখানো বলাটা ভুল, লেগে আছে বললেই ঠিক বলা হয়। সর্বহারার শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই—এই বাক্যটি থেকে হেনরী মিলার শৃঙ্খলের জায়গায় যৌনতা বসিয়ে দিয়েছিলেন। ভিখারী-দের মার্কসিস্টরা সর্বহারা বলে না, তবু আমি যদি এই মেয়েটিকে সর্বহারা বলি, তবে এর হারাবার মত কি আছে? শৃঙ্খল না যৌনতা? এই প্রশ্নে মার্ক্স বা মিলার দুজনকেই ব্যর্থ হতে দেখে মাথা ধরাটা অল্প যেন কমলো একটু। খুশি হয়ে অনুপ মেয়েটিকে বলল—আজ কত তারিখ বলতে পারলে একটা টাকা দেবো। পারবি বলতে? আজ কত তারিখ?

আজ কত তারিখ, এই শব্দ তিনটি উচ্চারণের সময় একটু জোর দিয়ে দাঁত চেপে উচ্চারণ করেছিল অনুপ—করেই বুঝতে পেরেছিল এই উচ্চারণের মধ্যে রাগ, ব্যর্থতা, আত্মরতি, আর উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীনতা আছে; দায়িত্ব-নিতে-চায় প্রাস বিয়ে-করতে-পারলে-মন্দ-হয়-না ধরনের একজন যুবকের পক্ষে—যাকে তারিখ মনে না রাখার, বা খবরের কাগজ না পড়ার কারণে, বামপন্থী বিপ্লববাদী বন্ধুরা আউটসাইডার বলে থাকে—তার পক্ষে যেরকম রাগ, ব্যর্থতা, আত্মরতি আর উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীনতা থাকা স্বাভাবিক।.... কলিন উইলসন পড়ে অনুপ জেনেছে, যারা মানুষের সম্পর্ক নিয়ে বিশেষ

ভাবে ভাবে-টাবে, তারাই আউটসাইডার। যারা ভাবে না, তারা কি তাহলে ইনসাইডার? ইনসাইডারদের জীবনে ভাবনা চিন্তার যদি সত্যিই তেমন কোনো ভূমিকা না থাকে—তাহলে খবরের কাগজ বা তারিখ জেনে তাদের লাভ কি?

টেলিফোন অপারেটর মিস্ স্বপ্তিকণা পাল এই অবস্থায় অনুপকে দেখে বলে উঠলেন—বাড়ি যাবেন না, কারু জন্যে অপেক্ষা করছেন নাকি?

অনুপ ভিখারি বালিকার থেকে চোখ তুলে স্বাস্থ্যবতী শাদা যুবতীর দিকে মন দিয়ে তাকায়। এই স্বপ্তিকণা পালের বাবা হরিপদ পাল তার সিনিয়র অফিসার, দিদি স্মৃতিকণা পাল এই অফিসেরই কেরাণী, জামাইবাবু বাণীব্রত সেন অনুপের সহকর্মী, ইন্‌স্পেক্টর। এসব কারণে হরিপদ পালকে অনেকেই আড়ালে হরিদাস পাল বললেও সামনে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। আর অনুপ মাঝে মাঝেই স্বপ্তিকে 'আপনার তো রিলিফ অফিসে ফ্যামিলি অ্যাপয়েন্টমেণ্ট' বলে থাকে বলে স্বাস্থ্যবতী টাইপিস্ট থেকে টেলিফোন অপারেটার হয়ে যাওয়া স্বপ্তিকণা অনুপকে চান্স পেলেই কর্ণার করার চেষ্টা করে। স্কটিশ চার্চ কলেজ আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই দুটি প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে অনুপ মোটামুটি স্মার্ট হতে শিখে গেছে বলে গড়িয়ার রায়পুর রোড নিবাসিনী অভিজ্ঞতাহীনা সুন্দরী স্বপ্তিকণা তাকে বিশেষ কায়দা করতে পারে না। অফিসশুদ্ধু সবাই জানে প্রায় রোজই স্বপ্তির বিয়ের ভালো ভালো যোগাযোগ হরিপদ পাল ভেঙে দিচ্ছেন কারণ তারা চায় স্বপ্তি চাকরি ছেড়ে দিক। বড়লোকের বৌ টেলিফোন অপারেটার এটা সোমন মানায় না, এই উনআশি সালে একজন যুবতীর পক্ষে বিয়ের জন্যে চাকরি ছেড়ে দেওয়াও সেরকম মানায় না। মাঝখানে পড়ে বুদ্ধিমান ধাপ্পাবাজ হরিপদ পাল নিরীহ ভালো মাইনের সুবোধ ঘর-জামাই-হতে-আপত্তি-নেই-ধরণের পাত্র চাইছেন। আবার বলছেন, আমি তো সারা

জীবনে গাড়ি চেপে অফিসে আসতে পারলুম না। আমার মেয়ের রূপ আছে, গানটানও গাইতে পারে—ও কেন সারাজীবন বাসেট্রামে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে অফিস করবে। কপালে থাকলে গাড়িওলা বর ও ঠিক পেয়ে যাবে। পাবে না, তোমার কি মনে হয়? জিগ্যেস করেছিলেন অনুপকেই। অনুপ কিছু মনে না করেই বলেছিল—যাদের গাড়ি আছে তাদের কি আর শুধু একটা চাকরি করা বৌ নিয়ে পোষায় হরি-দা? মনে মনে অনুপ জানে পৃথিবীর যে কোনো সুন্দরীর মত সুপ্তিকণা পাল সুখবাদী, পৃথিবীর দুঃখটুঃখ সম্পর্কে উদাসীনা, ছিমছাম ফ্ল্যাটে স্ব.মী ও চাকর নিয়ে থাকতে চায়, গান গেয়ে বিখ্যাত হতে চায়, নিজের প্রয়োজনে পুরুষদের কাজে লাগাতে চায়, পুরুষদের প্রয়োজনে নিজেকে কাজে লাগাতে চায় না। সুপ্তি কি সঠিকভাবে জানে, আজ কত তারিখ? সুপ্তির কি মাথা ধরে রোজ বিকেলবেলা? সুপ্তি কি সিরিয়াসলি খবরের কাগজ পড়ে?

তোমাকে বিয়ে করার জন্যে আমাকে কতটা নিচু হতে হবে—কম-প্রোমাইজিং হতে হবে সুপ্তি? বার্ণার্ড শ বলেছিলেন—মানুষ দুরকম, একদল বোরিং, সবসময় বোর করে। আর একদল বোরড। সবসময় বোর হয়। তুমি কোন দলে, সুপ্তি? আমাকেই বা তুমি কোন দলে ফেলতে চাও?

এক জীবন তো খুব বেশি সময় নয়। গান, সিনেমা, নাটক, এইসব দেখতে দেখতে বইফই পড়তে পড়তে তুমি কি আমার সঙ্গে তোমার এই একজীবন কাটিয়ে দিতে পারবে? তোমার তো শৃঙ্খল নেই। হারাবার মতন তোমার যা আছে তার নাম নারীত্ব। যদিও তুমি কোনো অর্থেই সর্বহারা নও। অফিস ছুটির পর আমার এই মাথা ধরার বিকেলবেলায় তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছ কেন, সুপ্তি? আমাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা বাস্তবিক অর্থে তোমার বাবারও নেই। তাঁকে আমার সঙ্গে

কাজ করতে এবং আমাকে দিয়ে কাজ করাতে হয়। আমাকে সহ্য করাটা তাঁর চাকরি। কিন্তু তুমি আমাকে সহ্য করবে কেন ভাই!

ভিখিরি মেয়েটাকে দ্রুত একটা দশ পয়সা দিয়ে অনুপ স্বপ্তিকে বলে, আজ কত তারিখ বলুন তো। তার কণ্ঠস্বরে সেইরকম ক্যাজুয়াল ভঙ্গি, যা না থাকলে, একজন পুরুষকে নির্ভরযোগ্য পুরুষ মনে হওয়ার বদলে লোভী কুকুর মনে হতে পারে।

অনুপের প্রশ্ন শুনে স্বপ্তির ঠোঁট অবিবাহিত সুন্দরীদের মত অল্প বেঁকে যায়। এই বিকেলবেলা আপনি তারিখ দিয়ে কি করবেন?

অনুপ সক্ষম পুরুষের মত পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে, নিঃশব্দে হাসে। তার মানে আপনিও জানেন না? যুবতীদের সামনে একা কথা বলার সময় পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট ঠিকঠাক বার করতে পারলে চাকরি করার মানে খুঁজে পাওয়া যায়।

স্বপ্তি ভ্যানিটি ব্যাগটা ডান হাতে পিঠের ওপর ফেলে চমৎকার গ্রীবা বাঁদিকে হেলিয়ে স্মার্টলি বলতে চায়—আজ সাতাশ তারিখ, কাল ছুটি।

কাল ছুটি নাকি? অনুপ মনে মনে চমকে উঠলেও বাইরে খুব স্বাভাবিক থাকতে চায়।

জানতেন না নাকি? আজ কত তারিখ মনে নেই, কালকে যে ছুটি তাও মনে নেই, আপনার কি হয়েছে বলুন তো।

অনুপ জানে এটা সত্যিকারের জানতে চাওয়া নয়। কথার কথা। একসঙ্গে চাকরি করলে এইরকম জানতে চাইতে হয়। বিশেষত বাবার প্রিয় অধস্তন ইন্‌সপেকটরের কাছ থেকে তো বটেই।

কাল কিসের ছুটি? অনুপের চোখে সত্যিকারের অজ্ঞতা, বিস্ময়।

কি একটা মুসলমান পরব। ঠিক নামটা বলতে পারবো না। মুসলমানদের পরব টরবের এত শক্ত শক্ত নাম হয়। নাম বলতে না পারার অক্ষমতাকে চাপা দেবার জন্য স্বপ্তি নিজের দাঁত আর ঠোঁট ব্যবহার করল,

দেখে ভালো লাগল অনুপের। অফিস ছুটির পর মোয়রা বাড়ি যাবার জন্যে সাধারণত ব্যস্ত থাকে বলে অনুপ বলল, বাড়ি যাবেন না? বাবার তো ছুটি হতে দেরি হবে।

কাজ হল। আয়ত চোখ কিছুটা ছোট করে স্বপ্নি বলল, আমাকে কি আপনি বাবার সঙ্গে বাড়ি যেতে দেখেছেন?

পা থেকে মাথা অব্দি স্বপ্নিকে একবার মাপলো অনুপ। শাড়িটা সুন্দর। শাড়ির ভেতরের জিনিষপত্তরও বেশ সুন্দর। খুলে দেখতে সাধ হয়। পুরুষ হিসেবে আমি খুব অসামান্য নই, খুব ফালতুও নই। শিরদাঁড়া সোজা করে হাঁটি। রোগা নই, বেঁটে নই, মোটা নই। আমার ভেলভেট কর্ডের নীল প্যাণ্ট আর হলুদকালো চেক বুশ শার্ট পরা শরীরটা দেখার ইচ্ছে কি তৃপ্তির আছে? আছে বলেই তো মনে হয়। দেখা যাক।

বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে এগোনো যাক। বলে দু এক পা গিয়ে যতদুর সম্ভব স্মার্টলি সিগারেট ধরিয়ে অনুপ বলল, বাড়ি গিয়ে আপনি কি করেন, সন্ধ্যেবেলা?

উত্তর না দিয়ে স্বপ্নি বলল, আপনি কি করেন?

সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে নির্লিপ্ত হবার চেষ্টা করে অনুপ বলল, কি করবো ঠিক বুঝতে পারি না।

অনেকক্ষণ বৃষ্টিপাতের পর হঠাৎ ছোট করে বিদ্যুৎ চমকালে যেরকম আরাম হয় স্বপ্নির সেইরকম আরাম হল। দ্রুত একবার অনুপের ফরাসী গোঁফের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্বপ্নি বলল, প্রেম করলেই তো পারেন।

অনুপ জানে, সুযোগ পৃথিবীতে বারবার আসে না। সিগারেটে খুব জোরে একটা টান দিয়ে নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্যাটি স্বপ্নিকে খুব সরল ও আন্তরিকভাবে বলে ফেললো অনুপ। ····রোজ বিকেলে. আমার ভীষণ মাথা ধরে, জানেন। জঙ্গলে কাঠ কাটতে দেখেছেন কখনো? মনে হয়, কেউ যেন বিশাল লম্বা একটা করাত চালাচ্ছে মাথার ভেতর। রোজ।

…রোজ। রাত দুটো, তিনটে অব্দি। তিনচার সেকেণ্ড থেমে অনুপ বলে যায়—ভেড়া গুণলে ঘুম আসে বলে না, কেউ কেউ? চার হাজার পাঁচ হাজার ভেড়া গোনা হয়ে যায়, ঘুম আর আসে না। ট্যাবলেট খাই। সকালে আবার মাথা ধরা· ·আমি বোধহয়····ফিস ফিস করে গোপন সিদ্ধান্ত জানোয়ার মতন করে অনুপ বলে ফেলে···পাগল হয়ে যাবো।

'কটা বাজে দাদা' বলে একজন ধুতি পাঞ্জাবি পরা রোগা মতন কালো মাঝবয়েসি লোক অনুপের সামনে একদম দাঁড়িয়ে পড়লো। স্বপ্নি দ্রুত নিজের ঘড়ি দেখে অনুপের আগেই বলে দিল, পাঁচটা আঠেরো। লোকটা চলে গেলে অনুপ স্বপ্নির দিকে খোলামেলা তাকিয়ে ছোট করে হাসলো। সেই হাসিতে সমর্পণ, সহায়হীনতা আর নির্ভরতা পাবার আকাঙ্খা ছিল।

বাসস্টপে দাঁড়িয়ে দুচারটে ভিড় বাস চলে যাবার পর স্বপ্নি বলল, মেয়েদের চাকরি করা যা ঝামেলা। অফিসে আসা যায় না, বাড়ি ফেরা যায় না। সবসময় বাসে এত ভিড় হয়!

অনুপ হাল্কা হয়ে ওঠার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করলো—আসলে বাড়ির বাইরে আপনারা কিছুতেই ফ্রি হতে পারেন না, না?

খিল খিল করে হাসলো স্বপ্নি। বলল, না না, তা নয়। আমাকে কি খুব রিজার্ভড মনে হয় আপনার?

অনুপ উত্তর না দিয়ে ক্লান্ত হাসলো। বলল, ডোণ্ট মাইণ্ড।

স্বপ্নি অনেকক্ষণ থেকে ভাবছিল—কোথাও বসলে মন্দ হয় না। কিন্তু নিজে থেকে প্রস্তাব করার একটা নির্লজ্জতা আছে যা তাকে বা যে কোনো সুন্দরীকে একেবারেই মানায় না। তাই সরাসরি অন্য প্রসঙ্গে চলে এল সে। ডাক্তার দেখাচ্ছেন না কেন?

ডাক্তার? বলে অনুপ অন্যমনস্ক গলায় বলল, কামু ডাক্তারদের ঈশ্বরের এনিমি বলেছেন। তিনি বিদেশী লেখক। আমরা বাঙালিরা ডাক্তারদের প্রায় নির্ভেজাল দেবতা মনে করি, তাইনা?

অনুপকে নিষ্ঠুর এবং জরুরী হয়ে ওঠার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছে দেখে স্বপ্তি বলল, আমার একবার অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন হয়েছিল। ডাক্তার সিস্টার সবাইকেই ভগবানের দূত মনে হত। শাদা জামা পরা নার্সদের তো প্রায় দেবদূত বলেই মনে হয়। এখনো। অথচ তাদের কোনো সোস্থাল স্ট্যাটাস নেই।...ডাক্তার কি বলছে, মাইগ্রেন?

নাঃ। বলে অনুপ আবার সিগারেট ধরায়। এক নির্মল পার্বত্যপ্রদেশে চাকরি নিয়ে চলে যেতে বলে। যেখানে সিনেমা হল নেই, নেশা নেই, উত্তেজনা নেই। এইসব আর কি। কোনো মানে হয়?

স্বপ্তি বাসস্ট্যাণ্ডের ভিড়, রাস্তার পরিপূরক কোলাহল, সারাদিন টেলিফোন অপারেট করার ক্লান্তি—বাড়ি যাবার ইচ্ছে, সব উপেক্ষা করে সোজাসুজি অনুপের দিকে তাকায়। অনুপের মনে পড়ে, একসঙ্গে অনেকক্ষণ মদ্য পানের পর কোনো কোনো বেশ্যা তার দিকে এইভাবে তাকিয়েছে। এইসব সুখের মুহূর্তগুলি বড দুর্লভ, বড় যন্ত্রণাহীন! স্বপ্তি একটু কেশে স্বাভাবিক গলায় বলে—বিয়ে করলে বোধহয় ভালো থাকবেন। বিয়ে করছেন না কেন?

দোতলার বারান্দা থেকে নিচে পড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙেছে বলে মনে হল অনুপের। হো হো করে হেসে ওঠার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করলো সে। বলল, আপনি তো টাইপ করতে জানেন?

বিবাহ থেকে টাইপের প্রসঙ্গ কি করে আসতে পারে, বুঝতে না পারার বিস্ময় নিয়ে স্বপ্তি বলে—কেন বলুন তো?

টাইপ শেখার সময় এরকম একটা লেসন পেয়েছিলেন আপনি—এ গ্রিডি ডগ জাম্প্স্ ওভার দি স্লাই ফক্স?

ভুরু কোঁচকাবার একটা অতুলনীয় ভাঙ্গ করে স্বপ্তি বলে, হ্যাঁ—পেয়েছিলাম। কেন বলুন তো?

নিজেকে স্লাই ফক্স বলে মনে হয় নি?

শাদা মুখশ্রী মুহূর্তে লাল হয়ে গেল। চিবিয়ে চিবিয়ে মাথাটা বাঁ দিকে হেলিয়ে নিজস্ব ভঙ্গিতে স্বপ্তি বলল, আপনার কি নিজেকে গ্রিডি ডগ বলে মনে হয়?

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে অনুপ কলকাতার শ্রেষ্ঠ লম্পটের মতন লোভী ভানহীন চোখে স্বপ্তির বুক গলা গ্রীবা চাটতে চাটতে বলল, অফিস থেকে বেরিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে নিজেকে লোভী কুকুর ভাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম। সব পুরুষই তো আসলে তাই। এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। ধূর্ত শিয়াল ছাড়া আমার আর কোনো আইডেনটিটি হয় না। এত ধূর্ত যে তার মাথায় একটা এভার লাসটিং পেন তাকে কোনদিন শান্তিতে ঘুমোতে দেবে না। লোভী কুকুরেরা চিরকাল দূর থেকে করাত চালাবে তার মাথায়। চলি। কাল আবার দেখা হবে।

চলে যাবার জন্যে অনুপ ঘুরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্তি বলল, কাল ছুটি।

# চাকরি

'এই আপনার অ্যাটেনড্যান্স'—বলে সই করার খাতাটা সুশীলকুমার বাসু টেবিলের এক পাশ থেকে অন্য দিকে ছুঁড়ে দিলেন—'সিটে থাকেন না একদম, সারাদিন কি এত কাজ আপনার ?' সুশীলকুমার বাসু, নমিনেটেড এ, এ, জি—অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অ্যাকাউন্টাণ্ট জেনারেল—হাতে 'সাইকোলজি অফ এ ব্যাচেলার' 'অ্যাকাউন্ট ঠিক সময় দিতে না পারলে চাকরি ছেড়ে দিন'—সুশীলকুমার বাসু, এ, এ, জি, নমিনেটেড। বললাম, পাড়ার হাসপাতালে এসে উঠেছি, বাড়িশুদ্ধু সবাই বন্যায়—নিজের মাসিমা বলেছিল—

যা বলেছিল তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এইইই—নোংরা জল ঘেঁটে ঘেঁটে এতদূর চলে এলি। চা-ন কর। সবাই লাইন দিয়ে চান কর। একি, একি, এই নোংরা জামাকাপড় নিয়ে ভেতরে আসছিস কেন জয়া ? দাদাবাবু, আপনি এখানে, এইখানে দাঁড়ান। জয়া. তোর ছেলেরা কি জামাকাপড় পড়বে বলতো।

হ্যাঁ। আটাত্তরের সেপ্টেম্বর। বন্যা। সরকারী অফিসার সুশীলকুমার বাসু তখন অ্যাকাউন্ট ঠিক সময়ে পেতে চেয়েছিলেন। তিনি উঁচু এলাকায় থাকতেন। আমার মাসিমা আমাদের জামা কাপড় কাচতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি উঁচু এলাকায় থাকতেন।

আমরা নিচু এলাকায় থাকি বলে সাতদিন মাসিমার ব্যাকরণ মানলাম। তিনি যথারীতি চৌদ্দঘণ্টা বাথরুমে কাটালেন। মাসিমার রান্নাঘরে সব রান্না করে দিল মা। বাবা আর মেশোমশায়ের ইনকাম ট্যাক্স আর কলকাতায় কোথায় সস্তায় বালিশ পাওয়া যায় তাই নিয়ে কদিন অনেক

-গল্প হল। আর অ্যাকাউন্ট সময়ে দিত না পারার দোষে আমার ট্রান্সফার হল। রিক্রুটমেণ্ট সেল। দুমাস।

প্রথম দশদিন শুধু অ্যাপ্লিকেশন এন্ট্রি করা হল। অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক নেওয়া হবে। বাইশটা মোটা মোটা খাতায় মোট বাইশ হাজার ছেলে-

( ২ )

মেয়েদের নাম ঠিকানা টুকে রাখা হল। এদের সবায়ের চাকরি চাই। আমার নিজের চাকরি এই আড়াই বছর চলছে। এক একটা ঠিকানা অ্যাপ্লিকেশন দেখে খাতায় তুলি আর ভাবি—আড়াই বছর আগে সবশুদ্ধু ঠিক ছ বছর ধরে আমি যত অ্যাপ্লিকেশন করেছি, সেগুলো কেউ না কেউ এই ভাবে নাড়াচাড়া করেছে। এখন এক একটা অ্যাপ্লিকেশন হাতে নিয়ে হাতের লেখা দেখে ঠোঁট উল্টে মোটা খাতায় নাম তুলতে তুলতে একরকম সরু সুখ পেতে থাকি। সুধাংশু দে, বাইশের তিন প্রিয়নাথ মজুমদার লেন, কলকাতা বাইশ। পাশপোর্ট সাইজ ছবিতে আপনাকে বড় রোগা দেখাচ্ছে সুধাংশু। বাড়িতে কে কে আছে?

একদিন তখন থার্ড ইয়ার। সন্ধেবেলা কলেজ! দিনে একটা ছোট এক্সপোর্ট ফার্মে বাক্স বাজাই, মানে টাইপ করি আর কি। হঠাৎ এমপ্লয়-মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকে চিঠি এল। পাঁচ নম্বর কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটে বেলা তিনটের সময় দেখা করো। চাকরির খবর আছে। ব্যাংকে।

বিশ্বাস করিনি। শুধু খবর। চাকরি নয়। তবু ব্যাংকে তো। সত্তর টাকার চাকরিত কামাই করে—যার ভাবার্থ, পরের দিন নিতাই শা'র ঝাড়া আধঘণ্টা উঁচুপর্দার গালাগাল, টেলিফোন করার সময়ও বাড়ি ফাটিয়ে চিৎকার করে কথা বলতেন নিতাই শা, খালি গা লুঙ্গি-পড়া, কপালে তিলক, শোভাবাজার গঙ্গার ধারের দোতলা বাড়ি কাম অফিস থেকে সারা বাংলাদেশে মশলা এক্সপোর্ট হত। কার্ডামন। ব্ল্যাক পিপার। দুপুরে ওই বাড়িতেই দু তিনটে পাকা সোনা দিয়ে ভাত আর সকালসন্ধে

শুধু টাইপ। এমন দিনে চাকরির খবর। ব্যাংকে।

সাতসকালে ঘণ্টাতিনেক খুঁজে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের সেই অমূল্য কাগজের টুকরোটি, যেটি হাতে নিয়ে আমাকে সেদিন বেলা তিনটের সময় পাঁচ নম্বর কাউনসিল হাউস স্ট্রিটে যেতে হবে, যখন পাওয়া গেল তখন দেখলুম তিনমাস সেটা রিনিউ করা হয়নি। রাজার বাড়ির জানলায় গিয়ে হাত বাড়িয়ে কার্ড এগিয়ে দিয়ে বলা হয়নি, আরো এক মাসের জন্যে আমাকে বেকার করে দাও।

এক অফিসারকে যখন বলেছি, তিনমাস কলকাতায় ছিলাম না তাই। তিনি চেয়ারে শরীর এগিয়ে দিয়ে—অনেকদিন পর কল পেয়ে খেয়াল হয়েছে ঠিক সময় কার্ডটা রিনিউ করা হয়নি, এই সত্যি কথাটা বলতে পারলেন না? ডেলি দুশো ছেলে এসে বলে, অসুস্থ ছিলাম, কলকাতার বাইরে ছিলাম। এত বোকা হয়েছে বাঙ্গালি ছেলেরা যে অন্য সবাই কই বোকা ভাবে।

সারা শরীরে তখন শব্দ হচ্ছে, হবে। বললাম একবারের মতন...। মড়ার মত ঠাণ্ডা গলায় বললেন, মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়েই অ্যাপ্লাই করো। মাসখানেক বাদে এসো। কার্ড পেয়ে যাবে।

একমাস—। আমার যে আজকেই তিনটের সময় ভ্যালিড কার্ড চাই। কার্ড যদি ভ্যালিড না থাকে চাকরীর খবর থেকে আমি বাদ। কখন কোথায় পরীক্ষা দিতে হবে, একজন এমপ্লয়মেণ্ট অফিসার এসে সবাইকে সে সব খবর বলবে। সবাই চোখে মুখে আলো জ্বালিয়ে রেখে চুপ করে শুনবে। সেই আলোর নাম চাকরি চাই।

এরপর থেকে স্যার ঠিক সময় এসে কার্ড রিনিউ করে যাবো। আজ বিকেলে স্যার একটা কল পেয়েছি। ব্যাংকের চাকরি।

আজ বিকেলে? অফিসার ভদ্রলোক আরো রেগে গিয়ে বললেন, মাসের পর মাস কোন কল পান না বলে আপনারা ভাবেন এমপ্লয়মেণ্ট

এক্সচেঞ্জ হাত গুটিয়ে বসে আছে ? এখন এরকম একটা চান্স হাতে পেয়েও যদি অ্যাভেল করতে না পারেন—

সেটা পুরোপুরি আমারই দোষ স্যার। কিন্তু—। সারা শরীরে তখন শব্দ হচ্ছে—হবে না। হবে না।

তিনটে বাজতে আর এক ঘণ্টা দেরি। কার্ড নিয়ে বেন্টিংক স্ট্রীটে চলে যান। সেখানে আমাদের আর একটা অফিস আছে। ল্যাপস্ কেস হ্যাণ্ডেল করেন মিস্টার মজুমদার। হবে বলে মনে হয় না। তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আমি ফোন করে দিচ্ছি।

সারা শরীরে তখন আবার শব্দ হল, হবে। হবে। বেন্টিংক স্ট্রীটের অফিসে গিয়ে পর পর সাতজন লোককে হাতে পায়ে ধরে সাতটা খাতায় নানারকম নোট করিয়ে যখন ঠিক তিনটে বাজতে চার মিনিট বাকি—কার্ড রিনিউ হয়ে গেল। হাতে কার্ড নিয়ে দৌড়ে বেন্টিংক স্ট্রীট থেকে কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে চলে এলাম! রাস্তার টেম্পো ট্যাক্সি, দোকানদার, ফুচকা ওলা—সবাই দেখল, ডালহৌসির রাস্তায় একটা ছেলে প্রাণপনে দৌড়চ্ছে। তারা সারা শরীরে শব্দ—হবে। হবে।

সেই চাকরিটা হয় নি তবু পরীক্ষায় বসতে পেয়েছিলাম। এখন গোছা গোছা অ্যাপ্লিকেশন ঘাঁটতে ঘাঁটতে—পার্সেন্টেজ, বয়েস, পোস্টাল অর্ডার আট টাকা ছবি—সব ঠিক ঠিক আছে কিনা দেখতে দেখতে—একটা ভুল এ্যাপ্লিকেশন পেলেই সেটা স্মার্ট করে বাদ দিচ্ছি। আঃ। আরাম। চাকরি পাবার আগে আমার কত অ্যাপ্লিকেশন এইভাবে কত লোক ফেলে দিয়েছে। শালা।

সমীর-দা, ফাদার্স নেমের জায়গায় একজন লিখেছে ডাস নট এরাইজ।

সেকশন অফিসার সমীর রায় অ্যাপ্লিকেশনের বাণ্ডিল থেকে মুখ তুলে বললেন—অ্যাঁ ?

কালীপদ, অজয়, শ্রীধরদা, নীলু, লতিকাদি—সবাই কাজ থামিয়ে বলল,

কি লিখেছে ?

ফাদার্স নেমের জায়গায় লিখেছে—ডাস নট এরাইজ।

সমবেত হাসির শব্দের মধ্যে সমীরদা বললেন—নিজের নামের জায়গায় কি লিখেছে ? থাকে কোথায় ?

জগন্নাথপুর। নিয়ার তারকেশ্বর। নাম কার্তিকচন্দ্র দোলুই।

জীবনে চাকরি পাবে না। বলে সমীরদা আর একটা অ্যাপ্লিকেশন তুলে নিলেন।

শিডিউল্ড কাস্ট হলে পার্সেন্টেজ দেখতে হবে না জেনারেল ছেলেদের মিনিমাম ফর্টিফাইভ পার্সেন্ট চাই। এইভাবে আট হাজার অ্যাপ্লিকেশন সর্ট করা হয়ে গেছে, বাদ গেছে তিন হাজারের কাছাকাছি সমীরদা হায়ার অফিসারের সঙ্গে একটা লম্বা মিটিং সেরে এসে বললেন, জেনারেল হোক এস সি হোক, ফর্টি পার্সেন্ট থাকলেই পরীক্ষায় ডাকো। আবার সর্ট করো। শিডিউল্ড কাস্টদের মধ্যে ফর্টি পার্সেন্টের কম থাকলে রিজেক্ট করো।

কালিপদ, অজয়, শ্রীধরদা, নীলু, লতিকাদি—সবাই চেচামেচি করে উঠলো। আট হাজার বাছাই হয়ে গেছে, তার মধ্যে থেকে আবার জেনারেল ক্যাণ্ডিডেটদের রিজেক্টেড বাণ্ডিল থেকে ফর্টি পার্সেন্ট থাকলে সেগুলো খুঁজে বার করতে হবে! এস, সি দের মধ্যে থেকে ফর্টি পার্সেন্টের কম থাকলে রিজেক্ট করতে হবে। আগের ছ দিনের কাজ ফালতু গেল।

সমীরদা বললেন, অথরিটির ডিসিশন। নো কোশ্চেন প্লিজ। ডু ইট।

( ৩ )

বাইশ হাজারের মধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার অ্যাপ্লিকেশন ইনকম্প্লিট। কারো মার্কসিটের কপি নেই। কারো ছবি নেই। পাশপোর্ট ছবির জায়গায় কেউ গ্রুপ ছবি দিয়েছে। এ্যারো সাইন দিয়ে লেখা সি

আট টাকার পোষ্টাল অর্ডারের জায়গায় কেউ দিয়েছে ছ টাকা। কারো আবার ঠিকানাই নেই।

সাড়ে চার হাজারের মতন অ্যাপ্লিকেশন ক্যানসেল হল। মার্কস কম। এজ বেশি।

প্রায় বারো হাজার ছেলেকে পরীক্ষায় ডাকা হল। ছাব্বিশে নভেম্বর অ্যাংলো গুজরাটি স্কুলে পরীক্ষা। বারো হাজার চিঠি ছাড়া হল ঠিক দশ দিনে। সমীরদা অন্য অন্য সেকশন থেকে লোক ধরে এনে—চা খাওয়াবো ভাই, সিগারেট দিচ্ছি, যতগুলো পারিস ঠিকানা লিখে দিয়ে যা—এসব করে দশ দিনে বারো হাজার ঠিকানা লেখালেন।

এর মধ্যে কালীপদ অ্যাপ্লিকেশন বাছতে বাছতে মেয়েদের এ্যাপ্লিকেশন থেকে ছবিগুলো আমাকে দেখায় আর বলে—কি রকম রে? বেহালার ঠিকানা থাকলে লতিকাদিকে দেখিয়ে বলে—দিদিমনি, চেনেন নাকি? আপনাদের ওদিকে থাকে। একদিন বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে চোদ্দটা মেয়ের ঠিকানা দেখাল।

সব ব্যারাকপুর। এই রবিবারে আলাপ করবো।

কালীর নিজের মেয়ে ক্লাশ থ্রিতে পড়ে। ব্যারাকপুরে সোস্তাল সার্ভিস করে কালী খুব পপুলার। আপদে বিপদে পাঁচজনে ছুটে আসে—কালীদা, কালীবাবু, কালী ভাই।

কালীকে এগিয়ে দিতে শেয়ালদা স্টেশনের দিকে ছুটির পর যেতে যেতে জিগ্যেস করি, আলাপ করার মানে? বাড়ি গিয়ে বলবি, আপনার অ্যাপ্লিকেশন আমি সর্ট করেছি, পরীক্ষার চিঠির খামে আপনার নাম লিখেছি, আমার নাম কালিপদ নস্কর, আপনার প্রিপারেশন কেমন হচ্ছে?

কালি দাঁত ফাঁক করে বলে, চাকরির যা বাজার। রিক্রুটমেন্ট সেলে গাধার খাটনি খাটছি। শোধ তুলবো না?

একটু থেমে বলল, তাছাড়া ব্যারাকপুরে তো অনেকেই আমায় চেনে।

আমার বন্ধুবান্ধবের বন্ধু, তাদের বোন কিংবা ভাইঝি—এরকম দুএকজন আছে। ছাব্বিশ তারিখে পরীক্ষা। তার আগে একবার ক্যাণ্ডিডেটের বাড়ি গিয়ে বলতে পারলে—অমুক অফিসে তুমি পরীক্ষার চিঠি পেয়েছো না—তখনি বলবে কি করে জানলেন—চেনাশোনা আছে শুনলে কোশ্চেন বার করে দিতে কি আর বলবে না ?

তখন কালিপদ নস্করকে একটু হিংসে হল মনে। রাগও হল।

( ৪ )

পরীক্ষার চিঠি চলে যাবার পর লাইন দিয়ে ছেলে আসতে লাগলো। নতুন রিক্রুটমেণ্ট সেল। কড়াকড়ি কম। আসতে কোন অসুবিধে নেই। সবাই প্রায় আমার বয়সী। কেউ কেউ আমার চেয়ে অনেক বড়। তাদের প্রশ্ন-আমার অমুক বন্ধু চিঠি পেয়েছে আমি পাইনি কেন ? ফর্টি পার্সেণ্টের কম থাকলে ডাকা হবে না, একথা তো অ্যাডভারটাইজমেণ্টে লেখা ছিল না। পরীক্ষার স্ট্যাণ্ডার্ড কেমন হবে।

অনেককেই বলা হল চিঠি গেছে। দুএকদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন। খাতা খুলে যাদের মার্কস কম দেখা গেল, তাদেরকে সত্যি কথা না বলে সংক্ষেপে বলা হল, আপনার অ্যাপ্লিকেশনে ভুল ছিল। কি ভুল বলা যাবে না।

একদিন বিকেলে অফিস বেরিয়েই চারজন ছেলের হাতে পড়লাম। আপনি সমীর রায় ? খড়দায় থাকেন না ?

যার বৌকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি তারই সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেছে মনে হল। তুমি চাকরি করো, আমাদের চাকরি দিচ্ছো, আমাদের চেয়ে তোমার কি এমন বেশি ক্যালি ? এরকম ভাবে তাকাচ্ছে। সমীরদাকে খুঁজছে। রিক্রুটমেণ্ট সেলের সেকশন অফিসার। খড়দায় থাকেন তাও জেনেছে। শুধু মানুষটাকে চেনে না।

কেন বলুন তো ?

ছুটির পর ধরবো বলে দুপুর থেকে বসে আছি। অফিসের ভেতর তো সব কথা হয় না।

কি ব্যাপার? বলে গম্ভীর হবার প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। চারজনের মধ্যে একজন আমার ছোট কাকার বয়েসী। কণ্ঠার কাছটা উঁচু।

আট বছর চাকরির চেষ্টা করছি। আর এক বছরের মধ্যে না পেলে এজ পেরিয়ে যাবে।

কটা পোস্ট আছে দাদা? একজন বলল।

ভেতর থেকে লোক ঠিক করা আছে, না? আর একজন বলল।

এসে এটা একটু বলে দিন না। ইংরেজিতে বড্ড কাঁচা। আপনি একটু চেষ্টা করলে—

আমি সমীর রায় নই। আমার নাম রতন সেনগুপ্ত। এইসব বলে ছাড়া পেলেন। চলে আসার সময় হঠাৎ কি ইচ্ছে হল, সিগারেট কিনে খাইয়ে দিলাম সবাইকে। বললাম—চাকরি পাবার আগে কিন্তু এসে লেটার কিংবা কটা পোস্ট আছে এসব ভাবিনি। সব জায়গায় অ্যাপ্লাই করেছি আর খুব খেটে প্রিপারেশন করেছি।

আমি অ্যাপ্লিকেশন করেছি তিনশো বারোটা। ছোটকাকার বয়েসী লোকটি বললেন। খুব আস্তে করে বললাম, পেয়ে যাবেন। আপনারা সবাই একদিন চাকরি পেয়ে যাবেন। আমি বলছি।

কথাটা নিশীথ বলতো। নিশীথের ঘরে অমিতাভ অজিত কল্লোল, সবাই রোজ সন্ধেবেলা জড়ো হত। তাস হত। আড্ডা হত। মদ হত। গান হত। চাকরি পাওয়া অসম্ভব—ভাবতো সবাই। আমাদের সবায়ের রেজাল্ট খারাপ। আমাদের কারো কোন ভারী ওজনের মামা নেই। তবু নিশীথ বলতো—একদিন ঠিক আমরা প্রত্যেকেই একটা চাকরী পাবো। দেখিস।

তখন কিছুতেই বিশ্বাস হত না। এখন নিশীথ ব্যাংকে। অজিত স্কুলে।

কল্লোলের ধোঁয়াহীন কয়লার কারবার। সমার প্রাইভেট ফার্মে। অমিতাভ স্টেনো।

( ৫ )

ছাব্বিশে নভেম্বর যত কাছে আসছে, অফিসারদের মধ্যে তত ঘন ঘন মিটিং হচ্ছে। হলে গার্ড দেবে কারা গুজরাটি স্কুলেব দুটো বিল্ডিং। কোন বিল্ডিংএ কারা চার্জে থাকবে। লোকাল থানা থেকে বেশ কিছু পুলিসের ব্যবস্থা করতে হবে। খাতা দেখবে কারা। কোশ্চেন ছাপার দায়িত্ব কারা নিচ্ছে। পরীক্ষার দিন হলে ঠিক সময়ে খাতা-কোশ্চেন যাওয়া চাই।

পরীক্ষার তিনদিন আগে থেকে রোজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের গুজরাটি স্কুলে যেতে হল। টেবিলে রোল নাম্বার লিখতে হবে। প্রথমে কথা হয়েছিল, কাগজে লিখে আটা দিয়ে আটকে দেওয়া হবে। এই নিয়েও অফিসারদের মিটিং হয়েছে। ডিসিশন হয়েছে—চক দিয়ে ডেস্কের ওপরে রোল নাম্বারটা লিখে দিলেই হবে। কাগজের খরচ বাঁচবে। আবার বাঁচবে।

সমীরদা বললেন, এই শেষ কাজটা ভাই কষ্ট করে তুলে দাও দিনেব বেল স্কুল খোলা থাকবে। আমরা এই তিনদিন সন্ধেবেলা গিয়ে রোল নাম্বারগুলো লিখে ফেলবো। কেমন?

কালিপদ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলল, ওভারটাইম পাবো কি?

সেই নিয়ে আমি কালকের মিটিঙে অনেকক্ষণ ফাইট করছি ভাই। হলে যাদের গার্ড দেবার জন্যে ইনভাইট করেছি তাদেরটা এককথায় স্যাংকসন হয়ে গেল। আমাদের যারা একদম রিক্রুটমেণ্ট সেলের লোক, টি এন রামস্বামী বার বার বললেন—পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পরে আপনি একটা ডিটেল্‌ড্‌ রিপোর্ট দেবেন, কবে কি ওভারটাইম করেছে, তারপর আমি স্যাংশন করবো।

দিদিমনি মিষ্টি করে বললেন, কি বদমাস দেখেছেন, আগে থেকে স্যাংশন করলে যদি ফাঁকি দিই।

তার জন্যে ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমরা কবে কোথায় কে কি করছি, সেই কাজগুলো কত জরুরী ছিল—তাই নিয়ে এমন একখানা সাহিত্য লিখে ফেলবে, রামস্বামার বাপ স্যাংকশন করবে। তোমরা শুধু কাজটা তুলে দাও।

সুতরাং দুজন করে দল হল। নীলু আর লতিকাদি, অজয় আর শ্রীধরদা, আমি আর কালিপদ। সমীরদা একাই একশো।

প্রথমদিন ভালোই লাগলো। সন্ধেবেলা গুজরাটি স্কুলের একতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত সবকটা ঘরে আমরা সাতজন ভাগাভাগি করে রোল নাম্বার লিখতে লাগলাম। সারা স্কুলবাড়িতে আমরা ছাড়া কেউ নেই। এক একটা ঘরে একদিক থেকে আমি শুরু করি, অন্যদিক থেকে কালি। উল্টো দিক থেকে লিখছে। বলে। উলির দেরী হয়। পাঁচশো এগারো। পাঁচশো দশ।

( ৬ )

পরের দিন সকালে অফিসে যাবার সময় বাসের মধ্যে হাতে জেনারেল নলেজের বই নিয়ে পাশে বসে থাকা যুবকটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে জানা গেল—সে একজন ক্যাণ্ডিডেট। দুদিন বাদে পরীক্ষা আর সেই পরীক্ষায় আমি গার্ড দেবো আর নিজের হাতে অ্যাপ্লিকেশন বাছাই থেকে আরম্ভ করে সব কাজই করেছি শুনে ছেলেটি প্রায় হাতে স্বর্গ পেয়ে গেল। কোশ্চেন কি রকম হবে দাদা? ভ্যাকানসি কত? হলে গার্ড কি খুব কড়া থাকবে?

উত্তর দিতে দিতে বুকটা ফুলে উঠলো। আড়াই বছর আগেও আমি বেকার ছিলাম। টুকটাক সত্তর আশি টাকার প্রাইভেট ফার্মের চাকরিকে

কি আর চাকরি বলে। আর আজ পাচ ছশো টাকা মাইনের একটা চাকরির পরীক্ষায় আমি গার্ড দিতে চলেছি। একজন বেকার যুবক আমাকে জিগ্যেস করছে, প্রশ্ন কি রকম হবে। ভ্যাকান্সি কত।

কিছুই জানি না বললে ছেলেটি কিছুতেই ছাড়বে না বলে যথাসাধ্য খবর দিলাম। কোশ্চেন খুব সোজা হবে। একশো নম্বর ইংরেজী আর একশো নম্বর অঙ্ক।

আর জেনারেল নলেজ ?

থাকবে না।

ছেলেটি ভীষণ অবাক হয়ে বলল, সে কি ? আমি যে রোজ দুঘণ্টা করে খান্নার বই থেকে প্রাইম মিনিস্টারদের নাম মুখস্থ করছি।

কেন, বিজ্ঞাপনে তো সিলেবাস বলে দেওয়া ছিল। দেখেননি ?

সরকারি চাকরি অথচ জেনারেল নলেজ থাকবে না তা কি হয় ?

এটা তো পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা নয়। ডিভিশনাল অ্যাকাউন্টান্টের আণ্ডারে কিছু অ্যাকাউন্টস্ ক্লার্ক নেওয়া হবে।

কিছু মানে কত ?

আমরা শুধু প্যানেল তৈরী করে দেবো। অ্যাপয়েন্টিং অথরিটি ডিভিশনাল অ্যাকাউন্টান্ট।

ভ্যাকান্সি কত ?

ঠিক জানি না ভাই।

ক্যাণ্ডিডেট কত ?

বারো হাজার।

তবে যে শুনেছিলাম বাইশ হাজার।

অ্যাপ্লিকেশন পড়েছিল প্রায় দশ হাজার বাদ গেছে।

চোখ বড় বড় করে ছেলেটি বলল, দশ হাজার অ্যাপ্লিকেশন বাদ গেছে। কেন দাদা ?

ভুলে ভর্তি। আপনারা বিজ্ঞাপনটাই ভালো করে পড়েন না। আপনিই তো জানতেন না যে জেনারেল কলেজের কোনো পেপার নেই।

মানিব্যাগ হারিয়ে যাওয়ার মত মুখ করল ছেলেটি। না, মানে।

সন্ধ্যেবেলা গুজরাটি স্কুলে লোড-শেডিং। সমীরদা বললেন, সো হোয়াট। রোল নম্বর লিখতেই হবে। কাল পরীক্ষা মোমবাতি কেনো।

আজ দ্বিতীয় বাড়িটা।

অন্ধকারে কালী মোমবাতি ধরে থাকে আর আমি রোল নাম্বার লিখি। আট হাজার তিনশো বারো। কাল এখানে বারো হাজার ছেলে চাকরির পরীক্ষা দেবে। তাদের যেন কোন অসুবিধে না হয়। এই গুজরাটি স্কুলে বোধহয় প্রত্যেক রোববারই কোনো না কোনো চাকরির পরীক্ষা হয়। ডেস্কে পুরনো রোল নাম্বারের দাগ।

আট হাজার তিনশো সতেরো লিখতে লিখতে বললাম, এখানে যে বসবে সেই ছেলেটার সঙ্গে আজ সকালে বাসে এলাম। ফিজিক্সে এম্, এস, সি পড়ে। জানিস তো।

ওরকম কত এম-এ, এম এস সি আছে। কালী বললো, পাঁচশো টাকার সরকারি চাকরি পেলে বর্তে যাবে। প্রাইভেট কলেজে তো দুশো টাকাও দেয় না। সরকারি কলেজে নতুন পোষ্ট কটা হয়।

তুই আগে কখনো গার্ড দিয়েছিস, কালী?

নাঃ।

আমি যখন এই অফিসে চাকরিতে ঢুকি তখন এই গুজরাটি স্কুলেই আমাদের পরীক্ষা হয়েছিল। জানিস তো?

লম্বা ঘরের জমাট অন্ধকারের মধ্যে হাতের মোমবাতির আলোয় কালো রঙের কালীপদ নম্বরকে চকচক দেখায়। তাই নাকি।

এই তো তিন বছর আগে। ছিয়াত্তর সালের মার্চে। দোতলায় ওই সতেরো নম্বর ঘরটায় আমার সিট পড়েছিল। তখন যারা গার্ড দিচ্ছিল,

যারা খাতা, কোশ্চেন পেপার নিয়ে গেল, তাদেরকে ছদ্মবেশে দেবতা মনে হচ্ছিল! চাকরি দিচ্ছে।

কাল তুই গার্ড দিবি। বারো হাজার বেকার ছেলেমেয়ের কাছে ছদ্মবেশী দেবতা হয়ে যাবি। কেউ কিছু জিগ্যেস করলে বলে টলে দিস।

হ্যাঁ। দোবো। নিশ্চয়ই দোবো। তুই যে ঠিকানা জোগাড় করলি বাড়ি গিয়ে দেখা করবি বলে। তার কি হল'।

একজনের দাদাকে বলেছি: সে এত ভ্যানতাড়া আরম্ভ করল। রোজ সকাল বিকেল ঝামেলা করছে। যেন আমি ইচ্ছে করলেই তার বোনের চাকরি হয়ে যাবে। পাড়ায় টিকতে পারছি না।

ওই শুরু হল। পরীক্ষার পরেও তোকে রোজ রেজাল্ট জেনে দিতে বলবে।

কোশ্চেন বার করার চেষ্টা করছি।

অ্যাঁ?

জানলা দিয়ে দমকা হাওয়া আসতে মোমবাতিটা হঠাৎ নিভে গেল। অন্ধকারের মধ্যে কালীপদ নস্করের খসখসে গলা শোনা গেল ও কোশ্চেন সেটারের পার্সোনাল ষ্টেনো আমার বন্ধু। কাউকে বলিস না। দেশলাইটা দে।

( ৭ )

পরীক্ষার দিন আটটার সময় যেতে হল। রবিবারের সকাল। বন্ধুদের আড্ডা বাদ। দুপুরের ঘুম বাদ। অফিসের গাড়িতে খাতাপত্তর কোশ্চেন-পেপার নিয়ে অনেক আগে গুজরাটি স্কুলে পৌঁছে গেলাম। গত দুমাসের সব পরিশ্রম আজ শেষ হবে।

দশটায় পরীক্ষা আরম্ভ অথচ নটা বাজতে না বাজতে গুজরাটি স্কুলের সামনের রাস্তায় সিনেমা হলের শো ভাঙ্গার মতন ভিড় হয়ে গেল। সব রেডি হয়ে যাবার পর সাড়ে নটা থেকে গেট খুলে দেওয়া হল। একজন

একজন করে কল-লেটার হাতে নিয়ে আসে আর গেটে দাঁড়িয়ে রোল নাম্বার দেখে বলে দিই, ফার্স্ট ফ্লোর থার্ড ফ্লোর, রুম নাম্বার ওপরে গিয়ে দেখে নিন। গেটের পুলিশকে বলি, কল-লেটার হাতে নিয়ে আসতে বলুন সবাইকে—তাড়াতাড়ি হবে, দরজার সামনে এসে ভিড় করার কিছু নেই। পুলিশ বলে—কেয়া লেটার? আমি বলে দিলে সে বেকার জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে থাকে—কোল্লেটার হাত মে লে-কে যাইয়ে। কোল্লেটার হাত মে…।

দশটা বেজে যায়। পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। সব ঘরে ঘুরে ঘুরে দেখি, যুবকেরা যুবতীরা যাদের চাকরি চাই, মন দিয়ে উত্তর লিখছে। এতদিন আমিও এ রকম লিখেছি। আজ নিজেকে কাঁধ থেকে জোয়াল নামানো সন্ধ্যেবেলার গরুর মতন লাগছে। ইচ্ছে সুখে জাবর কাটছে।

একটা স্টীল ফ্রেম নীল পাড় শাদা শাড়ি পরা মেয়েকে অনেক গ্রামার বলে দিই। পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে অনেকেই 'স্যার' বলে ডাকছে আমাকে।

কার লুজ সিট চাই, কার খাতা স্টীচ করা দরকার, কোন ঘরে জল দেবার বেয়ারা নেই, এসব খুব মন দিয়ে দেখাশোনা করি। চাকরির পরীক্ষা দিতে এসে জল তেষ্টা না পেলেও একজন বেয়ারা এসে জল দিয়ে যাচ্ছে, এই সুখে ঘন ঘন জল খেতুম আমি।

দুপুরে কালি নস্করকে দেখলুম রাস্তার ধারে দূরে দাঁড়িয়ে একজন লোককে হাত নেড়ে অনেক কিছু বোঝাচ্ছে। বোধ হয় কোশ্চেন জোগাড় করতে পারেনি বেচারা।

পরীক্ষার শেষে শ্রীধরদা আর অজয়রা যখন অ্যানসার পেপারের বাণ্ডিল বেঁধে বেঁধে সব গুছিয়ে রাখছিল, যারা গার্ড দিতে এসেছিলেন তাদেরকে সমীরদা যখন 'থ্যাংকিউ সো ম্যাচ', আর ও-কে' আর 'সো লং' বলছিল পাঁচতলার জানলা দিয়ে সিগারেট খেতে খেতে দেখলাম, নিচে রাস্তায় কল-

কল করতে করতে পরীক্ষার্থীরা, যাদের সবার চাকরী চাই, বাড়ি ফিরছে। দেখলামদশ বছর আগে যারা এই ভাবে চাকরির পরীক্ষা দিয়ে খুসি অথবা হতাশ হয়ে বাড়ি চলে গেছে, তারা কেউ আজ আর বেকার নেই। অন্ততঃ দশ বছর চাকরি খুঁজে চাকরি না পেয়ে কেউ বিড়ি বা সাবান বা গঞ্জি বিক্রি করছে কিম্বা নানারকম দু নম্বরি করছে। কিম্বা, নীরবে, মরে গেছে। কেউ আবার চাকরি পেয়ে হয়তো আমারি মত অন্যদের চাকরির পরীক্ষায় গার্ড দিচ্ছে। পরীক্ষার হলে পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় স্টীল ফ্রেমে নীল পাড় সাদা শাড়ি পরা কোনো মেয়ে তাকে, 'স্যার' বলে ডেকে উঠলো।

বঁটিটা দিল পারুলপিসি। বলল—তোমার তো দুজনের সংসার বৌমা। ছোটটাই নাও। বড় বঁটিতে তোমার কাজের অসুবিধে হবে।

মাস চারেক ধরে ব্যবহার করার জন্যে মীরা ভুলই গিয়েছিল—বালিশ দুটো ন'কাকার। বেশ মৌজেই বড় চটের থলের মধ্যে জামাকাপড়ের সঙ্গে বালিশ দুটো ঢোকালো মীরা। বিমান লক্ষ্য করল-ন'কাকা কিছু বলছে না। নতুন বাসা খুঁজে চলে যাচ্ছে ভাইপো, তাকে আর কি দেওয়া যায় আর কি দেওয়া যায় ভাব ন'কাকার মুখে। অনেক ভেবে বলল—ক্যালেণ্ডার নিবি?

বাসের টাইম হয়ে গেছে। পরের বাস আবার সেই ঘণ্টা দেড়েক দেরি। যেন না নিলে অন্যায় হবে তাই বাধ্য হয়েই নেওয়া—এরকম ভাব দেখিয়ে বিমান বলল—কই দাও। কি ক্যালেণ্ডার?

তালা খুলে নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ন'কাকা বলল—রামকৃষ্ণ আছে, শিব আছে, রাধাকেষ্টও আছে। সব বাংলা। কোনটা নিবি নে না। রাধা কেষ্টরটা বাংলা-ইংরিজি দুটোই আছে। এইটাই নে।

হঠাৎ এত উদারতা। বিমান মনে মনে হাসলো। সকালে ফুলুরি কিনলেও ন'কাকা সবচে ছোট সাইজেরটা কেনে—সরু লম্বা হিসেবের খাতায় লিখে রাখে—ফুলুরি দুইটা—কুড়ি পয়সা।

মোটা গোঁফ—বেঁটে—মাথায় টাক—খোনা গলা—এই লোকটা আমার ন'কাকা। বিমান ভেবে অবাক হয় খুব। সবসময় নিজের ঘরে চাবি দিয়ে রাখা অভ্যেস ন'কাকার। হাঁটাচলা করে খুব দ্রুত। এই দেখলুম

বাড়ির সামনে জ্যোতির দোকানের বেঞ্চিতে। একটু পরেই হয়তো বলবে—পালগাছা থেকে ঘরে এলুম।

এরকম একজন লোকের নাম কি করে যে অনন্তবিজয় হয় বিমান জানে না। বাড়িতে থাকলে হাফ-প্যান্টের ওপর গামছা জড়িয়ে বসে থাকে। গরম। অথচ চড়া রোদে পাজামার ওপর হাফ শার্ট চাপিয়ে মাঠের কাজ দেখতে ছুটে যাবার বেলায় কোনো ক্লান্তি নেই।

মীরাকে নিয়ে বিমান যখন মাস পাঁচেক আগে বাস থেকে নেমে তার গাঁয়ের এই বিশাল প্রাচীন বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছে—সরা নাপতের ছেলে সাগর বলেছিল—কিগো, শেষকালে এই গোডাউনে? তখনকার মত বিমান তাকে- মাল যে কলকাতায় বিক্রি হল না—বলে সামলে নিলেও মনে মনে ভেবেছিল, গোডাউনই বটে। সুরকি খসে গিয়ে হাড় পাঁজরের মত ইট বেরিয়ে পড়েছে অনেক জায়গায়। শ্যাত্লা-ধরা পাইপের গা বেয়ে ছাতের পাঁচিলের এখানে ওখানে—এন্তার ছোট ছোট অশ্বথ গাছ। পাতাগুলো বড় বড়।

ঢুকেই ডাইনে আটচালা। এখানে আমাদের দুর্গাপুজা হয় ফি বছর। শুনেই মীরা বলেছিল ওমা, গতবছর পুজোর সময় তো এসেছিলুম আমি, ভুলে গেলে নাকি। বিমান বলেছিল-ও আচ্ছা। অভ্যেসে বলে ফেলেচি। আটচালার পাশে ওদিকটায় গোয়ালঘর ছিল, জানো। এখন পাড়ার ক্লাব ছেলেরা ব্যায়াম করে। আর একধারে মেজকাকার ছেলে কালুয়া তাঁত পেতেছে। মেজকাকারা খুব গরীব। শুনে মীরা আস্তে করে বলেছিল—তাই? পুজোর সময় এসব বোঝা যায় না তো।

বাঁদিকের পোর্সনে অদ্ভুত সব লোকজন থাকে। পরে শুনো। বলে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই মেজকাকার দুই মেয়ে টুলি আর ফুলি—টুলি একরাশ বাচ্চাকে পড়াচ্ছিল আর ফুলি তার টিয়াপাখিকে ছোলা দিচ্ছিল—ওমা, দেখ, দেখ, কে এসেছে দেখ—বলতে বলতে ঘিরে ধরল তাদের।

সবাই মিলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মীরাকে মাপলো। তাদের ফেলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাড়ির ভেতরে যাবার দরজার মুখে বারান্দায় শুয়ে থাকা সম্ভ পা-ভাঙা মেজকাকা যখন বলল—সঙ্গে মেয়েছেলেটা কে? আট বছর পর দেশের বাড়িতে বৌ নিয়ে ফিরে আসার আনন্দটা মুহূর্তে উবে গিয়েছিল বিমানের। খুব গম্ভীর গলায় বলেছিল—আমার বৌ। তারপরই জিগ্যেস করেছিল—ন'কাকা কি ঘরে আছে? ন'কাকার নাম শুনেই মেজকাকার মুখটা বিরক্তিতে কুচকে মুচকে কিরকম যেন হয়ে গেল। আছে বোধহয়। দেখ না। ভেতরে ঢুকে যেতে যেতে বিমান ভেবেচিল—অভাবী আর অসুস্থ হলেই কি মানুষের মন এত ছোট হয়ে যায়। আর একটা কথাও ভেবেছিল বিমান—এ বাড়িতেও বেশিদিন থাকা যাবে না।

ঘরেই ছিল ন'কাকা। আগেকার দিনের বিরাট ঘর। আলমারি থেকে বিছানাটা অনেকখানি দূরে। গামছা পরে বিছানার ওপর বসে টর্চের ব্যাটারি খুলে রেডিওতে লাগাচ্ছিল ন'কাকা। রেডিওর পিঠের দিকের ঢাকনাটা নেই। তার মধ্যে ব্যাটারি আটকাতে আটকাতে ন'কাকা বলেছিল—কিরে, খবর না দিয়ে হঠাৎ চলে এলি। বিমান খুব নার্ভাস গলায় বলেছিল—তোমার বৌমার কাছে সব শুনো। কটা দিন থাকবো এখানে।

ফাঁকা-ঝিম্ ধরা পুরনো বাড়িটার সব জায়গা থেকে ছোটবেলায় ঘ্রাণ পাচ্ছিল বিমান। মা যে ঘরে রান্না করত সে ঘরটার পাঁচিল ভেঙ্গে একাকার, জানালার শিক, দরজার কপাট উধাও। অন্য শরিকেরা যে যার নিজের অংশ ন'কাকার কাছে বেচে দিয়ে কেটে পড়েছে। শুধু পুজোর সময় বাড়িটা যেন ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে। সেও ওই অনন্তবিজয় চৌধুরী—বিমানের নকাকার দৌলতে। এসটেটের জমিজমা দেখাশোনা ভাইকাকাদের কাছ থেকে কেনা অংশের তদারকি—পেটভাতের রান্নার লোক পারুল পিসির বকুনি খাওয়া—এছাড়া যার আর কোনো কাজ নেই।

বাড়ির সামনেই বাস থামে। জামাকাপড় ভর্তি দুটো ব্যাগ ছাড়া সঙ্গে কিছুই নেবার নেই। লোকের কত কি থাকে। বাসা পাল্টাবার সময় লরি কিম্বা টেম্পো ভর্তি মালপত্তর যায়।

ব্যাগ নিয়ে মীরার সঙ্গে বিমানকে বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাস্তা দিয়ে যে যাচ্ছে সেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে একবার করে। কিগো, কোথায় চললে। বেড়াতে যাচ্ছো বুঝি।

বেড়াতেই বটে! বিমান বুক চেপে হাসে। এখানে এই এক অলিখিত নিয়ম আছে। কে কোথায় কখন কেন যাচ্ছে—সব কথা খুটিয়ে খুটিয়ে বলে। বিমান সবাইকেই বলে—এখান থেকে দশ মাইল দূরে স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে আবার দেড় ঘণ্টা। অ্যাদ্দুরে থেকে কি আর অফিস করা যায়। তাই ওই স্টেশনের গায়ে একটা বাসা নিলাম। সবাই একবার করে বলে যায়—ভালোই করেছো। এখান থেকে কলকাতা যাতায়াত বড্ড কষ্ট। তা লাস্ট বাস ফেল করলে শুতে দেবে তো? এ কথাতেও বিমান হাসে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চই।

অথচ আসল কথাটা কাউকেই বলা যাবে না। একদিন রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর ন'কাকা নিজের ঘরে বিমানকে ডেকে বলল—পিসির বয়স তো কমছে না, বাড়ছে। তোদের জন্যে এত খাটতে পারবে না। ছোট কুপির আলোয় ন'কাকার চোখ জ্বলছিল। তাছাড়া এ বাড়িতে তো তোর নিজের কোনো অংশ নাই। থাকার একটা ব্যবস্থা কর। তখন কলকাতার বাসা থেকে মা-বাবা-ভাই-বোনকে ফেলে মীরার সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে আসার দিনটা মনে পড়ছিল বিমানের। অথচ এই ন'কাকাই প্রথমদিকে সব শুনে বলেছিল—দেশে থাকবি সেতো ভালো কথা। সব্বাই তো যে যার কেটে পড়ছে। তোরা থাকবি বলছিস থাক না। বিমান নিশ্চিত হয়েছিল।

কিছুদিন থাকার পরেই গোলমালগুলো ফুটে বেরোতে লাগল। যে

ঘরটা তাদের জন্য খুলে দিল ন'কাকা, সেটাতে ঢুকেই আঁতকে উঠেছিল মীরা। মেঝেতে পুরু ধুলো. দেয়ালের কোণ বেয়ে মাকড়সার জাল, দেয়াল আলমারির পাল্লা খুলতেই ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে পড়ল আরশোলা। লোক ডেকে সব সাফ করবার পর কোনওরকমে সেটা বাসযোগ্য হল ঠিকই, কিন্তু রাতে অসহ্য গুমোট লাগত বলে মাদুর বালিশ নিয়ে ছাতে যাওয়া শুরু করল মীরা।

এই ছাতটাই যা ভালো লাগতো বিমানের। পাঁচিলের গায়ে দাঁড়ালে পুরো গ্রামটা দেখা যায়। নিচে বালবিধবা ছুঁচিবাই পারুলপিসির সঙ্গে মেজকাকিমা আর তার ছেলেমেয়েদের লাগাতার ঝগড়া। ছাতে খোলা আকাশ থিক থিক করছে নক্ষত্র. আশেপাশে যতদূর চোখ যায়—শুধু ধানক্ষেত আর গাছ।

বাড়িটার এখন বেশি অংশের মালিক ন'কাকাই। তবু সে অবিবাহিত বলে—আর ছেলেমেয়ে নিয়ে মেজকাকিমার লোকবল বেশ বলে—ভোগদখল করত মেজকাকারাই। পুরনো আমলের পাড়ভাঙা কুয়োতলায় দিনরাত জল ঘাটছে টুলি-ফুলি কিংবা পাড়াপড়শী, আর ন'কাকার কাজের লোক পারুল পিসিকে জল আনতে যেতে হয় রাস্তার টিউবওয়েলে। এসবের মধ্যে পড়ে বিমান মীরাকে নিয়ে অস্বস্তি কাটাতে মাদুর বালিশ বগলদাবা করে ছাতে উঠতো রোজ। ছাতে উঠলেই মনে হত—এই পৃথিবী তো আমাদের। এইসব নক্ষত্র-মেঘ-আকাশ-সব তুমি নিয়ে নাও মীরা।

সকালে মীরাই কাজে বেরোতো আগে। তিনটে স্টেশন গিয়েই একটা হেল্‌থ সেন্টারে আটটা-তিনটে ডিউটি। কাজে যাবার সময় মীরা বাসে উঠে গেলে বাসের সামনের রাস্তা থেকে মুর্গি তাড়াতো ন'কাকা। দাঁত মাজতে মাজতে দৃশ্যটা দেখে হাসতে গিয়েও হাসতে পারেনি বিমান। মুর্গি হয়তো অলক্ষণ নাও হতে পারে। কিন্তু মুর্গি তাড়ানোর পেছনে মীরার কল্যাণ কামনাটা খাঁটি।

এক ছুটির সকালে মীরাকে নিয়ে মর্নিং ওয়াকে বেরোলো বিমান। এই শ্যামপুরে একসময় মার্টিন রেলের স্টেশন ছিল। সেই উঠে যাওয়া রেললাইন দিয়ে অনেকদূর চলে গিয়েছিল তারা। মীরা অনেকবার বলেছিল—গ্রামদেশে সকাল হওয়া একটা আলাদা ব্যাপার। ভোর হল—কথাটার মানে বোঝা যায়। আর কলকাতায়—ইস্। বিমানদের এখানকার বাড়ির ছাদের পাঁচিলের নিচের সারি খুপরিতে পর পর টিয়াপাখির বাসা। সকালে এ গাছ থেকে ওগাছে উড়াউড়ি করে টিয়াগুলো। পাঁচিলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে। দেখে মীরা বলেছিল—একি এখানে যে কাকের মত টিয়া।

দুতিনদিন পরে বিমান বুঝলো—বৌকে নিয়ে সকালের সেই মর্নিং ওয়াক করাটা সারা গাঁয়ে একটা খবর হয়ে গেছে। বিমানকে দেখলেই নানা জায়গায় কথা ওঠে—একদল বলে – ভালোই তো করেছে। পরের বৌকে নিয়ে তো আর ··। আর একদল বলে—একি কথা। ঘরের বৌকে নিয়ে সাতসকালে মাঠে ঘাটে ঘুরে মরবে তাবলে ...। যেন সারা গাঁয়ের লোক তাদের গার্জেন।

একদিন স্কুলের মাস্টারমশাইদের একদম সামনাসামনি পড়ে গেল বিমান। এঁদের হাতে সে একটু একটু করে বড় হয়েছে। বরাবর রেজাল্ট ভালো করার জন্যে সবাই তাকে এমনিতেই বেশ আলাদা চোখে দেখেন। তার ওপর কলকাতায় আট বছর বাস করে এসেছে বলে বিমান যেন বিরাট একটা দ্রষ্টব্য। আমাদের সেই বিমান-ফিরে এসেছে—বলে সংস্কৃত টিচার ক্ষেত্রমোহনবাবু খুব সুন্দর করে হাসলেন। মাস্টারমশাইদের প্রত্যেকের হাতে সাইকেল রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যেককেই বিমানের সুখ্যাতি করতে শুরু করলেন। ভারি চমৎকার একটা বিরক্তি অনুভব করছিল বিমান। অংকের মাস্টার সুবোধবাবু বললেন—তা তুই কি এখানে থাকবি, না কয়েকদিন পরে আবার কলকাতা চলে যাবি? বিমান আস্তে

করে বলল—দেখি, থাকারই তো ইচ্ছে। এইসময় একটা বাস এসে বাঁচিয়ে দিল বিমানকে। সবাই নিজের নিজের সাইকেল নিয়ে বাসটাকে সাইড দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বিমান—আমি আসি তাহলে-বলে অকারণে বাসটায় উঠে খানিকদূর গিয়ে আবার নেমে পড়ল।

বিমান জানতো—এরপর নানা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে কথাবার্তা এগোতে থাকবে। দুম করে কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করবে—থাচ্ছিস কোথায়? বিমান যদি বলে—এই কাকার কাছে আছি আর কি—তাহলে বলতে হবে কোন্ কাকা। কাকা বলতে তো মেজ আর ন'কাকা। বাকিরা তো কেউ এখানে থাকে না। সেসব কথার পরেও বিমানকে জিগ্যেস করা হবে—রাঁধছে কে? তোর বৌ তো অনেক সকালে কাজে যায় দেখি। বিমান উত্তর দেবে—রান্নার লোক একজন আছে আমাদের। এসব কথা প্রথম মাসটা বিমান নানাবয়সী লোকের কাছে কতবার যে বলেছে।

সবায়ের মূল প্রশ্ন একটাই। চৌধুরিবাড়ির ছেলেরা কর্তারা গাঁ ছেড়ে কলকাতায় বা অন্য কোথা চলে যাবে—সেইটাই তো স্বাভাবিক।

এরা তাহলে আবার ফিরে এল কেন? হাটতলায় দাঁড়িয়ে প্রতাপ বলে একটা ছেলে একদিন তো বলেই ফেলল—দেশে এদের কাউকে দেখলেই মনে হয়—এরা আবার এখানে কেন?

কথাটা কাঁটার মতন বিঁধেছিল বিমানের। বৌ নিয়ে এই গ্রামে থাকতে আসাটা কেউ সহজভাবে নিতে পারছে না কেন!

সমবয়সী ছেলেদের কাছে বিমান—বাকি জীবনটা এখানেই থাকতে চাই—কথাটা গুছিয়ে বলতে গিয়ে দেখেছে—তাদের চোখে একটা অদ্ভুত অবাক বিস্ময়। আনরবাটির বিশে তো বলেই ফেলল—সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে বলে যে একটা কথা আছে না, তোরা এখানে থাকলে সেটা পাল্টে যাবে। বিমান চমকে উঠে ভেবেছিল—এরা কি সত্যিই তাকে এত ভালোবাসে।

ছোটবেলায় ক্লাসে পেছনের দিকে বসে গুলতানি করত যে সুমু—সে এখন ঘরের সামনে সাইনবোর্ড লাগিয়েছে—জ্যোতিষভারতী সুনির্মল দত্ত। সেও পরিষ্কার বলল—কলকাতায় একটা ঘর পাবার জন্য আমি কবে থেকে লড়ে যাচ্ছি, আর তুই কলকাতা ছেড়ে এই গাঁয়ে থাকতে এলি। তোর ভাগাড় আলাদা, বিমান।

বিমান সবাইকেই মুখে বলেছে—বৌয়ের চাকরিটা যে এদিকে হল। বলেনি—মীরা ইচ্ছে করেই হুগলির এই গ্রামদেশে পোস্টিং নিয়েছে অন্য জেলায় দিয়ে দিলে বিমানের কলকাতায় অফিস করার অসুবিধে হত বলে জোর করেই বলেছিল—হুগলি জেলাই ভালো।

কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই বিমান দেখল—ছোটবেলায় যারা একসঙ্গে খেলেছে তারা অনেকেই অনেককে এখন একদম দেখতে পারে না। মূল কারণ রাজনীতি। বন্ধুদের মধ্যে ছোট ছোট অনেকগুলো দল। কংগ্রেস। সি পি এম। আর এস পি। পশ্চিমপাড়ায় নাটক হলে আনরবটির লোক খবরই পায় না। ঘোষপাড়ায় গানের জলসা হলে পরের দিন বাজারের লোক খবরটা শুনে বলে—জানতুম না তো। দেখেশুনে বিমানের মনে হত—গ্রামের লোকের মনেও এই অদ্ভুত শহুরে উদাসীনতা ঢুকে যাচ্ছে কি করে।

দোতলায় বাড়িওয়ালা। পাঁচিলঘেরা বাড়ির একতলায় দু-কামরার ছিমছাম ফ্ল্যাট। পেছনের দিকে উঠোন—কলঘর—পাতকুয়ার সঙ্গে ফিট করা টিউবওয়েল। খাবার জলের টিউবওয়েল আলাদা। স্টেশন আট মিনিট ট্রেনে উঠলে এক ঘণ্টা দশ মিনিটে কলকাতা। মীরার বেশ পছন্দ হয়ে গেল বাড়িটা। বাড়িওলার আবার গরু আছে। রোজকার দুধের বন্দোবস্ত পাকা। অফিস থেকে ফেরার সময় ট্রেন থেকে নেমে গঞ্জের ভিড়বাসে উদোম গুঁতোগুঁতি করার কোনো পর্ব নেই। ফাইন।

বিয়ের আগেই স্টোভ কুকার থালা বাটি কিনে রেখেছিল মীরা। যদি

নর্থ বেঙ্গল কিংবা আরো দূরে কোথাও চাকরি হয়, হঠাৎ যাতে কোনো অসুবিধেয় না পড়ে। কলকাতা থেকে সেসব আনবার সময় প্লাষ্টিকের চারটে বালতি হাতা-খুন্তি-চাটুও কিনে নিল মীরা। বিমান দেখল—মীরার চোখেমুখে এখন একটা আলাদা উৎসাহ। এতদিনে তার একদম নিজের একটা আলাদা সংসার হবে। যেখানে ঘুম ভাঙলে কেউ তাকে কোনো আদেশ করবে না। যেখানে কোনো পারুল পিসি, ন'কাকা, শাশুড়ি ননদ দেওর ভাজ নেই। এসব থাকলে মীরার যে খুব আপত্তি তা নয়। কিন্তু সেখানে অধিকারের সীমারেখা নিয়ে কি যে একটা অশ্লীল অংক সবসময় মাথায় রাখতে হয়। নানারকম মানুষের জন্যে সময় দিতে নিজের জন্যে আলাদা কোনো সময় থাকে না।

তিনটে স্টেশন পরের হেলথ্ সেণ্টারে মীরাকে পৌঁছতে হয় সকাল আটটার মধ্যে। খুব ভোরে উঠে রান্না চাপিয়ে দেয় মীরা। বিমান উঠে মশারি গুটিয়ে রাখে, তোষক পাট করে চালান করে দেয় ঘরের কোণে। কলকাতায় থাকলে বেলা ন'টার আগে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ার কথা ভাবতোই না বিমান। ঘুম ভেঙে গেলেও শুয়ে শুয়ে চেঁচাতো-বোন, চা দিয়ে যা। কলকাতায় ভাড়াবাড়ির যৌথ কলতলায় কোনওরকমে স্নান সেরে নেওয়ার স্মৃতি এখন বিভীষিকার মত মনে হয় বিমানের। এখানে উঠোনের দিকে বাড়ির পিছনে অনেকটা খোলা জমি—যেখানে নানারকম বাহারি গাছের পাশাপাশি পেয়ারা, গোলাপ রজনীগন্ধা এলোমেলোভাবে লাগিয়েছে বাড়িওলা—সকালে দাঁত মাজতে মাজতে বিমান দেখতে পায় সেখানে একটা অদ্ভুত রঙিন বড়সড় পাখি—বুকের কাছটা খয়েরি—ডানাগুলো কালচে—মাঝখানে আরো অনেকগুলো রঙ। নাম জানা নেই বলে পাখিটাকে আরো বেশি ভালো লাগে বিমানের। পাখিটার উদ্দেশে বিমান মনে মনে বলে—জানো, কলকাতা আমাকে চিবিয়ে ছিবড়ে করে দিচ্ছিল। পালিয়ে এসে খুব বেঁচে গেছি।

তবু মীরা কাজে বেরিয়ে গেলে বিমানের এই ফাঁকা ফ্ল্যাটে নিজেকে খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগে। সময় বাঁধা ট্রেন। নিখুঁত যন্ত্রের মত সময় হলেই স্নান সেরে একা একা মীরায় বেঁধে রেখে যাওয়া খাবার খেয়ে ফ্ল্যাটে চাবি দিয়ে ট্রেন ধরতে যায় বিমান। একা একা খেতে বসার সময় গলার কাছে একটা কষ্ট কেমন আটকে থাকে অনেকক্ষণ। মা-

হুড়মুড় করে কলকাতা ঝাঁপিয়ে পড়ে মনের মধ্যে। সারা সকাল পাঁচমিশেলি ভাড়াবাড়ির চিলতে রান্নাঘর থেকে মায়ের চিল চিৎকার-এটা হল না, ওটা কোথায় তারপর বোনদের পেছনে ননস্টপ বকুনি ..। রেজিষ্ট্রি অফিস থেকে মীরাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে মাকে যখন প্রণাম করতে গেল বিমান-মা একটু গম্ভীর ছিল ঠিকই-যদিও বিমানদের বাড়িতে মীরার যাতায়াত বছর চারেকেরও বেশিদিনের-বিমান স্বপ্নেও ভাবেনি এত দ্রুত মায়ের ব্যবহার এমন অদ্ভুতভাবে পাল্টে যাবে৷ রোজ রাতে মীরা বলত-এই ভিড় হৈ-হট্টগোলের মধ্যে থাকতে হলে আমি ঠিক পাগল হয়ে যাবো। পোস্টিংটা পেলেই আমি একটু খোলামেলা জায়গায় চলে যাবো, বুঝলে? তখন থেকেই বিমান বাড়ির লোকজনের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য মনে মনে একটা প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা যে এমন অশ্লীলভাবে শুরু হবে বিমান ভাবেনি। মায়ের সঙ্গে মীরার একদিন তুমুল ঝগড়াঝাটি হয়ে গেল বিমানের সামনেই। সেই মুহূর্তে বিমান কাউকেই ঠিক আলাদাভাবে চিনতে পারছিল না। তবু দুজনকেই আপ্রাণ সামলাবার। কিন্তু শেষপর্যন্ত মা যখন মীরাকে কিলচড়লাথি মারতে শুরু করল আর বলতে লাগল-বেরিয়ে যাও তুমি আমার সামনে থেকে। বিমান আর থাকতে পারেনি। কোনওরকমে মাকে টেনেটুনে ঘরের মধ্যে সরিয়ে এনে ধরে রেখেছিল অনেকক্ষণ। দরজার কাছে বসে মীরার সে কি কান্না। সেদিনই ব্যাগ গুছিয়ে ট্রেন ধরে সোজা শ্যামপুর। ন'কাকা। পারুলপিসি।

প্রথম প্রথম বালবিধবা পারুলপিসি নিজের ভাষায় মীরাকে অনেক

বোঝাবার চেষ্টা করতো। মীরা চুপচাপ শুনতো আর বলতো- সেখানে তুমি নিজে পাঁচদিন থেকে এসো পিসি, তারপর এসব কথা বোলো। সকাল হোলো তো সেই যে চেঁচামেচি চিৎকার কথা কাটাকাটি শুরু হল থামতে সেই রাত এগারোটা। ও বাড়িতে আমি আর ফিরছি না।

পরে কয়েকবার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছে বিমান। কেমন একটা কঠিন নিরাসক্ত মুখে মা বলেছে-দেখে তো মনে হচ্ছে ভালোই আছিস। বৌমাকে নিয়ে আসিস একবার। বোন বলেছে আবার যখন আসবে আমার জন্যে একটা শাড়ি এনো। আর কচি কলাপাতা রঙের কাঁচের চুড়ি। ভাইয়ের বৌ হারমোনিয়াম বার করে গান শুনিয়েছে-বলেছে আগের চে আপনি অল্প একটু মোটা হয়েছেন মনে হচ্ছে। চলে আসবার সময় বিমান ভেবেছে কদিন আগেও আমি এদের কাছে কত অনিবার্য ছিলাম এখন অতিথি।

মীরা মাঝে মাঝে বলে তোমার যদি মনে হয় আমি তোমাকে জোর করে তোমার বাবা মা ভাই-বোনের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছি, তাহলে তুমি ফিরে যেতে পারো। বিমান জোর করে হাসে—পাগল। ফিরে যাবার জন্যে কেউ চলে আসে? তারপর একটু থেমে প্রায় গম্ভীর গলায় বলে—আসলে, আমার কি মনে হয় জানো তো—একজনের সুখ মানেই অন্য অনেকজনের দুঃখ।

কলকাতায় থাকলে বন্ধু খুঁজে খুঁজে আড্ডা দিয়ে রাত নটা দশটায় বাড়ি ফিরতো বিমান। যেন বাড়িতে একটা ঘুমিয়ে পড়ার মতন বিছানা পাতা আছে বলেই বাড়ি ফেরা। অথচ এখন এই আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতে গিয়ে বিমানের কি যে হয়েছে। বিকেল হলেই মনে হয় কখন যে বাড়ি ফিরবো। মীরা একা বসে আছে অপেক্ষায়। নতুন অচেনা জায়গা হাতের কাছে একটাও কথা বলার লোক না থাকলে কি রকম যে লাগে

বিমান জ্যান। বন্ধুরা অফিসে এসে আওয়াজ দিয়ে যায়—কিরে, ভেদো মেরে গেলি একদম। কি ব্যাপার? বিমান ইচ্ছে করে বোকার মত হাসে। বলে—নানা রকম আনমেট নীড মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। আমার এখন কোনো ব্যাপারেই কোনো অসুবিধে নেই। তোদের খবর টবর কি বল।

ঘুম ভাঙলেই রোজ ভোরে বিমান শুয়ে শুয়ে তার এই ভালো থাকার ভেতরের ছবিটা দেখে। মানুষের ঘরে সাধারণত কত কি থাকে। আলমারি, আলনা, আয়না-লাগানো ড্রেসিং লাগানো ড্রেসিং টেবিল, সোফা কাম বেড, বেতের চেয়ার, বুক-শেলফ। বিমানের ঘরে শুধু বিমান, মীরার ট্রাংক, আর একপাশে দড়িতে ঝোলানো জামাকাপড়। আস্তে আস্তে' সব কিনতে হবে। একটা পাঁচ বাই সাত খাটের যা দাম।

দুপুরে অফিসে একদিন বাবা আসে দেখা করতে। রিটায়ার্ড বাবার করুণ মুখ দেখে বিমানের খুব কষ্ট হয়। তুমি আবার এই ভিড়ে ডালহৌসি আসতে গেলে কেন? বিমান নরম গলায় ধমকায় বাবাকে—চিঠি লিখলেই তো পারতে। আমি বাড়ি গিয়ে দেখা করে আসতাম। বাবা কেমন নিরুত্তেজ অথচ উদ্বেগভরা গলায় বলে—তুই ভালো আছিস তো। হঠাৎ তোকে খুব দেখতে ইচ্ছে হল।

বাড়ি ফিরলে মীরা একদিন সরু লম্বা করে ভাজ করা অনেকগুলো কাগজ বিমানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—নকাকা এসেছিল। দিয়ে গেছে। বিমান খুলে দেখে, শ্যামপুরে পাঁচ মাস থাকার ডে-টু ডে হিসেব। প্রত্যেক মাসে বিমান যত টাকা দিয়েছে, সব খরচ যোগ দিয়ে শেষ দিকের টোটাল অংকটা জমার চেয়ে অনেক বেশি। মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে উঠলো বিমানের। কোনরকমে বলল—কিছু বলে গেছে? মীরা খুব শান্ত গলায় বলল—পরে একদিন এসে টাকাটা নিয়ে যাবে বলেছে।

অ্যাবসার্ড—ইনহিউম্যান—বলতে বলতে বিমান কাগজগুলো মুঠোয়

পাকিয়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল। মীরা ছোঁ মেরে সেগুলো বিমানের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল—তোমার কোনো কৃতজ্ঞতা বোধ নেই। অসময়ে যে জায়গা দিয়েছে তার ওপর রাগ করছ কেন? আর এই হিসাবটা যদি সহ্য করতে না পারো সেটা তোমারই অক্ষমতা। ওখানে আমরা যদ্দিন ছিলাম তার, প্রতিটি দিনের নির্ভুল হিসেব আছে এতে। আমি দেখেছি। আমাদের জন্যে নকাকার যেটা বাড়তি খরচ হয়েছে সেটা আমরা দিয়ে দেব। ব্যাস মিটে গেল। তুমি মেজাজ খারাপ করো না।

বিমান দেখল—মীরা কত সহজ। সংসারের মোটা বাস্তব দিকটা যেন তার অনেক বেশি জানা।

ঠমকি চলতঃ রামচন্দ্র, কে গান গায়? এই এলোমেলা সন্ধেবেলায় কার এই কণ্ঠমাধুর্য স্মৃতির আবহ নিয়ে আসে। পূর্বলক্ষণ মাঝে মাঝে যেমন ধরা দেয়, বলে দেয় আগামী ঘটনাপ্রবাহ, কাকলি আসবে বলে এত আয়োজন। দরজা যেমন খোলা হবে বলে বন্ধ হয়, চোর বা ডাকাতের যে সমস্যা, গৃহস্থের মেধার সঙ্গে যার আত্মা সমতুল। অন্ধকার হাতড়ে লোহার আগল দেখি নিচু হতে হতে ডানদিকের হাতলে থেমেছে, আমার নৈপুণ্যপ্রভায় খুলে যায় বিশাল দরজা, অয়েলপেন্টিঙের গাম্ভীর্য, ঝাড় লণ্ঠনের নিচে সারারাত্রিময় এই অপেক্ষা কখন ভোর হবে। কথার তো শেষ আছে, গানে ক্লান্তি, গঙ্গার বাতাসে যদি ভ্রমণ হতো। কাকলি বলেছিল হবে। রঞ্জাবতী বেদীর পাশের মার্জার শাবকের শীতকাতরতা, সারারাত আচ্ছাদনের অভাবে ভিজে যাওয়া দেখে বলে ফেলেছিল, আহা। রঞ্জাবতী কি জানে, তখন গঙ্গাতট ঘাটের কিনারে এসে মাথা খুঁড়ে বলেছিল—আহা, সে-সব এই রঞ্জাবতীকে দেখেই। সুন্দরকে ধ্বংসের নেশায় দোদুল বলেছিল, এই বেড়ালের মায়ের মতন মন তোর, রঞ্জাদি। আমাকে আজো সুনজরে দেখলি না।

বিমলা, পরের ঘরে চলে গেল, হেসে হেসে, কলরব চর্চিত শুভদৃষ্টি সবই হল, হেসে হেসে বিমলা, টানা চোখে সমাপ্তি ও শুরু দেখিয়ে, পরের ঘরে গেল। তার বিশ্বস্ত বর সুধাবিন্দু তাকে অনেকদিন ধরে বড় ডাকে। বিমলা শান্তশিষ্ট নম্রস্বভাব নারী, কথা রেখেছে। সুধাবিন্দু সুখী।

সারারাত গান হয়েছিল; কিছু নাচ, অতিথি গুঞ্জন, করতালি, রঞ্জাবতী

নীরবে দেখেছে। যেখানে যেমনটি দরকার, তেমনটি হেসেছে সে, ভুল করেনি। রঞ্জাদি, দোদুলের সব সমস্যার সমাধান, স্বাস্থ্যবতী, স্বভাবে তার প্রিয় হবার সাধ। রঞ্জাবতী মানুষ চিনে হাসে। রঞ্জাবতীর মমতা পাখিদের পালকের মতো। দোদুল বলেছিল, লালুদা থেকে যাও, এই রাত দুবার আসে না, রঞ্জাদি বলতে বলেছে, রঞ্জাদির, বাবু বিমলার অভাবের দিনের ভাঙা কুলো, কাকলি এসেছে। গালে হাত রেখে কুমকুম তখন গলা খুলে আস্থা দিয়ে গেয়ে উঠেছিল, ঠমকি চলত: রামচন্দ্র....

বাতাসে কি হাহাকার ছিল, কারো বা চলে যাওয়ার ছন্দ যেন। বিমলা কি এই রাত, এত আয়োজন, কলধ্বনি একদিন ভুলে যাবে? তাও স্বাভাবিক।

পতনের কাজই এই, পূর্ব মমতা ধ্বংস করে দাও; প্রাত্যহিক প্রাতঃক্রিয়াদি মানুষ তো করে থাকে, এই ভোরে, গঙ্গার বাতাসে বসে, নিশ্চিন্ত মনে, কর্ণোপীতধারী অব্রাহ্মণ, তারা কি জানে নাকি, কাকলি, রঞ্জাবতী ও দোদুল, সঙ্গে লালু ভাই—অপেক্ষার ক্লান্তি আর বিমলার চলে যাওয়ার দুঃখ ধুয়ে নিতে এখানে আসবে। সে তাই, নিশ্চিন্ত মানুষ, অর্ধপথে উঠে চলে গেলে রঞ্জাবতী খিলখিল হেসে ওঠে। বৃক্ষশাখে, সে প্রভাতে, তখন সব ব্যস্ত কাক সমস্বরে ডাকতে চায়, কা।

সান্ত্বনার মতন হাওয়া দেয় তখন, নৌকোয় জমা থাকে উঁচু খড়, বিচালির ঘরগেরস্থালি; আদুরে গল্পের মাঝখানে 'তারপর' যেমন ঝলক ঝলক হাওয়া ছুঁড়ে দেয়।

দোদুলের মনে পড়ে, দুষ্টু বুদ্ধির নিখুঁত প্ররোচনায় খুব যত্নে সে 'ছুটি' শব্দটা কাগজের টুকরোতে লিখে ক্লাস শেষ হলে সকলের অজান্তে বেঁধে দিয়েছিল রঞ্জাবতীর আঁচলে, ছুটির পর একসঙ্গে চা খেয়ে দোকানের বাইরে এসে প্রথম দেখেছিল কাকলি, কারণ তার চোখ বড় তীক্ষ্ণ সবাই যেমন জানতো —একি, রঞ্জা তোর আঁচলে যে ছুটি লেগে আছে। সে বিকেলে দোদুল তো

দৃষ্ট হতে চায়নি, তবু সকল সুন্দরীর সঙ্গে যেমন শ্রীবিহীন একজন বুদ্ধিমতী সঙ্গিনী থাকে, সুন্দরের কাছে যাবার নিষেধের মত, সব দোষ দোতুলেরই হয়েছিল, কারণ এই যে কাকলি তাকে প্রাধান্যের ভাগ দিতে রাজি নয়। আঁচলে ছুটি উড়িয়ে রঞ্জাবতী চেয়েছিল হেসে উঠতে. দোতুল তুই কখন যে কি করিস—বলে ফেলতে চেয়েছিল ; কিন্তু কাকলি আঁচলে ছুটি বেঁধেছে জানতেওপারিসনি, এসব তো পূর্বলক্ষণও হতে পারে শুনে সে কি অস্বস্তি.... রঞ্জাবতী কিছুটা ক্রুদ্ধ. অভিমানী. বলেছিল, আমি কি তোর খেয়ালখুশির খেলনা, দোতুল ? থাকতে না পেরে, বয়সে কিছুটা বড় হওয়ার সুযোগে, সামলে নেবার ভঙ্গিতে, সবাইকে বলি, বলে ফেলি—আনন্দে, এভাবে বিষ ছড়িয়ো না রঞ্জা, কাকলি. শুধু দোষই দেখলে ? বৃষ্টিপাতের আগে পঁপড়েদের গর্তে ঢোকর মত. বিব্রত ব্যস্ত কাকলি, বলেছে—ও লালুভাই. তুমি বড় ম্যানেজমাস্টার, সবাইকে সমান চোখে দেখ কেন !

সহ্য করাতেই যে সুখ থাকে, দোতুল তা জানতো। রঞ্জাবতীর স্বভাব আছে, পুরনো কথা তুলে উত্তেজনা চাওয়া, খেলা করা, পিছনে লালুভাই—কাকলিকে কথা বলতে ব্যস্ত দেখে রঞ্জাবতী বলে, দোতুল, তুই আমাকে ওই বেড়ালের মায়ের মতন বলিস কেন ? এখন যদি দোতুল নিজের দোষ স্বীকার না করে, ক্রুত রঞ্জাদি, যে তার ঘামে ভেজা জামায় স্নেহে হাত রাখতে পারে অক্লেশে, কাকলি পারে না, বলে ঘেন্না. ঘাম, রঞ্জাদি ফিরে চলে যাবে। দোতুল তা জানতো ! আমার কোনো দিদি নেই, থাকলে কত রাগাতুম, আর রাগালেই তুমি কেন রেগে যাও রঞ্জাদি, তুমি কি আসলে তত বোকা ! রঞ্জাবতী খুশি হয়ে হাসে, সে হাসলে তার চারপাশের পৃথিবীতে ঝর্ণায় হরিণ আসে জল খেতে, পাখিদের উড়ে যাওয়ার মত শব্দ হয়, এ সবই তো রঞ্জাদিকে সহ্য করার সুখ। এমন যদি হত যে রঞ্জাবতীর সুন্দর চোখদুটির ঠিক নিচে এই নাকটি তত সুন্দর হয়তো নয়, মনের মত নয়, দোতুল কি মেনে নিত, আমার যা যাছে তা দিয়েই সাজিয়ে

নেবো তোমাকে, যা নেই তার কথা নাই বা ভাবলাম।

লালুভাই কিছুটা সাধক, বলে থাকে, সবই তিনভাগে বিভক্ত, তিনের মায়া বড় মায়া, তা দোতুল ভাবলো, এই যে মলত্যাগপর্ব, এর মধ্যে কি তিন আছে? রঞ্জাদিকে কি বলা যাবে, উপবিষ্ট ওই নিতম্বরেখায় তিন আছে, পরিত্যক্ত মলরেখায় আছে এবং আর নিচে গড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে দুই অথবা ছয় কিংবা পাঁচ। এই আবিষ্কারে দোতুল নিজের মনে হাসে, যেন স্বগতোক্তি, রঞ্জাবতী লক্ষ্য করে সব, বলে—হাসির কি হল? নিজের চারপাশে খুঁজে দেখে, হাসির কি আছে, দোতুল হাসে কেন? তবে কি রঞ্জাদি, গোপনে হাস্যকর?

নিজের বলতে কি আছে দোতুলের? রেলইয়ার্ডে রাত-জাগা, ইঞ্জিন-শান্টিং, সে বড় শব্দময় মধ্যরাত, আর হাতলঘোরানো টেলিফোন, মালগাড়ি কোথায় দাঁড়াবে, রাতজেগে দোতুল এসব করে, নক্ষত্রের ঝরে যাওয়া লক্ষ্য করে, কলেজ-জীবনের কথা ভাবে, মনে পড়ে, রঞ্জাদি কখনো চঞ্চল হলে, কাকলি বলতো ফার্স্ট ইয়ারের মত করিস না, লোকে হাসবে! সেসব কারণে কাকলিকে সঙ্গে রাখে রঞ্জাবতী, সুন্দরের যেমন নিষেধ। সুন্দরী হলে কি আত্মবিশ্বাস কম থাকে, যেন পাখি, উড়ে গেলে একসঙ্গে যাবে।

লালুভাই, তোমার বন্ধু—কাকলির মন্তব্যে ছিল অসম্মান, দেখি মলিন গেরুয়া, গঙ্গাতীরে রেলিঙের কাছে বসে আছে, সম্মান ফিরিয়ে আনতে তাকে বলি, গেরুয়ায় বন্ধন আছে, কাকলি ও বন্ধন মারাত্মক, আমার তেমন কোনো বন্ধন নেই। তোমাদের সঙ্গে এই যে দোতুলের বাড়ির দিকে সকালবেলার যাওয়া, শুভেচ্ছাসফর, এ শুধু তোমাদের ভালো লাগবে বলে। না যাওয়ার স্বাধীনতা আমার তো ছিলই, ইচ্ছে হলেই শুনতে পাই নীলিমার গান, সুর, রহস্য। একা হওয়ার কোনো শ্রম নাই কাকলি, খুশি করার চেষ্টায় বড় শ্রম। মজা দেখবে? কাকলি বলে, কি মজা? গেরুয়াধারীকে ছুঁড়ে দিই শব্দরাশি, আপকো পাস পুরিয়া হ্যায়? কাকলির

সরল প্রশ্ন, ভাঙা গ্রীবায় মাধুর্য ছিল না, শুধু প্রশ্ন—পুরিয়া কি ? আমি তাকে সহজে বোঝাই, পুরিয়ায় ঘাস থাকে, প্রকৃতি, নেশাগন্ধ, গেরুয়ার বন্ধন, আশ্রয়। বিরক্ত সাধুবাবা বলে ওঠে—কেয়া জরুরত হ্যায় আপকা পুরিয়াকা ? যেন শাসন, সঙ্গে তো রমণী আছেই, যা আশ্রয়, তোমার আবার নেশাগন্ধ চাই কেন ? কাকলি বিমূর্ত হাসে। রঙ্গাবতী পিছন ফিরে চায়, কি হল রে ? কাকলি তিরস্কারের সুযোগ কখনো ছাড়ে না—অত কেন, দোতুল এগিয়ে যাচ্ছে, লালুভাই আমাকে মেয়ের মতন ভালোবাসে যে। দোতুল শিখিয়ে দেয়, বলো রঙ্গাদি, তাতে হাসির কি আছে ? রঙ্গাবতী বলে না। শুনে শুনে কথা বলতে নেই।

এই সেই বেলবাবার আশ্রম, মানে শান্তি, ঝড়বৃষ্টির রাতে একদিন এখানে দেখেছি গাছেরা ঝুঁকে পড়ে কাকুতি জানায় নদীকে, জল তুমি উতলা হোয়ো না। মাঝনদীতে লঞ্চের শব্দ—ভোঁ—মানে মন খারাপের শব্দ তো এরকমই হওয়া উচিত—সেই শব্দের মধ্যে মালগাড়ি চলে যায়, ইঞ্জিনের আলো কি তীব্র, কাকলি কি অতশত জানে ? জানে দোতুল, রঙ্গাবতীর নূপুরের দিকে চেয়ে সে বলতো, ওই নূপুরের আছে আলো, ঢেউ, ধ্বনি। মানুষের কত যে বন্ধন।

পথে জল, আবর্জনা, ডানদিকে উঁচু উঁচু বাড়ি, এই ছাদে অসিত বাজায় পিয়ানো আর গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকে, ঢেউ তাকে সুর বলে দেয়, সেকথা কি কাকলিকে বলা ভালো ? কাকলি কি ভৈরবী জানে ? ধ্যানে যাকে পাওয়া যায় সে পাওয়ায় অসীমের স্বাদ আছে, মৃতকে জীবন দেওয়ার সম্ভাবনা ; আনন্দময়, কাকলিকে শান্তি দিও, সহনশীলতা। মানুষ তো কাছে যেতে চায়, কথা বলা, গান, শর্ত নির্ভর ভালোলাগা, ধ্যানে কোনো শর্ত নেই, শুধু স্নান, অবগাহন, পূজা, আরতির ধ্বনি, সে মহিমা সকলের নয়।

তবুও তো নিরানন্দ পৃথিবীতে থাকে, হায়, কাকলি কুরূপা, দর্পণে হৃদয়বৃত্তি অবিম্বিত, প্রভাত বাতাসে তাই কাকলি আঁচল উড়িয়ে পিছন

সিঁড়ি ভেঙে জলের অনেক কাছে যায়, নদীজল অস্থির বলে তাতে কোনো প্রতিকৃতি বা কুণ্ঠা নেই, কাকলি মুক্ত ; জলে তার বুদ্ধিদীপ্ত করস্পর্শ রেখে সে দেখে প্রবহমানতা, যেন সময় বা বয়ঃক্রম , কেউই থেমে থাকতে জানে না, কাকলি দুঃখ পাবে কেন ? ফিরে দেখে, উঁচু থেকে লালুভাই অম্লান হাসিতে অপেক্ষমান, কাকলি উঠে এলে তার প্রশ্ন বিদ্ধ করে যায়—পুণ্য হল ?

অপ্রস্তুত কাকলি কখনো হয় না, বলে পুণ্য নয়, আচমন হল। তোমার এত হিংসে কিসের, লালুদা ?

এসব তো সুবিধার্থে প্রস্তুত, আবর্জনাময় গঙ্গাজলকে পবিত্র, পাপস্খালনের জন্য পূজাকে প্রয়োজন ইত্যাদি। এই ফাঁদে তুমি যেন পা দিও না, কাকলি।

এই প্রথম কাকলি হেসে ওঠে, আমাকে নিয়ে তোমার কত ভয়, লালু-ভাই। সে হাসির শব্দে দর্পণবদ্ধতার ভেঙে যাওয়া ছিল, মেঘ ও আকাশের আত্মীয়তা।

কে রঙ্গাবতী ? শহর ও মফস্বলের বিষবাতাস থেকে দূরে সে থাকে গ্রামে। সেখানে কাঁচা মাটির পথের দুপাশে আমগাছ, পাহাড়ী নদীর উপমার মত ঝিল যেখানে বিকেল হলে রঙ্গাবতী বসে থাকে একা, যেখানে তার ভাবী-ইঞ্জিনীয়ার অবুঝ প্রেমিক দীপকুমার আসে ক্বচিৎ কখনো ; সে এলে রঙ্গাবতী তার আবাল্য সুহৃদ সব গাছ পাখি ধুলো ফেলে দিয়ে ভুলে গিয়ে দীপকুমারের কোলে শিশুর মতন শুয়ে পড়ে, দীপকুমার বলে—সবাই দেখে যে, রঙ্গাবতী ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখ বুজে বলে—দেখুক। কেউ না দেখলে সব তৎপরতা তাৎপর্য পাবে কি করে ? অবুঝ দীপকুমার রেগে গিয়ে কথা না খুঁজে পেয়ে গম্ভীর হয়ে যায়, অনেকক্ষণ পরে হয়তো বলতে চায়—তুমি অসুস্থ। রঙ্গাবতী হাসে। সে হাসি বড় সরল।

পাঁচ পুরুষের বিশাল বাড়িতে রঞ্জাবতী একক যুবতী, আর সবাই বৃদ্ধ অথবা ঝি-চাকর, কোথাও বা ধানসেদ্ধ হয়, কোথাও বা বিচালি কাটার আসর, কোনো পুরু কার্পেটের মতন ঢালাও পড়ে থাকে উপেক্ষিত আলু। শিক্ষা বা সাহচর্য পেতে রঞ্জাবতী শহরে ছুটে আসে, হৈ চৈ যুবতীর পক্ষে এ শহর প্রকৃত গন্তব্য যেন রঞ্জাবতী জানে, সেখানেই কাকলির সঙ্গে দেখা তার, দেখামাত্র কাকলির অভিজ্ঞতারাশি রঞ্জাবতীকে কাকলি নির্ভর করে তোলে কাকলি বলেছে বেশি ক্লাশ করা ভালো নয় কাকলি বলেছে নাভি খুলে শাড়ি পরাই ভালো--কারণ নাভিই তো সমতা কাকলি বলেছে দোতুল খুব নির্ভরযোগ্যতার প্রতিভূ তাই দোতুল বড় ভালো . কাকলি বলেছে পথে-ঘাটে কারোর দিকে মন খুলে তাকাতে নেই তাই· কাকলি যদি দীপকুমারকে বোকা বলে ? জানি, জানি, সেসব হল মেয়েলি হিংসে। কাকলির সব ভালো কিন্তু এই পুরুষ মানুষের ওপর কাকলির কেন এত রাগ রঞ্জাবতী বুঝতে পারে না।···পৃথিবীময় কিলবিল-কিলবিল নারী....সেকি স্বাস্থ্যকর হত খুব ? নারী শুধু অপেক্ষার প্রতিমূর্তি —পুরুষ তাকে পূর্ণ করে দেবে। এ শরীরে শুধু প্রতিশ্রুতি—তুমি কবে আসবে দীপকুমার ?

একদিন শীতের সকালে—ঘুম ভেঙে নিমের দাতন নিয়ে রঞ্জাবতী ভ্রমণে বেরোবে—দরজা খুলে বাইরে এসে দেখে, চাদর জড়ানো দীর্ঘদেহ ঘনচুল চশমা-পরা দাড়িতে হাত লালুভাই, মুখে তুচ্ছকাম হাসি—চলে এলাম। মনে পড়ে লালুদাকে কলেজে আনে দোতুল—বলেছিল, সন্ন্যাসী অনেক দেখেছি, সন্ন্যাসীদের ঘৃণা করে এরকম যোগীপুরুষ কখনো দেখিনি। রঞ্জাবতী চেঁচিয়ে ডাকে, মা মা, দেখ কে এসেছে। লালুদা রঞ্জাবতী নয়, মায়ের সঙ্গেই গল্প করে বেশি। ভবিষ্যৎ বলে দাও—করতল প্রসারিত রেখে রঞ্জাবতী দীপকুমারের কথা ভাবতে চায় ; লালুভাই বলেছিল—তুমি কি মৃত্যু ভালোবাসো ? ভবিষ্যৎ জেনে ফেলা আর মৃতদেহ পরিবহন তো একই।

সারাদিন রঞ্জাবতী ঘুরে ঘুরে গ্রাম দেখায় লালুভাইকে, গ্রামের মানুষ পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ নাটকে কে সেজেছিল রণজিৎ সিংহ, কে একদা সিনেমায় ঢাক বাজিয়েছিল ভালো, রঞ্জাবতী দেখায় নিচু পোস্টাপিস। লালুভাই দেখার ভাণ করে, দেখে না কিছুই। চোখ আটকে থাকে ঝরে যাওয়া পাতাদের কাছে একটি পাতা কুড়িয়ে ভালো করে লক্ষ করে লালুভাই—কত শিরা উপশিরা যেন বোঝা যায় পৃথিবীতে সবাই সবাইকে কিভাবে যে জড়িয়ে রয়েছে। শীতবৃক্ষের দিকে চেয়ে টের পায় লালুভাই প্রকৃতির বসন্ত প্রতীক্ষা। চলে আসার সময় বলে—দহন নয় রঞ্জাবতী আরোগ্যই সময়সাপেক্ষ ভোগের উপলব্ধি নয়, উপলব্ধিকে ভোগ করাই বেঁচে থাকা। রঞ্জাবতী বলে—দীপকুমার বড় অবুঝ, বড় মেজাজী। লালুভাই সান্ত্বনা দেয় তাকে। বয়সকালে পুরুষমানুষ ওই রকমই থাকে। ওতে মন দিতে নেই।

দোতুল খুব দুর্জয় গ্রীষ্মকালে সে লক্ষ করে রঙিন ছাতা মাথায় মেয়েরা বেরিয়ে পড়েছে পথে। টুক টুক করে তারা হেঁটে যাচ্ছে সমবেত অর্থহীন কলকলধ্বনি বাতাসে ছড়িয়ে। কি এত কথা থাকে তাদের? দোতুল শুনতে চায় সেসব কথা। কাছাকাছি দোতুল থাকলে তাদের যেন কোনো অসুবিধে না হয়। সুধাবিন্দু ডেকেছে তাই বিমলা দেখা করতে যাবে তার সঙ্গে, দোতুল বিমলার মাকে গিয়ে বলবে কলেজে ফাংশান। সবাই খুব বিশ্বাস করে দোতুলকে। কাউকে খুশি করতে পারলে দোতুল খুশি। সে একা কোথাও যায় না। সিনেমা দেখলে দোতুল টিকিট এনে দেবে। দোতুল খুব চঞ্চল। কলেজের মাঠে সবায়ের মাঝখানে বসে গল্প করতে করতে দোতুল হঠাৎ উঠে যাবে। একটু পরে ফিরে আসবে হাতে চানাচুরের ঠোঙা নিয়ে। কথা বলবার সময় শব্দ উচ্চারণে দোতুল খুব দ্রুত। প্রায়ই তাকে প্রত্যেক বাক্য দু তিনবার বলতে হয় যদিও তাতে তার কোনো ক্লান্তি নেই। দোতুল খুব দুষ্টু। কোনো প্রফেসরের পেছনে

লাগতে হলে দোতুল বুদ্ধি দেবে। খুঁজে খুঁজে তার দুর্বলতার গোপন খবর এনে দেবে।

বাড়িতে দোতুলের অনেক ভাইবোন। অথচ বাবা আর ছিটগ্রস্থ মাকে তারা সতর্ক পাহারায় ঘিরে থাকে। বাড়িতে দোতুল শান্ত, দায়িত্ববান। পাড়ার পুজোয় সেক্রেটারী। ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন কিংবা রেফারী। লাইব্রেরির বই কেনার লিষ্ট দোতুল করে দেবে। নাটকে দৃশ্য ছিল, এক বারবধূ বাথটবে স্নান করবে অনেক নিস্পৃহ, অনেক উদাসীন ভঙ্গিতে। দোতুলই আবিষ্কার করে—সযত্ন পরিচর্যার আড়ালে সেই বারবধূ আসলে পেলব এক পুরুষমানুষ।

প্রেমিক তেমনভাবে হয়ে উঠতে পারেনি দোতুল আজও কারণ তার অর্থনৈতিক অসাচ্ছল্য ও হঠাৎ-লজ্জা। দুর্বলতার কথা দোতুল স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে কাউকে কখনো বলেনি। আড্ডায় উচ্ছল অথচ ভেতার সে প্রকৃত লাজুক।

রঞ্জাবতী চাইলে সে পায়ে হেঁটে বিহার চলে যাবে। রঞ্জাদির কাছে সে নারীসঙ্গসাধ, বন্ধুত্ব পাবার আকাঙ্খা, কারো কাজ করে দিতে পারার সুখ পায়। দ্বিধাহীন সে আনুগত্যে রঞ্জাবতী উত্তেজনা পায় না। দোতুল না চাইলেও তাকে পেতে হয় রঞ্জাদির অকারণ হঠাৎ-উপেক্ষা। সুন্দর হয়তো শর্তাধীন—ভেবে দোতুল সব মেনে নিতে চায়।

কাকলির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে দোতুলের অগাধ শ্রদ্ধা। তবু কাকলি বড় হুল ফোটাতে ভালোবাসে। অল্পে কেউ বিরক্ত হয়ে উঠলে দোতুল তাকে করুণা করে। হাতের কাছে যা আছে তাকে পছন্দ করাটাই সক্ষমতা। অপছন্দ তো শিশুসুলভ। না যাবো না। পৃথিবীটা মায়ের কোলের চেয়ে বড় নয়। লালুর ভাই বলেছিল। কাকলিকে লালুভাই কেন যে এত স্নেহ করে!

কৃশ গলির এই নিরাকাশ বাড়িতে দাদা-বৌদি ভাইপো ভাইঝি দিদি

বোন মা মেজদা সবাইকে নিয়ে দুটি মাত্র ঘরে বিদ্যুৎহীনতার দীর্ঘ পচা গরমে পাশা-পাশি ক্লান্তিকর কোঁদলব্যস্ত অনেক ভাড়াটে নিয়ে কাকলির সরু অপরিচ্ছন্ন বেঁচে থাকার মধ্যে কলেজ, কলেজের মাঠ, বই, সিনেমা, বন্ধুত্বের স্বাদ অনেকটা মুক্তির মতন। শীর্ণ এ শরীরে তেমন লাবণ্য আসেনি তাই পৃথিবীকে ক্ষমার চোখে দেখার কোনো মানে নেই। ছোটবেলা থেকে বাবার অনুপস্থিতি কাকলির বাস্তবকে করুণ ও নিষ্ঠুর করেছে। যৌথ স্নানঘরে কাকলি দেখেছে একতলার সুদর্শনবাবুর বিদগ্ধ দাদ। ঘরের অতৃপ্তি তাকে পথে ঠেলে নিয়ে গেলে কাকলি দেখেছে পথে বুকজল কারণ বৃষ্টি, বাসে ট্রামে উঠতে পারা তো দুঃস্বপ্ন, যদিও ওঠা যায় কেউ না কেউ পিছনে দাঁড়াবে। সিনেমা হলে চাই কা পাঁচ চাই কা পাঁচ চাই কা পাঁচ। ক্লাশে এন্তার ভণ্ড চালবাজির প্রদর্শনী। তোমার স্বাস্থ্য নেই, উদ্দাম হাসির উচ্ছলতা নেই, অকারণ উন্মাদনা নেই, তুমি এক কোণে চুপ বসে থাকো। বাড়িতে নিস্পৃহ বড়দার সঙ্গে কথা বলা মানে বৌদির নামে পরিণামহীন রিপোর্ট। সবসময় ব্যস্ত মেজদার সঙ্গে মাসে একদিন দেখা হয়। দিদির সঙ্গে কথা মানে তো ঝগড়া। মা সব সময় দোষ তুলে অভিশাপ দিতে অকৃপণ। শুধু শিশুর হাসি আর আকৃতিতে সারল্য থাকে যেমন দাদার ছেলেমেয়েরা কাকলিকে বড় ভালোবাসে।

পাঁচশো কোটি মানুষের এই একমাত্র পৃথিবীতে কাকলির কি কি করণীয়? ঘুম থেকে ওঠবার সময় কেন উঠবে বুঝতে পারে না কাকলি। শুধু আবার ঘুমিয়ে পড়ার জন্য যথেষ্ট ক্লান্ত হওয়ার দরকার আছে বলে সে ওঠে। গলির ভেতরকার এই সাত পুরণো বাড়িতে কোনো রোদ আসে না তাই স্যাঁতসেঁতে কলঘরে পাঁচ ভাড়াটের চিৎকার প্রতিভা ও লাইনবন্দী অস্বস্তি। যে কোনো বিকেলে সবাই কাজে ব্যস্ত তাই কাকলি দাঁড়াবে কেরোসিনের হাস্যকর লাইনে। ইলেকট্রিকের বিল জমা দিতে চাপ চাপ রোদ মাথায় নিয়ে কাকলি যাবে বিবাদী বাগ। চারপাশের মানুষজন

দেখে মনে হবে চাকরি পাবার জন্য চেহারায় এমনতর বোকা বোকা ভাব ফুটিয়ে তোলা কি খুব দরকার ছিল। এসবের মধ্যে দেয়ালে আঁকা থাকে লম্বা সাপ মুখটা তার ইন্দিরা গান্ধীর মত। ঋতু বন্ধের বিজ্ঞাপনের পাশে ঝুলে থাকে উন্মাদ উত্তমকুমার। সরস্বতী পুজোর ভাসানে যারা লরিতে প্রতিমা নিয়ে যায় তারা যেন বিসর্জনের আগে দেবীমূর্তির সঙ্গে একবার সঙ্গম সেরে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বসন্তের বিকেলে কোনো ফুটপাথ শিশু হাই তুলে চিৎকার করে ওঠে—যিস্‌কা বিবি মোটি। হাসপাতালে কাকলি কখনো যায়নি।

তোমার পরে নাই ভুবনের ভার—কথাটা যৌবনে মাও-সে-তুঙের মাথায় ঢুকলে চীনের বিপ্লব কি সম্ভব হত। যে কোনো অধ্যাপকের চেয়ে যে কোনো মিনিবাস ড্রাইভারের উপার্জন বেশি বলে অধ্যাপকেরা আজকাল অবসর পেলে গাড়ি চালানো শিখছে কিন্তু মিনিবাস ড্রাইভাররা অধ্যাপনা শিখছে না কারণ তারা বিনা প্রচেষ্টাতেই যে কোনো মানুষের মাথা ঘোরাতে পারে। বৃষ্টির কলকাতায় একজন রিক্সাচালককে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে বেশী জরুরী বলে মনে হয় তাই কাকলি রাজনীতির ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে দ্রুত। শিশুর হাসিও শর্তময় বলে কাকলির অভিমান বাড়ে। রোদ উঠলে বাষ্প হয়ে যাওয়া জলের নিয়তি তবু জল রোদ পেলে রূপ খুলে দেয়। ন নুভাই, জ ন কি নিঠ র

ভারতবর্ষের যা আদর্শ, সৎ দায়িত্ববান দাতা ধর্মপ্রাণ ইত্যাদি যদি হয় মানুষ, তবে তার কি কমিউনিস্ট হবার কোনো দরকার আছে? দেয়ালে মার্ক্স এঙ্গেলস বা লেনিন মাও-সে-তুঙের পরিবর্তে যদি লেখা থাকে চাণক্য-শ্লোক বা গীতা, দুর্বৃত্তকে শাস্তির পরিবর্তে যদি প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায়. সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা একাধিক মানুষের হাতে গেলেই দ্বিমত। শুধু সবাই যদি বুঝতো—আমার সত্যিকারের প্রয়োজন আসলে এইটুকু! অতিরিক্ত অর্থ মানেই অপচয়কে স্বাভাবিক করে তোলা, হৃদয়ের

গম্ভীরতা ভুলে মাংসের শাসন মেনে নাও! এসব ভেবে লালুভাই যে একদা লালমোহন সরকার ছিল, সম্পর্কস্থাপনে সবসাপেক্ষতা তুচ্ছ করে আজ শুধু একা থাকে। সরকারি চাকরির নিরাপত্তাবোধ তাকে সাহায্য করে স্বাধীন হতে। তুমি থাকো, সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থাকো—বলে কাউকে ডাকতে যাওয়ার মধ্যে অসম্মান, কাঙালপনা আছে। কেউ এলে জড়িয়ে থাকতে, ভরিয়ে দিতে চাইলে তাকে সহ্য করার বিপদ, অস্বস্তি। বিশ্বসুন্দরীর বুদ্ধিও সীমাবদ্ধ। আনন্দ এ শরীরে নেই, সে উপলক্ষ, আনন্দ মনের অনুভূতি। সুযোগ পেলেই মেদের স্বভাব স্ফীত হওয়া, পরিশ্রম তাকে আটকে রেখেছে? অনন্ত এ প্রকৃতির সামান্য অংশ মানুষ, শুধু তার মস্তিষ্ক বিপজ্জনক-ভাবে সক্রিয় বলে সে শাসন করবে প্রকৃতিকে! তা করুক, তবু সীমা অতিক্রম করে গেলে ধ্বংস হবে সভ্যতা, এ সত্য প্রকৃতির। ব্যাঙ-মায়ের গাভা হওয়া সাজে না। আলুভাজা, নিরোধ বা স্পেস কলোনী —মানুষ করুক, যেন চারটে হাত তিনটে পা বা বয়স থামিয়ে রাখার চেষ্টা না করে। প্রয়োজনে কেউ তৈরী করে মা-কালী, কেউ যিশু নামের সঙ্গে জুড়ে দেয় গালগল্প। সত্যানুভূতির উন্মাদনার সঙ্গে শারীরিক সুখ বা অর্থবৈভবের কোনো তুলনামূলক আলোচনা হয় না। বেঁচে আছি, খুলে রেখেছি দু-চোখ, যা দেখি তা মন দিয়ে দেখি। চারপাশে সুন্দরের এই সব অনন্ত আয়োজন, মানুষ যে কেন দুঃখে থাকে। যাকে চেয়ে-ছিলাম তাকে পেলাম না—বলে তুমি কান্নায় ভাসিয়ে দাও পৃথিবী, কে তোমাকে চাইতে বলেছিল? চাইলেই দুরকম সম্ভাবনা, পাওয়া বা না পাওয়া, এ তো স্বাভাবিক! না-পাওয়ার মধ্যে কি গভীর করে না-পাওয়াটাকে পাওয়ার স্বাদ নেই? পেতে পেতে পেতে পেতে তুমি যদি থামতে ভুলে যাও? বিশাল এ বিশ্বচরাচরের কতটুকু পেতে পারো তুমি! তোমার না-পাওয়ার কি অধিকার আছে? মনে রেখো, যা কিছু তুমি পেলে তা অন্য কেউ কখনো পাবে না। এ বঞ্চনায় তোমার অধিকার কোথায়? মেঘ ও

ইঁদুর আমাকে সমান আনন্দ দেয়, ইঁদুরের ওইটুকু শরীরে আছে কত যে কল, মেঘডাক; কত ছোট একটি পিঁপড়ের ধুকধুকি! পৃথিবীতে কত যে বিস্ময়। তবু কেন বিষ, কেন ঈশ্বর, কেন এত প্রতিযোগ। এসব আমার—বলে সিন্দুকে আবদ্ধ রাখো তাবৎ সম্পদ, একবারও বিলিয়ে দিয়ে দেখলে না, অন্যকে দিতে পারাই সক্ষমতা। হাতী হতে পারল না বলে পিঁপড়ের কোনো দুঃখবোধ আছে কি? একটুকরো চিনিকে একটা হাতী এসে এক মাইল নিয়ে যাক তো দেখি!

দোদুলের বাড়িতে সমবেত চা-পান শেষ হল। শেষ হল রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি, কথা খুঁজে বেড়ানোর দারিদ্র্য। বিদায় নেবার আগে শেষ কথাটা বলে ফেলার মত করে রঞ্জাবতী বলে—লালুভাই, তুমি এত বিরক্তিকর কেন? হয়তো তোমার বিরক্ত হবার প্রবণতা বেশি—এ রকম কিছু বলার আগেই দোদুল বলে ওঠে—লালুদা তোমায় আজো প্রেম নিবেদন করেনি বলে? রঞ্জাবতীকে ম্লান হতে দেখে প্রতিশোধ নেয় কাকলী—মুগ্ধ হওয়া তো মূর্খের স্বভাব দোদুল। দোদুলের অপমান রঞ্জাবতীর সহ্য হয় না সে বলে—মনের গায়ে সাবান লাগা কাকলি। গূঢ় রহস্য বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মৃদু হাসে লালুভাই—প্রিয় সম্ভাষণে থাকে মিথ্যাচার, মনে রেখো। অপমানে অধিকারবোধ আছে, আত্মীয়তা। রোজ ভোরে সূর্যের কাছ থেকে রোদ হয়ে অপমান পৃথিবীতে আসে, কেউ বুঝতে পারে না। স্থলকে অপমানের আক্রোশে ফুসে ওঠে তীরবর্তী জল—আমরা তাকে সমুদ্রের উদ্দামতা বলি। মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে অপমান—আমরা শুধু স্নিগ্ধ হতে চাই। ইন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস হয়ে আছি বলে কাছাকাছি প্রিয়জনকে বলি—ভালোবাসি। ভালোবাসা অপমানিত হয়ে বসে থাকে। সৃষ্টিকে অপমান করবে বলে কেঁদে ওঠে শিশু—এ পৃথিবী আবহমান থাকে।